পরলোকতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদ

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌
পঞ্চতীর্থ, সপ্তশাস্ত্রী।
অধ্যাপক—সংস্কৃতবিভাগ ; গবেষণা-পর্য্যবেক্ষক—প্রাচীন-ভারতীয় ইতিহাস
ও সংস্কৃতিবিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
বিধানসরণী ॥ কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রী[illegible]াপদ ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধানসরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া ১৩৬০

মুদ্রক :
শ্রীপরাণচন্দ্র রায়
সনেট প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

পরলোক, শ্রাদ্ধ ও জন্মান্তর সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বেদ, উপনিষৎ, সংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত-ভাষাময় সর্ব্বশ্রেণীর গ্রন্থে, বিভিন্ন দর্শনে এবং বৌদ্ধদের জাতক ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের বিভিন্ন গ্রন্থে উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বহু তথ্য নিবদ্ধ আছে। উল্লিখিত সর্ব্বশ্রেণীর গ্রন্থ হইতে বর্ত্তমান পুস্তকে সারসংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান যুগে যে সকল মনীষী বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় পরলোকতত্ত্ব ও জন্মান্তর সম্বন্ধে তথ্য-সংবলিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের গবেষণালব্ধ কিছু কিছু তথ্যও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ কেন করিব ? শ্রাদ্ধ না করিলে কি হয় ? পরলোক কি যথার্থই আছে ? মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা কোথায় যায় ? জন্মান্তর যদি থাকে, তাহা হইলে সকলেই জাতিস্মর হয় না কেন ?—ইত্যাদি বহু প্রশ্নের যুক্তি-প্রমাণ-সমন্বিত বিশ্লেষণ বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যে ২৪টি পরিচ্ছেদ আছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত ও সুধীমহলে সমাদৃত হইয়াছে। পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করার সময় কোন কোন প্রবন্ধকে পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিতও করিয়াছি। গ্রন্থখানি যদি জিজ্ঞাসুদের সংশয় খণ্ডনে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই পরিশ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব।

নূতন প্রশ্ন সাদরে গৃহীত হইবে এবং গ্রন্থখানির পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহাদের উত্তর-দানেরও ইচ্ছা থাকিবে। শিবমস্তু।

নিবেদক

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব
শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজের
শ্রীশ্রীকরকমলে

দাসানুদাস
রবীন্দ্র

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ

ভারতীয় আর্য্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তিসাধন ও সদগতি বিধানের জন্য শ্রাদ্ধ করা তাহার পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য। কাহারও মনে সংশয় জন্মিতে পারে যে মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে তাঁহার পিতা, মাতা বা অন্য আত্মীয় হয় তো পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং তখন শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদ্বারা সেই ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তি বা উন্নতির সম্ভাবনা আছে কি ? দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা এই সংশয়েরও নিরসনপূর্ব্বক জানাইয়া দিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তি যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও পুত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধ দ্বারা তাঁহার আত্মার তৃপ্তি ও ক্রমোন্নতি ঘটিতে কোন অসুবিধা হইবে না। "দেবো যদি পিতা যাতি তদন্নমমৃতম্ভবেৎ"।—প্রভৃতি উক্তিদ্বারা উল্লিখিত তথ্য শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে পরিষ্কার ভাষায়ই লিপিবদ্ধ আছে।

শাস্ত্রে বিশ্বাসী হিন্দু মাত্রেই জানেন—মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। গুরুতর পাপকার্য করিলে মৃত্যুর পরই নরকে পতিত হইতে হয় এবং পাপ অনুযায়ী নরক-ভোগের পর মানুষ তাহার কর্ম্মানুযায়ী যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা গীতাতেও শ্রীভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন (জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ)। কেবলমাত্র তপঃসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মারা পুনর্জ্জন্মের অধীন হন না ; সদ্যই তাঁহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। এতদ্ব্যতীত প্রাণি মাত্রেই জন্মমৃত্যুর চক্রে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই কারণেই, প্রায় সকল মানুষের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করা একান্ত কর্ত্তব্য। গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি ইতর জন্তুদের আত্মা কোনরূপ শ্রাদ্ধের অপেক্ষা রাখে না ; সুতরাং তাহাদের আত্মার তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না।

পরলোক এবং জন্মান্তর যে আছে, তাহা নানা প্রমাণের সাহায্যে নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায়। প্রমাণসমূহের সংখ্যা সম্বন্ধে যদিও নানা মুনির নানা মত দেখা যায়, তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বুঝা যায়—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ এই তিনটিই অবশ্যগ্রাহ্য মুখ্য প্রমাণ। সাঙ্খ্য-শাস্ত্রে এই তিনটিকেই প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে সাঙ্খ্যসূত্র যথা—"প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানি"।

যদিও নৈয়ায়িকেরা উপমান নামক চতুর্থ, প্রভাকর-পন্থী মীমাংসকেরা অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম, এবং পৌরাণিকেরা ঐতিহ্য প্রভৃতি অন্যান্য প্রমাণেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ নামক প্রমাণত্রয়ের মধ্যেই অবশিষ্ট সমুদয় প্রমাণের অন্তর্ভাব প্রদর্শন করা যায়। উল্লিখিত ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্যে পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

প্রত্যক্ষ-প্রমাণ

অক্ষ শব্দের অর্থ 'ইন্দ্রিয়', অতএব ইন্দ্রিয়সমূহের সাক্ষাৎ সম্পর্কের ফলে যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণগ্রাহ্য বলা হইয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ-প্রমাণলব্ধ জ্ঞান। আকাশে যখন সূর্য্যোদয় হয় তখন আমরা চক্ষুর্দ্বারা সূর্য্যকে দেখিয়া থাকি, অতএব তখন যদি কেহ বলে 'এখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই' তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়া স্থির করি। ঠিক তেমনি যখন আমরা কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা শুনি, কোন সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করি, কোন মিষ্ট, তিক্ত, অম্ল বা কষায় পদার্থ আস্বাদ করি অথবা উষ্ণ বা শীতল দ্রব্য গাত্রচর্ম্মদ্বারা স্পর্শ করি, তখন ঐগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হই। নৈয়ায়িকেরা বলেন "ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্"। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; সুতরাং ইহা একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ। এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণের সাহায্যে জাতিস্মর ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া এবং তাহাদের মুখের কথা শুনিয়া বহু লোক নিঃসন্দেহে অবগত হইয়াছেন যে পরকাল ও জন্মান্তর অবশ্যই আছে। জাতিস্মর ব্যক্তিদের নিকট হইতে পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষিত তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা পরে আলোচনা করিব।

অনুমান-প্রমাণ

যে কোন ধর্ম্মে বিশ্বাসী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সর্ব্বনিয়ন্তা পরম-কারুণিক শ্রীভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভগবান্‌কে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয় বটে; কিন্তু তিনি যে আছেন, ইহা আস্তিকমাত্রেই বিশ্বাস করেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংঘটন করেন। তিনি পরম

কারুণিক এবং নিরপেক্ষ বিচারক। যখন আমরা দেখি—কোন ব্যক্তি প্রভূত বিত্তশালী লোকের পুত্ররূপে জন্মিয়া বাল্যাবধি পর্য্যাপ্ত ভোগ ও বিলাসিতায় মগ্ন আছে, আর অন্য একজন অতি দরিদ্র ব্যক্তির ঘরে জন্মিয়া অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, শীতে, গ্রীষ্মে কষ্ট পাইতেছে, তখন স্বভাবতঃই বুঝা যায়, পূর্ব্বজন্মে উহারা যে রকম কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহারই ফলে এইরূপ বিভিন্ন অবস্থায় জন্মলাভ করিয়াছে। নিরপেক্ষ, ন্যায়বিচারক ভগবানের পক্ষে বিনা কারণে কাহাকেও সুখ এবং কাহাকেও দুঃখ দেওয়া সম্ভব নহে। কেহ জন্মাবধি সুস্থ ও সবল দেহের অধিকারী হয়, আবার অন্যেরা বাল্যকাল হইতেই নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি ও দুর্ব্বলতায় কষ্ট পাইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ব্যতীত এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। যেমন অগ্নিব্যতিরেকে ধূমের অস্তিত্ব সম্ভব নহে বলিয়া পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় যে তথায় অগ্নি আছে; ঠিক তেমনি জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল ব্যতিরেকে কেহ সুখী এবং কেহ দুঃখী হইতে পারে না বলিয়া উল্লিখিত প্রকার মানুষের অবস্থাভেদ দর্শনে অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায় যে, পরকাল ও পুনর্জ্জন্ম অবশ্যই আছে।

শব্দ-প্রমাণ

আপ্তপ্রমাণ হইতেই শব্দপ্রমাণের উৎপত্তি। সাধারণতঃ আপ্ত বলিতে জ্ঞানী-ব্যক্তিকে বুঝায়। সাধারণ মানুষ নিজে যাহা বুঝিতে পারে না, জ্ঞানী লোকের নিকট হইতে তাহা বুঝিয়া লয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্বজ্ঞান ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন এবং সাধারণ মানুষ তাঁহাদের উক্তিগুলিকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া থাকে। ত্রিকালদর্শী আর্য্য ঋষিরা আজীবন তপস্যা, সাধনা ও গবেষণার ফলে যে সকল নির্ভুল তথ্য অবগত হইয়াছিলেন, তাহাই বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদের কাছে বেদ ও শাস্ত্র অপরিহার্য্য প্রমাণ; কারণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এইসকল গ্রন্থের প্রামাণ্যের অপরিহার্য্যতা প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। উল্লিখিত বেদাদিশাস্ত্রগ্রন্থের উক্তিই শব্দপ্রমাণ। এইরূপ শব্দপ্রমাণের সাহায্যেও নিঃসন্দেহে পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থে মৃত ব্যক্তির জন্মান্তর গ্রহণের অসংখ্য বিবরণ এবং তাহাদের মধ্যে অনেকের জাতিস্মরত্ব-লাভের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। প্রতিটি বেদে এবং স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রে জন্মান্তর ও

জাতিস্মরবাদ সত্য বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

(১) অথর্ব্ববেদের কয়েকটি মন্ত্রে জন্মান্তরবাদের প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি দেখা যায়। উক্ত মন্ত্রগুলি যথা—

"স্বধা পিতৃভ্যঃ পৃথিবীষদ্ভ্যঃ। স্বধা পিতৃভ্যোঽন্তরিক্ষসদ্ভ্যঃ।
স্বধা পিতৃভ্যো দিবিষদ্ভ্যঃ॥"—অথর্ব্ববেদ ১৮ | ৪ | ৪ | ৭৮—৮০

উক্ত মন্ত্রগুলি দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয়, যে সকল পিতৃগণ পৃথিবীতে মনুষ্যাদিরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে আছেন এবং যাঁহারা বিহগাদিরূপে অন্তরিক্ষলোকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই প্রণাম জানানো হইয়াছে। ইহা পুনর্জ্জন্মের স্বীকৃতি ছাড়া আর কি?

(২) ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে মহর্ষি বামদেব পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন জন্মে কখনও মনুরূপে, কখনও সূর্য্যরূপে, কখনও কক্ষীবান্ ঋষিরূপে, কখনও কুৎসঋষিরূপে এবং অন্যান্য জন্মে কখনও আর্জ্জুনেয় রূপে কখনও উশনারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত মন্ত্রটি যথা—

"অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জ্জুনেয়ং ন্যৃঞ্জেঽহং কবিরুশনা পশ্যতা বা"॥
—ঋগ্বেদ ৪ | ২৬ | ১

(৩) যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ (১০ | ৪ | ৩ | ১০), বাজসনেয়ীসংহিতা (২ | ৩৩) এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৪ | ৪ | ৩) জন্মান্তরবাদের পরিষ্কার স্বীকৃতি রহিয়াছে।

(৪) সামবেদের ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫ | ১০ | ৭) বলা হইয়াছে—মানুষ পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে, পরজন্মে তাহারই ফল অনুসারে কখনও ব্রাহ্মণরূপে, কখনও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্ররূপে এবং কখনও বা ইতরপ্রাণী বা উদ্ভিজ্জরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

(৫) মনু, শাতাতপ, আপস্তম্ব, দক্ষ প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা সকলেই বলিয়াছেন—মানুষ পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে, পরজন্মে তাহারই ফলস্বরূপ কখনও সুস্থ দেহে, কখনও বা ব্যাধিগ্রস্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনুসংহিতার ১১ | ৪৮, শাতাতপসংহিতার ১ | ৭, আপস্তম্বসংহিতার ৮ | ১১ এবং দক্ষসংহিতার ৪ | ১৭-১৮ প্রভৃতি শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৬) বিভিন্ন পুরাণে জন্মান্তরবাদের সত্যতা সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পরে প্রদর্শন করিব।

(৭) শুধু হিন্দুধর্ম্মেই নহে; অন্যান্য ধর্ম্মেও জন্মান্তরের স্বীকৃতি আছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যে জন্মান্তর স্বীকার করেন, জাতকগ্রন্থগুলিই তাহার অকাট্য প্রমাণ। তাহা ছাড়া বুদ্ধ নিজেও যে সাধনার বলে পূর্ব্বজন্মসমূহের স্মৃতিলাভ করিয়াছেন, তাহাও বিভিন্ন পালি ও সংস্কৃতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলেও জন্মান্তর-বাদের স্বীকৃতি দেখা যায়। কোরাণশরীফেও জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতিসূচক উক্তি রহিয়াছে। আধুনিক খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা যে জন্মান্তরবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ইহা কি তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মাননীয় যীশু ও মহম্মদের মতের অনুরূপ? এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মার স্বরূপ

আত্মা এক বিচিত্র পদার্থ। জীবদেহের অভ্যন্তরে যতক্ষণ আত্মা বিরাজ করে ততক্ষণ সেই জীব (প্রাণী) হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া বেড়ায়। দেহের মধ্যে আত্মা থাকিলে সেই দেহ থাকে সর্ব্বদা সচেতন। তখন থাকে তাহাতে ধমনীর স্পন্দন, হৃদয়ের ধুক্ ধুক্, শ্বাস প্রশ্বাসের ফোঁসফোঁসানি, চক্ষুর পলকপাত। দেহে আত্মা থাকিলে সেই দেহ থাকে কথঞ্চিৎ উষ্ণ এবং তখনই থাকে দেহের স্বাভাবিক ক্ষয়, বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তনশীলতা। যতক্ষণ দেহে আত্মা থাকে ততক্ষণ দেহ পচে না; আত্মা অপসৃত হইতেই দেহ পচিতে থাকে। শুধু তাহাই নহে; আত্মা মানুষকে দেয় মননশীলতা, দেয় দুঃখের অনুভূতি, দেয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্যের প্রবণতা, দেয় মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা। এমন বিচিত্র আত্মার স্বরূপ জানিবার জন্য কাহার না ইচ্ছা হয়?

স্মরণাতীত কাল হইতে চিন্তাশীল মানবেরা আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য নানা-ভাবে ধ্যান ও সাধনা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান যুগের চিন্তানায়কেরাও এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট নহেন। বিশ্বের আদিগ্রন্থ বেদ আত্মার স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে বিবিধ চিন্তাধারা বহন করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য দেশের সমুদয় চিন্তাস্রোতঃ একত্র করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহার চেয়েও অধিকতর সমৃদ্ধ ও বহুমুখী চিন্তার রাশি একমাত্র বেদ-গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আমাদের এই অতি পবিত্র বৈদিক সাহিত্য হইতেই আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে যত্নবান হইব।

কঠোপনিষদ্ বলেন—আত্মা অণু হইতেও অধিকতর সূক্ষ্ম, আবার বিশাল হইতেও বিশালতর (অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ১।২।২০)। অর্থাৎ মানুষের চিন্তাশক্তি যে ক্ষুদ্রতম পদার্থ কল্পনা করিতে পারে, আত্মা আকারে তাহার চেয়েও ছোট; আবার মানুষের চিন্তাশক্তি যে বিশালতম পদার্থ কল্পনা করিতে পারে, আত্মা আকারে তাহার চেয়েও বড়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, যিনি ক্ষুদ্রতম, তিনিই আবার বিশালতম হন কেমন করিয়া? মশা ক্ষুদ্রই থাকে, এবং হাতীকেও বিশাল থাকিতেই দেখা যায়। মশা কখনও হাতীতে বা হাতী মশাতে পরিণত হয় না। অতএব

উপনিষদের উল্লিখিত বাক্যটি কি স্বোক্তিবিরোধ-দোষে দুষ্ট নহে? এই সংশয়ের উত্তর শাস্ত্রকারেরাই দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—প্রাণীর দেহাভ্যন্তর আশ্রয় করিয়া যে আত্মা সেই প্রাণীকে সঞ্জীবিত ও সঞ্চালিত করেন, তাহার নাম জীবাত্মা। এই জীবাত্মাই আকারে সূক্ষ্মতম। তিনি এত সূক্ষ্ম যে দেহ অপারেশন করিয়া এমন কি অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যেও মানুষ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। অপর-পক্ষে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া যিনি এই বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি-কার্য্য সংসাধন করিতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মা পরমাত্মা নামে বিখ্যাত। এই পরমাত্মাই আকারে বিশালতম। এইরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মাভেদে আত্মার দ্বৈবিধ্য থাকার ফলেই উপনিষদে অণু ও বিশালভেদে আত্মার দ্বিবিধ আকৃতির বর্ণনা রহিয়াছে।

বিশাল সমুদ্র হইতে সহস্র সহস্র কলসী জল উত্তোলন করিলে, কিংবা তাহাতে সহস্র সহস্র কলসী জল ফেলিলেও যেমন সমুদ্রের কোনরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতেও তেমনি কোটী কোটী জীবাত্মা অপনীত হওয়া সত্ত্বেও পরমাত্মার আকারে বা প্রকারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না। সমুদ্রের জল যেমন বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে ও পরে মেঘ হইয়া সমভূমিতে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, এবং পরিশেষে সেই জলরাশিই আবার গিয়া সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত জীবাত্মাসমূহও তেমনি বিভিন্ন প্রকার প্রাণিদেহ উপভোগের পর পুনরায় পরমাত্মাতেই বিলীন হইয়া থাকেন। সমুদ্রের জল লবণাক্ত ও নীলাভ, কিন্তু তাহা হইতেই উত্থিত বৃষ্টির জল মিষ্ট এবং স্বচ্ছ। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যেও তেমনি কিছুটা ভেদ আছে। পরমাত্মা নির্লিপ্ত ও ক্রিয়ারহিত, কিন্তু জীবাত্মা ক্রিয়ারত হইয়া সেই ক্রিয়ার ফলও ভোগ করেন।

উপরে আত্মা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, মোটামুটি তাহাই আত্মার আকৃতি বিষয়ে উপনিষদের সিদ্ধান্ত। জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন—মানুষের একগাছি চুলকে ১০০ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহার এক একটি খণ্ডকে পুনরায় ১০০ খণ্ডে বিভক্ত করিলে যে আকার পাওয়া যায়, তাহাই জীবাত্মার আকৃতিগত পরিমাণ।

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৫।৯

বস্তুতঃ ইহাদ্বারা জীবাত্মার যথার্থ পরিমাণ প্রকাশ করা হয় নাই, কেবলমাত্র তাহার ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়া হইয়াছে। জীবাত্মার আকৃতি সম্বন্ধে

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মতও যে কঠোপনিষদের উল্লিখিত মত হইতে অভিন্ন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশ শ্লোক হইতে তাহা স্পষ্টই জানা যায়।

পরমাত্মা যে সর্ব্বব্যাপী (all-pervading) এবং বিশালতম, এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার মত কোন উক্তি উপনিষদ্‌সমূহে কোথাও দেখা যায় না। সর্ব্বত্রই স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু জীবাত্মার আকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার মত কোন কোন উক্তি উপনিষদের স্থানে স্থানে দেখা যায়। ঋগ্বেদের বিখ্যাত পুরুষসূক্ত মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" অর্থাৎ আত্মা (পরমাত্মা) সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং তিনিই জীবদেহ আশ্রয় করিয়া ১০ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে বিরাজ করেন।

জীবদেহের অভ্যন্তরে যে আত্মা বিরাজ করেন, তিনি নিশ্চয়ই জীবাত্মা। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—তিনি আকারে ক্ষুদ্রতম। এই জীবাত্মা ১০ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া থাকিবেন কেমন করিয়া? এই সংশয়ের উত্তর ভাষ্যকারেরাই দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—নাভি হইতে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত স্থানের দৈর্ঘ্য মোটামুটি ১০ অঙ্গুলি। ক্ষুদ্রতম জীবাত্মা এই দশ আঙ্গুলি স্থানের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন—ইহাই উল্লিখিত শ্রুতির তাৎপর্য্য।[১]

ইহার পরেও আরও সংশয় থাকিয়া যায়। উপনিষদের বিভিন্ন বাক্যে এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে জীবাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" শ্বেঃ উঃ ৩।১৩
"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।" কঃ উঃ ২।১।১২
"অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং সত্যবদ্দেহনিঃসৃতম্।"
—মহাভারত, বনপর্ব্ব, সাবিত্রীর উপাখ্যান।

জীবাত্মা যদি অণু হইতেও অণু হন, তাহা হইলে তিনি অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হইবেন কেমন করিয়া? এই সংশয়ের উত্তর শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা দিয়াছেন।

১ কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন—পরমাত্মা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, তাহার বাহিরে আরও ১০ অঙ্গুলি অতিরিক্ত স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ তাহা হইলে অনন্ত পরমাত্মাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলা হয়। তাঁহার অনন্ত নামই প্রমাণ করে যে তিনি সীমাহীন।

আচার্য্য শঙ্কর তো স্পষ্টই বলিয়াছেন—"অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিতে দহরাকাশে স্থিতত্বাৎ স অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র ইত্যুচ্যতে।" অর্থাৎ জীবাত্মা সাধারণতঃ মানুষের হৃৎপিণ্ডের মুখে (প্রবেশ পথে) অবস্থান করেন। হৃৎপিণ্ডের মুখ আকারে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ; অতএব তাহাতে অবস্থিত সূক্ষ্ম জীবাত্মাও উল্লিখিত স্থলসমূহে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। অঙ্গুষ্ঠমাত্র শব্দটি লক্ষ্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; বাচ্যার্থে নহে।

শাস্ত্র ও ভাষ্যকারদের উল্লিখিত উক্তিসমূহ হইতে দ্বিবিধ আত্মার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাইয়াছি। এক্ষণে আত্মার অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। আমরা মানুষ—স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীবভেদে ত্রিধা বিভক্ত। অন্যান্য প্রাণিজগতেও এইরূপ ত্রিবিধ লিঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী দেখা যায়। আত্মারও কি এইরূপ লিঙ্গ আছে? যদি থাকে, তবে তিনি পুরুষ, স্ত্রী না ক্লীব? উপরে উপনিষদের যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আপাততঃ মনে হয়—আত্মা শব্দটি স্বভাবতঃ পুলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; ইহাদ্বারাও কি আত্মার পুংলিঙ্গেরই প্রমাণ পাওয়া যায় না?

উল্লিখিত সংশয়ের উত্তরে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ জানাইতেছেন—আত্মার নিজের কোন লিঙ্গ নাই। তিনি যেরূপ দেহ আশ্রয় করেন, সেই দেহে তাদৃশ ধর্ম্মেরই আরোপ করিয়া থাকেন।

> "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
> যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥"—শ্বেঃ উঃ ৫।১০

দেহাভ্যন্তরস্থ জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেন—ইনি ধূমহীন জ্যোতির ন্যায় (জ্যোতিরিবাধূমকঃ)। পরমাত্মা কেমন করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, এই সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেন—তিলের মধ্যে তৈল এবং দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত যেমন অদৃশ্যভাবে সমগ্র তিল ও দুগ্ধ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, পরমাত্মাও তেমনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছেন (শ্বেঃ উঃ ১।১৫—১৬)। সমুদ্রজলের মধ্যে লবণের অবস্থিতিকেও এই বিষয়ে উদাহরণরূপে প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই জন্মমৃত্যুরহিত (কঠঃ উঃ ১।২।১৮) এবং হ্রাসবৃদ্ধি-হীন। ইহারা প্রত্যেকেই দৃষ্টিশক্তির (কঠঃ উঃ ২।৩।৯) এমন কি বাক্য এবং মনেরও অগোচর (অবাঙ্মনসগোচর)। কেবলমাত্র কঠোর সাধনা দ্বারা ইহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাণের অবস্থিতিস্থল

অনেকের ধারণা প্রাণ ও আত্মা অভিন্ন। বস্তুতঃ ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক্। আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে আত্মা চৈতন্যময়। অপরপক্ষে প্রাণ যে বায়ুস্বরূপ—ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত, তাহা ছাড়া আত্মা এক এবং অবিভাজ্য ; কিন্তু প্রাণবায়ু পাঁচটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। মনুষ্য প্রভৃতির দেহে প্রাণ প্রভৃতি পাচটি বিভিন্ন প্রকারের বায়ুপ্রবাহ বিদ্যমান থাকে ; এই কারণে তাহাদিগকে প্রাণী বলা হয়। অপবপক্ষে—বৃক্ষ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জের দেহে উল্লিখিত পাঁচটি বায়ুপ্রবাহের অনুরূপ অবস্থিতি না থাকায় তাহাদিগকে প্রাণী নামে অভিহিত করা হয় না। প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান এবং সমান—এই পাঁচটি বিভিন্ন বায়ু-প্রবাহের সমষ্টিই সাধাবণত: প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে ইহারা একে একে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

হিন্দুশাস্ত্রেব বিভিন্ন গ্রন্থে মনুষ্যাদির দেহাভ্যন্তবস্থ পাঁচ প্রকার বায়ু এবং ইহাদের বিভিন্ন প্রকাব কার্য্যকারিতাব বহু বর্ণনা দেখা যায়। গীতায় এবং মহাভাবতের অন্যান্য স্থানে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুব স্বরূপ ও অবস্থিতিস্থল এবং ইহাদিগকে আয়ত্ত করিবাব উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। বেদান্তসূত্রে (১।১।১২)[১] এবং সাংখ্যশাস্ত্রেব বিভিন্ন গ্রন্থে[২] প্রাণাদি বায়ুব উল্লেখ রহিয়াছে। সুশ্রুত সংহিতার নিদানস্থানে (অধ্যায়—১) প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বিভিন্ন বায়ুপ্রবাহের অবস্থিতি-স্থল এবং কার্য্যকারিতা-সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে।

প্রাণাদি-বায়ুপঞ্চকেব অবস্থিতি-স্থল সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক ; যথা—

"হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥"

[প্রাণবায়ু হৃদয়ে, অপানবায়ু গুহ্যদ্বারে, সমান নাভিমণ্ডলে, উদান কণ্ঠদেশে এবং ব্যান প্রাণিদেহের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করেন।] এই শ্লোকটির জনপ্রিয়তা হেতু ইহা বিশ্বকোষ অভিধানে এবং আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১। অতএব প্রাণঃ।

২। সাঙ্খ্যকারিকা—২৯

মহাভারতের (পুণা সংস্করণ) শান্তিপর্ব্বে ভরদ্বাজমুনির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি ভৃগু প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর গুণ এবং অবস্থিতিস্থল ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। উল্লিখিত বায়ুপঞ্চকের মধ্যে প্রাণই প্রধান ; এই কারণে ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহাকে 'মুখ্যপ্রাণ' নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য শান্তি-পর্ব্বস্থিত ভৃগুমুনির উক্তি হইতে প্রাণাদি-বায়ুপঞ্চক সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। প্রাণবায়ুর (মুখ্যপ্রাণের) অবস্থিতিস্থল সম্বন্ধে কিছুটা আপাতবিরোধী উক্তি দৃষ্ট হওয়ায় প্রথমে অন্যান্য চারিটি বায়ুর কথাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অপান প্রভৃতি চারিটি বায়ু সম্বন্ধে মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন—

"বস্তিমূলং গুদঞ্চৈব পাবকং চ সমাশ্রিতঃ।
বহন্মূত্রং পুরীষঞ্চাপ্যপানঃ পরিবর্ত্ততে॥
প্রযত্নে কর্ম্মণি বলে য একস্ত্রিষু বর্ত্ততে।
উদান ইতি তং প্রাহুরধ্যাত্মবিদুষো জনাঃ॥
সন্ধিষ্বপি চ সর্ব্বেষু সন্নিবিষ্টস্তথানিলঃ।
শরীরেষু মনুষ্যাণাং ব্যান ইত্যুপদিশ্যতে॥
ধাতুষ্বগ্নিস্তু বিততঃ সমানেন সমীরিতঃ।
রসান্ ধাতুংশ্চ দোষাংশ্চ বর্ত্তয়ন্নবতিষ্ঠতে॥"

—শান্তিপর্ব্ব ১৭৮।৬-৯

বঙ্গার্থ ঃ— বস্তিমূল এবং গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া অপানবায়ু অবস্থান করে। মলমূত্র নিঃসরণ করানোই ইহার কার্য্য। দেহস্থ যে বায়ুপ্রবাহের অবস্থিতি হেতু প্রাণী হস্তপদাদি-সঞ্চালন, কার্য্যসম্পাদন এবং শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকে উদান নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণের শরীরের প্রতিটি অংশে, এমন কি প্রতিটি অঙ্গসন্ধিতে বিদ্যমান থাকিয়া যে বায়ুপ্রবাহ দেহটিকে সতেজ রাখে, তাহারই নাম ব্যান। প্রাণিদেহের সপ্তধাতুতে (রক্ত, মাংস প্রভৃতিতে) যে অগ্নি বিদ্যমান থাকে, তাহাকে উদ্দীপিত করিয়া রস ও অন্যান্য ধাতুগুলির সমতাবিধান এবং বিভিন্ন দোষের নিবর্ত্তনসাধনই সমানবায়ুর কার্য্য।

উল্লিখিত প্রথম শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, অপানবায়ু গুহ্যদেশে (বা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে) অবস্থিত। ব্যান যে সর্ব্বশরীরব্যাপী, তাহা উল্লিখিত তৃতীয় শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্যান শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থও এবিষয়ে আর একটি প্রমাণ। বি—আপ্ + অন = ব্যান। অর্থাৎ যাহা বিশেষভাবে সর্ব্বশরীর

ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তাহারই নাম ব্যান। পরবর্ত্তী একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে —প্রাণ ও অপানবায়ুর মধ্যবর্ত্তী স্থলে প্রাণ ও অপানের সমতাবিধানকারী যে বায়ুপ্রবাহ বিদ্যমান, তাহারই নাম সমান।[৩]

অপানের অবস্থিতি-স্থল যে গুহ্য বা বস্তিদেশ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রাণবায়ুর অবস্থিতিস্থল যদি হৃদয় হয়, তাহা হইলে সমানের অবস্থিতিস্থল নাভিই হইবে; কারণ নাভিমণ্ডলই হৃদয় ও গুহ্যদেশের সমদূরবর্ত্তী স্থান। শাস্ত্র বলেন— নাভির উর্দ্ধদেশে থাকে আমাশয় এবং নিম্নভাগে থাকে পক্কাশয়। এই দুইটির কার্য্যের সমতাসাধনও সমানবায়ুর একটি বিশেষ কার্য্য। উল্লিখিত আশয় দুইটির মধ্যবর্ত্তী স্থলে অর্থাৎ নাভিতে অবস্থিত থাকিয়া এই সমানবায়ু অন্যান্য বায়ুপ্রবাহগুলির মধ্যেও সমতা-সাধনে যত্ন করিয়া থাকে। এই কারণে নাভিস্থিত সমান বায়ুটিকে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর কেন্দ্রশক্তিরূপেও স্বীকার করা যাইতে পারে।[৪]

উদানবায়ুর অবস্থিতিস্থল যে কণ্ঠদেশ, উদান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই তাহার প্রমাণ। উৎ (উর্দ্ধদিকে) আনয়ন করে (শব্দ ও খাদ্যসামগ্রীকে) যে, তাহারই নাম উদান। এই বায়ুপ্রবাহ কণ্ঠদেশে থাকিয়া আমাদের মুখ দিয়া শব্দ উচ্চারণ করায় এবং সময়বিশেষে আমাদের পাকস্থলীস্থ খাদ্যসামগ্রীকেও মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

মহর্ষি সুশ্রুতও উল্লিখিত চারিটি বায়ুর অবস্থিতিস্থল সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। তবে তাঁহার মতে অপানবায়ুর অবস্থিতিস্থল পক্কাশয়। সম্ভবতঃ পক্কাশয় হইতেই মলমূত্রের নিঃসরণ ক্রিয়া আরম্ভ হয় দেখিয়া তিনি উল্লিখিত প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎ) বলা হইয়াছে—দেহরক্ষার প্রধান সহায়স্বরূপ অগ্নি প্রাণীর মস্তকে অবস্থান করেন। মহর্ষি ভৃগুও মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব ১৭৮।৩) বলিয়াছেন—

"শ্রিতো মূর্ধানমগ্নিস্তু শরীরং পরিপালয়ন্।
প্রাণো মূর্ধনি চাগ্নৌ চ বর্ত্তমানো বিচেষ্টতে॥"

৩। অপান-প্রাণয়োর্ম্মধ্যে প্রাণাপান-সমাহিতঃ।
সমন্বিতস্ত্বধিষ্ঠানং সম্যক্ পচতি পাবকঃ॥—শান্তিপর্ব্ব ১৭৮।১০

৪। পক্কাশয়স্তুধো নাভেরূর্দ্ধমামাশয়ঃ স্থিতঃ।
নাভিমধ্যে শরীরস্য সর্ব্বে প্রাণাশ্চ সংস্থিতাঃ॥—ঐ ১৭৮।১৪

[দেহস্থিত অগ্নি প্রাণীর মস্তকে অবস্থিত থাকিয়া সমগ্র শরীরটিকে পালন করেন। মস্তকস্থিত উল্লিখিত অগ্নির মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াই প্রাণ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।]

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে—প্রাণ হৃদয়ে অবস্থান করে (হৃদি প্রাণঃ), আর এখানে বলা হইল—প্রাণের অবস্থিতিস্থল প্রাণিদেহের মস্তকাভ্যন্তরস্থিত অগ্নি। তাহা ছাড়া চৈতন্যরূপী প্রাণের অবস্থিতিস্থল সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে তৃতীয় আর এক প্রকারের উল্লেখও দেখা যায়। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন—জীবিত প্রাণীর দেহে তড়িৎপ্রতিম চৈতন্য-স্বরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি বিরাজ করেন। ইঁহার অবস্থিতিস্থল লিঙ্গমূলের নীচে এবং গুহ্যদ্বারের উপরে। বিভিন্ন তন্ত্রের ব্যাখাতৃগণ এই কুণ্ডলিনীর অবস্থিতি স্থল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরস্পরবিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন—ইনি অবস্থান করেন গুহ্যদেশের উপরিস্থিত মূলাধারচক্রে; আবার অন্যেরা বলেন—লিঙ্গমূলের নিম্নস্থিত স্বাধিষ্ঠান চক্রই ইঁহার অবস্থিতিস্থল। আমি যতদূর বুঝি, মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের মধ্যবর্ত্তী ফাঁকা স্থানটিতেই এই ভুজগাকৃতি কুণ্ডলিনীশক্তি বিরাজ করেন। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎপ্রণীত নিত্যপূজাকল্পদ্রুম, শব্দার্থতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে করিয়াছি। এই সূক্ষ্ম চৈতন্যশক্তি সার্দ্ধ-ত্রি-বলয়াকারা (সাড়ে তিন প্যাঁচবিশিষ্টা) হইয়া নিদ্রিত কুণ্ডলাকৃতি (বেড়ী পাকানো) সর্পের মত অবস্থান করেন। এইরূপ কুণ্ডলাকারে অবস্থিতিকালে ইঁহার দেহের উপরিভাগ থাকে স্বাধিষ্ঠানচক্রের নিম্নদেশে এবং নিম্নভাগ থাকে মূলাধার চক্রের উর্দ্ধদেশে।

সাধনার সাহায্যে এই কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করিয়াই সিদ্ধ মহাপুরুষেরা অসাধ্য সাধনে সমর্থ হন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রায় কোন গ্রন্থ না পড়িয়াই যে হঠাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা এই কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করারই ফল। যে ভাগ্যবান সাধক এই চৈতন্যশক্তিকে জাগ্রত করিতে পারেন, তাঁহার কাছে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—কিছুই আর অবিদিত থাকে না। ইনিই সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ যাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন: "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। মানুষের প্রাণ-বিয়োগের পর তাহার দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে তখন আর কুণ্ডলিনী-শক্তিকে পাওয়া যায় না; সুতরাং এই চৈতন্যশক্তিকে প্রাণ নামে অভিহিত করা অসঙ্গত নহে। তবে এই কুণ্ডলিনী-শক্তি বায়ুস্বরূপ না হওয়ায় ইঁহাকে প্রাণবায়ু বলা যায় না; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রাণ হইতে ইনি ভিন্ন।

এতদ্ব্যতীত সুশ্রুতসংহিতায় (নিদানস্থান; অধ্যায়—১) চতুর্থ আর একটি মত

দেখা যায়। এই মতে মুখমধ্যে সঞ্চরণশীল বায়ুই প্রাণ। ছান্দোগ্যোপনিষদে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকেও প্রাণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে বটে; কিন্তু ঐ সকল ইন্দ্রিয়বায়ুস্বরূপ না হওয়ায় উল্লিখিত উপনিষদে প্রাণ শব্দটি গৌণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। গৌণার্থে ব্যবহৃত এই প্রাণ শব্দের আলোচনায় আপাততঃ বিরত রহিলাম। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রাণের অবস্থিতি-স্থল সম্বন্ধে মোট চারিটি পরস্পরবিরোধী মত বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন সম্ভব কি না, বিচার করিয়া দেখা যাক্!

মহাভারতের যে শ্লোকটিতে (শান্তি ১৭৮।৩) প্রাণকে মস্তকস্থিত বলা হইয়াছে, তাহার টীকায় মহামতি নীলকণ্ঠ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উল্লিখিত প্রাণ-শব্দটি চিদাত্মক (বিজ্ঞানাত্মা) ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রাণ মস্তকস্থিত সহস্রার নামক সূক্ষ্ম সহস্রদল-বিশিষ্ট পদ্মাকৃতি চক্রে (মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম শক্তিতে) বিদ্যমান থাকিয়া মনুষ্যের জ্ঞানশক্তিকে পরিচালন করিয়া থাকেন। মহাভারতের পরবর্ত্তী শ্লোকের (শান্তি ১৭৮।৪) ইঙ্গিত অনুসারেই নীলকণ্ঠ উল্লিখিত-প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানাত্মা ব্রহ্মই যে প্রাণবায়ুরূপে হৃদয়েও অবস্থান করেন, শেষোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ তাহাও ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও বেদান্তসূত্রের (১।১।২২) ব্যাখ্যায় একটি ছান্দোগ্য-শ্রুতির উল্লেখক্রমে মস্তকস্থিত উল্লিখিত প্রাণকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন।

বস্তিদেশের অভ্যন্তরে যখন কুলকুণ্ডলিনীশক্তি সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করেন, তখন মানুষের মননশক্তি বিকাশলাভ করে না। বিশিষ্টপ্রকার প্রযত্নের সাহায্যে এই কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রত করিলে যখন তিনি ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া হৃদয় পর্যন্ত অগ্রসর হন, তখনই মানুষের মননশক্তি বিকাশলাভ করিয়া থাকে। এই কুণ্ডলিনীশক্তি আরও উপরে উঠিয়া যখন মস্তকস্থিত সহস্রারচক্রে পৌঁছেন, তখনই মানুষের মনন-শক্তির বিকাশ পূর্ণতালাভ করে।

উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, তন্ত্রোক্ত কুণ্ডলিনী-শক্তিই মনুষ্যদেহে প্রাণশক্তির কেন্দ্র। তিনি যখন নিদ্রিতাবস্থায় থাকেন, তখন প্রাণশক্তির স্ফুরণ হয় না বলিয়া অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ সময়ে তাঁহাকে প্রাণ নামে অভিহিত করেন না। এই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইয়া যখন হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছেন, তখনই যথার্থ প্রাণনক্রিয়ার আরম্ভ হয়। এই কারণেই হৃদয়কে প্রাণবায়ুর অবস্থিতিস্থলরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে।

যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে ততক্ষণই প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য চলিতে দেখা যায়। প্রাণবিয়োগের পর আর শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবেশ ও নির্গম নাসারন্ধ্রপথে হইলেও তাহা দ্বারা আকৃষ্ট বায়ু মুখের ভিতর দিয়াই চলাফেরা করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই কারণেই শারীরতত্ত্ববিদ্ আচার্য্য সুশ্রুত মুখাভ্যন্তরস্থ বায়ুকেই প্রাণ বলিয়াছেন। আবার কুণ্ডলিনীশক্তি সহস্রারচক্রে না পৌঁছিলে প্রাণন-শক্তি পূর্ণতালাভ করে না বলিয়া মস্তককেও প্রাণের অবস্থিতিস্থলরূপে সময়বিশেষে বলা হইয়া থাকে। এইভাবে উল্লিখিত চারিটি বিভিন্ন উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন সম্ভব।

উল্লিখিত প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বায়ুপ্রবাহের মধ্যে কেবলমাত্র প্রাণ এবং অপানই সর্ব্বসাধারণের নিকট উপলব্ধ হয়। ব্যান, উদান এবং সমান নামক বায়ুপ্রবাহ তিনটিকে কেবলমাত্র তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণই অনুভব করিতে পারেন। দেহতত্ত্ববিদ্গণ বলেন—নাভি হইতে একটি বায়ুপ্রবাহ অহরহঃ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতেছে এবং এই নাভি হইতেই আর একটি বায়ুপ্রবাহ নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটিকে বলা হয় 'প্রাণ' এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'অপান'।

আমরা যেমন নিদ্রিত থাকিয়াও নিজেদের অজ্ঞাতসারে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি, কুণ্ডলিনীশক্তির নিদ্রাবস্থায়ও তেমনি প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকের কার্য্যকারিতা সম্ভব। কুণ্ডলিনীশক্তি নিদ্রিত থাকাকালেও নাভি এবং নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া প্রাণবায়ুর কার্য্য চলিতে থাকে এবং নাভি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অপানবায়ুর কার্য্য চলিতেও কোন অসুবিধা হয় না। তবে এই প্রাণন ও অপানন কার্য্য কুণ্ডলিনীশক্তির নিদ্রিতাবস্থায় সম্পাদিত হওয়ার ফলে কর্ম্মকর্ত্তা নিজেই ইহাদিগকে রীতিমত উপলব্ধি করিতে পারেন না। এই কারণেই অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্গণ উল্লিখিত বিস্তৃত স্থানগুলিকে প্রাণ ও অপানের অবস্থিতিস্থলরূপে স্বীকার না করিয়া প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্বরূপ হৃদয় এবং মস্তককেই তাহার অবস্থিতিস্থলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

দৈহিক শক্তির পরিচালনে হৃদয়স্থিত প্রাণই সমর্থ বটে; কিন্তু মস্তিষ্কাশ্রিত বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা ব্যতিরেকে তাহার এই সামর্থ্যের পূর্ণতাসাধন সম্ভব নহে। অতএব, হৃদয় এবং মস্তিষ্ক উভয়কেই প্রাণকেন্দ্ররূপে বর্ণনা করিয়া প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ অসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টিরই পরিচয় দিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষ মরিয়া পশুপক্ষীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কি না

পৃথিবীতে যে সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে মুখ্যতঃ দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একদল জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এবং অন্য দলের মতে জন্মান্তরবাদ একটি ভ্রান্ত কল্পনা। মহাত্মা যীশু পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার দেহত্যাগের পর কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান সমাজে এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতে থাকে। ক্ষমতাধিষ্ঠিত খ্রীষ্টানগণ এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না; এই কারণে অন্যান্য খ্রীষ্টানদিগকে নিজেদের দলভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপলের সভায় (Council of Constantinople) আইন পাশ করিয়া উল্লিখিত জন্মান্তরবাদের বিশ্বাসকে অপরাধরূপে ঘোষণা করেন। উক্ত সভায় আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল "যে কেহ আত্মার লোকান্তরবাদরূপ কাল্পনিক অভিনয়কে, এবং আত্মা মৃত্যুর পর পুনরায় ফিরিয়া আসে, এই অদ্ভুত মতবাদকে সমর্থন করিবে, ঈশ্বর তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিবেন।"* প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানা যায়, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করার অপরাধে কয়েকটি সম্প্রদায়কে ৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল।†

কোরাণ-শরীফে যদিও জন্মান্তরবাদ স্বীকৃতির ইঙ্গিত আছে, তথাপি বর্ত্তমান যুগের মুসলমান ধর্ম্মগুরুরা এই মতবাদটিকে ভ্রান্ত মনে করেন। ভারতবর্ষে আবির্ভূত সুমহান্ হিন্দুধর্ম্ম এবং তাহার বিভিন্ন শাখা (বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি) জন্মান্তরবাদে প্রগাঢ় বিশ্বাসী। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় মনীষিগণ জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে কত গভীর গবেষণা করিয়াছিলেন, সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে তাহা উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগে যে সকল হিন্দু মনীষী জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হইলেও আধুনিক ক্রমবিবর্ত্তনবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া স্থলবিশেষে শাস্ত্রীয় জন্মান্তরবাদের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাচীনকালে ইয়ুরোপের গ্রীস এবং আফ্রিকার মিশরদেশে যে ভারতবর্ষ হইতেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমদানী করা হইয়াছিল, তাহা অন্যত্র

* স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 'পুনর্জ্জন্মবাদ' (প্রথম সংস্করণ; পৃঃ ২১) গ্রন্থে ধৃত।

† ঐ

প্রদর্শন করিয়াছি। গ্রীস্‌দেশে শুধু সভ্যতাই নহে; যাবতীয় জ্ঞান, এমনকি ভাষাটি পর্য্যন্ত যে সংস্কৃতের অনুকরণে রচিত হইয়াছে, তাহাও বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি। গ্রীস্‌দেশে প্লেটো কর্ত্তৃক এবং মিশরদেশে বিভিন্ন প্রাচীন মনীষি-কর্ত্তৃক পুনর্জ্জন্মবাদের তথ্যটি হিন্দুদের নিকট হইতে যথাযথভাবেই গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু পরলোকগত পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী অভেদানন্দ এই সম্বন্ধে ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন দেখিয়া লেখনী ধারণ না করিয়া পারিলাম না। স্বামীজী লিখিয়াছেন—

"প্লেটো ও ইজিপ্টবাসীরা বিশ্বাস করিতেন: প্রাণীদের আত্মা একটি শরীর পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষমান যে কোন প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে। হিন্দুরা এই মতবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বিদেহী আত্মা অপেক্ষমান যে কোন প্রাণী শরীরকে আশ্রয় করে না; পরন্তু ক্রমবিকাশনীতি, বাসনা ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী অন্য কোন পার্থিব শরীরকে সে আশ্রয় করে।"—(পুনর্জ্জন্মবাদ, পৃঃ—১২১-১২২)

গ্রীক্ ও মিশরীয় দর্শন আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে তাঁহারা হিন্দুদের মতটিকেই হুবহু অনুকরণ করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের 'তৃণজলৌকান্যায়' এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের "দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ" প্রভৃতি উক্তি অবলম্বনেই প্লেটো ও মিশরীয় দর্শনের মতবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ক্রমবিকাশনীতি, বাসনা এবং প্রবৃত্তি আত্মার দেহান্তর প্রবেশে কিছুটা কার্য্যকরী হয় বটে; কিন্তু কর্ম্মফলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকর। প্লেটো এবং মিশরীয় দার্শনিকেরা সকলেই যে এই কর্ম্মফলকে অস্বীকার করিয়াছেন, এমন মনে হয় না। যাহাই হউক, উল্লিখিত মন্তব্যটি লিখিয়াই যদি স্বামীজী ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে আমি লেখনী ধারণ করিতাম না। কিন্তু ইহার পরে স্বামীজী পুনরায় মন্তব্য করিয়াছেন—"তবে ইহাও সত্য যে, ভারতবর্ষে অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তি আছে, তাহারা বিশ্বাস করে: কর্ম্মফলস্রোতে পড়িয়া অন্যায় ও অসৎকর্ম্ম করিয়া মানবাত্মা তাহার ক্লেশদায়ক ফল ভোগ করিবার জন্য পুনরায় পশুশরীর ধারণ করে।" —(ঐ, পৃঃ—১২৫)।

শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, সাধারণ মনুষ্য তো দূরের কথা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর পাপাচরণ করে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী জন্মে সে শৃগাল, কুকুর প্রভৃতি হীন প্রাণীরূপে এমনকি উদ্ভিজ্জ-রূপেও জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অতএব স্বামীজীর মতে আমি অশিক্ষিতের

পর্য্যায়ে পড়িতেছি। যথার্থই আমি অশিক্ষিত, অথবা স্বামীজীই শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারেন নাই, ইহা বিচার করিবার জন্য কয়েকটি শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদের নিকট ব্যাখ্যাসহ পরিবেশন করিতেছি। স্বামীজী যদি শাস্ত্রপ্রমাণগুলি একেবারেই না দেখিতেন, তাহা হইলে শুধু উক্ত প্রমাণগুলি প্রদর্শন করিলেই হইত ; কিন্তু ইহার পরে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়—শাস্ত্রপ্রমাণগুলি দেখিয়াও স্বামীজী উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য যথা ঃ—

"যদিও হিন্দুদের উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে ও ধর্ম্মগ্রন্থে অন্যায় কর্ম্ম করিলে তাহার ফল স্বরূপ মানবাত্মার অধোগতিরূপ পশু-শরীর ধারণ করিবার কথাও সাধারণতঃ উল্লেখ আছে, তথাপি উপানিষৎ বা ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐ সকল উল্লেখ দ্বারা একথা একেবারে অপরিহার্য্যরূপে বুঝিতে হইবে না যে, বিদেহী আত্মা অন্যায় কর্ম্ম করিলেও তাহার ফল ভোগ রূপে পুনরায় পশু-শরীব ধারণ করিতে বাধ্য হইবে ; কারণ ইহা বিজ্ঞান ও যুক্তি-সঙ্গত যে, মনুষ্য-শরীব ধারণ করিলেও জীবাত্মারা নিম্নস্তরের পশুপ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে ; কেন না মানুষেব মধ্যেও কুকুর, বিড়াল, সর্প প্রভৃতির ন্যায় নীচতা ও হিংসা প্রবৃত্তির বিকাশ দেখিতে পাই।"—ঐ, পৃঃ—১২৬।

এই প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিতে চাই ঃ

১। হিন্দুরা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া থাকেন—

"সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে ॥
তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদথ ॥"

শ্রাদ্ধমাহাত্ম্য স্মরণ কবিবার উদ্দেশ্যেই এই মন্ত্রটি পাঠ করা হইয়া থাকে। এই মন্ত্র পাঠের হেতু ও তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা হরিবংশ গ্রন্থে এবং বিভিন্ন পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। কি ভাবে ৭টি ব্রাহ্মণ-তনয় গোহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিল এবং কিভাবে, উক্ত পাপকার্য্য সম্পাদনের পূর্ব্বে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিয়া সেই পুণ্যের বলে তাহারা হীনযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও জাতিস্মর হইতে পারিয়াছিল এবং জাতিস্মরত্ব লাভের ফলে পরবর্ত্তী জন্মগুলিতে সৎকর্ম্ম সাধন করিয়া পঞ্চম জন্মে পুনরায় ৫ ভাই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঘরে এবং অপর দুই ভাই যথাক্রমে রাজা ও মন্ত্রীর ঘরে

জন্ম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাই উক্ত মন্ত্রটিতে স্মরণ করা হইয়াছে। পাপকর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণতনয়েরা মৃত্যুর পর প্রথমে দশার্ণদেশে ব্যাধরূপে দ্বিতীয়বার কালঞ্জর পর্ব্বতে হরিণরূপে, তৃতীয় জন্মে শরদ্বীপে চক্রবাক পক্ষীরূপে এবং চতুর্থজন্মে মানস সরোবরে হংসরূপে জন্মিয়াছিল। জাতিস্মরত্ব লাভের ফলে ব্যাধজন্মে তাহারা পশু-হিংসায় বিরত ছিল, হরিণজন্মে বৃক্ষ হইতে স্বভাবতঃ পতিত পত্র ভিন্ন আর কিছুই আহার করিত না, চক্রবাক পক্ষীরূপে কোন উদ্ভিদের ক্ষতি করিত না এবং হংসজন্মে মৃণালগুলি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিত না। স্বামিজী কি এই সব কথাকেই রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান?

২। বৌদ্ধদের জাতকগ্রন্থগুলি হইতে জানা যায়—গৌতম বুদ্ধ নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মসমূহে তিনি কখনও সম্ভ্রান্ত মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মপ্রভাবে পরবর্ত্তী জন্মে পশু বা পক্ষীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ সকল জন্মে সৎকর্ম্ম সাধনের ফলে পুনরায় রাজা, মন্ত্রী বা ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। জাতক গল্পগুলিতে অন্যান্য জীবাত্মাদের সম্বন্ধেও এইরূপ বহু উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কুলাবক জাতকে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—পূর্ব্বকালে তিনি মগধদেশে এক সম্ভ্রান্ত যুবকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ জন্মে তাঁহার পরিবারে চারিজন স্ত্রীলোক ছিলেন। সৎকর্ম্মের প্রভাবে ইহাদের মধ্যে তিনজন মৃত্যুর পর দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচারিকারূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু চতুর্থ স্ত্রীলোকটি দুষ্কর্ম্ম সাধনের ফলে মৃত্যুর পর সারসপক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করে [**But Highborn** (চতুর্থ স্ত্রীলোকটির নাম) **having performed no act of merit was reborn as a crane in a grotto in the forest.—The Jataka by E. B. Cowell, Book. I, kulavaka Jataka, (No.-31), p. 81**].

সুবর্ণহংস-জাতকে মহামতি বুদ্ধ বলিয়াছেন—নৃপতি ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন, তখন বোধিসত্ত্ব তথায় এক কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। যথাকালে এক ব্রাহ্মণ-কুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং কালে তাঁহাদের ঘরে নন্দা, নন্দবতী এবং সুন্দরীনন্দা নামে তিনটি কন্যা জন্মে। দুর্ভাগ্য-বশতঃ মেয়েদিগকে পাত্রস্থ করিবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ করেন এবং কৃতকর্ম্মের ফলে হংস-যোনিতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সাধারণ হাঁসের ন্যায় পালক এই হাঁসটির ছিল না। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যবল থাকায় বোধিসত্ত্ব হংসযোনিতে জাতিস্মর হন এবং তাঁহার দেহে সুবর্ণময় পালক জন্মিতে থাকে। তাহার

পূর্ব্বজন্মের স্ত্রী ও কন্যারা অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া এই জাতিস্মর হাঁসের অন্তরে দয়া জন্মে এবং সে একদিন তাহার পূর্ব্বজন্মের বাড়ীতে গিয়া মনুষ্যের ভাষায় তাহার মেয়েদের নিকট নিজ পরিচয় দিয়া বলে—তোমরা আমার দেহ হইতে একগাছি সোনার পালক তুলিয়া নাও। উহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইবে, তাহাদ্বারা তোমাদের কয়েকদিন চলিবে। মেয়েরা তাহাই করিল। এইভাবে কয়েকদিন পর পর এই হংস আসিয়া তাহার পূর্ব্বজন্মের স্ত্রী ও কন্যাদিগকে এক এক গাছি সোনার পালক দিয়া যাইত এবং ইহাদ্বারা তাহারা সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

বব্বুজাতকে বুদ্ধ বলিয়াছেন— এক বণিক্-দম্পতী ৪০ কোটি স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করিয়া ঐগুলিকে নিরাপদ রাখিবার জন্য বনমধ্যে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখে। কালে তাহাদের মৃত্যু হয় এবং উক্ত স্বর্ণমুদ্রার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণের ফলে বণিক্‌পত্নী পরজন্মে মূষিক হইয়া ঐ স্থানে জন্মগ্রহণ করতঃ স্বর্ণমুদ্রাগুলিকে পাহারা দিতে থাকে। এইভাবে অন্যান্য জাতকেও বলা হইয়াছে ধনবান্ লোকেরা সঞ্চিত ধন ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পর কখনও সর্পরূপে কখনও বা মূষিকরূপে তথায় জন্মগ্রহণ করিয়া উল্লিখিত ধন পাহারা দেয়। স্বামী অভেদানন্দ কি গৌতমবুদ্ধের উল্লিখিত উক্তিগুলিকে মিথ্যাভাষণ বলিতে চান? অথবা তাঁহার মতে গৌতমবুদ্ধ অশিক্ষিত ছিলেন?

বস্তুতঃ উপনিষদ্, স্মৃতি, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে স্বামীজীর উল্লিখিত যুক্তির বিরুদ্ধেই প্রমাণসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদ্ বেদের সারাংশ; সুতরাং ইহার প্রামাণ্য কোন হিন্দুই অস্বীকার করিতে পারেন না। কঠোপনিষদ্ বলেন—মানুষ জীবদ্দশায় যেরূপ কর্ম্ম করে বা যেরূপ জ্ঞানের চর্চ্চায় সময়পাত করে, মৃত্যুর পর পুনরায় সে তদনুসারে কখনও পশু, পক্ষী প্রভৃতি হীনযোনিতে, এবং কখনও বা উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযান্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতম্॥"

—কঠোপনিষদ্ ২।২।৭

মূলে যে দুইটি শব্দ আছে—যোনি ও স্থাণু, তাহাদের মধ্যে প্রথমটির অর্থ পশু, পক্ষী প্রভৃতির যোনি এবং দ্বিতীয়টির অর্থ বৃক্ষ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ।

মনুসংহিতা হইতে জানা যায়—উল্লিখিত যোনি শব্দটি শুধু পশু, পক্ষী প্রভৃতির

যোনি অর্থেই ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর এমন কি ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর মানুষের যোনি অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমবিকাশনীতি অনুসারে উন্নততর মনুষ্যযোনিতে, এবং অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যের নিম্নতর শ্রেণীতে এমন কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এখানে ক্রমবিকাশনীতি কার্য্যকরী হয় না। তাহা ছাড়া অপকর্ম্ম-বিশেষের ফলে বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবরযোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিরূপ পাপকর্ম্মের ফলে মানুষ পরজন্মে কি প্রকার শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাও মনু স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে মানুষ হস্তপদাদি অঙ্গদ্বারা গুরুজন বা কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে আঘাত করিলে এইরূপ পাপের ফলে সে মৃত্যুর পর বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জরূপে জন্মগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, পুরুষ অপরাধী বৃক্ষরূপে এবং স্ত্রী অপরাধী লতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কাহাকেও বৃথা কুবাক্য বলিলে, এইরূপ অপরাধের ফলে সে মৃত্যুর পর পশু বা পক্ষীরূপে এবং শুধুমাত্র মনে মনে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মৃত্যুর পর চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥" মনু ১২ | ৯

পাঠক মহোদয়গণ ভাবিয়া দেখুন—এক প্রকার পাপের ফলে অন্ত্যজাতিতে (নিম্নশ্রেণীর মনুষ্যযোনিতে) এবং অন্য প্রকার পাপের ফলে যথাক্রমে পশু, পক্ষী এবং স্থাবর (বৃক্ষাদি) রূপে জন্মগ্রহণ করিবার কথা বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু কি তাত্ত্বিক অর্থেই পশু, পক্ষী প্রভৃতি শব্দের গ্রহণ করেন নাই? স্বামিজীর অনুমান যদি সত্য হইত, তাহা হইলে উল্লিখিত প্রকার তিনটি শ্রেণীর বিভাগ করতঃ তাহাতে হীনশ্রেণীর মনুষ্য ও উদ্ভিজ্জকে অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজন হইত কি? বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জগণ যে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফলে মনুষ্য প্রভৃতি শ্রেণী হইতেও আসিয়া জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাও মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। মনু তো স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ-সমন্বিতাঃ॥" মনু ১ | ৪৯

(পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে ইহারা অজ্ঞানতা, অক্ষমতা প্রভৃতি নানারূপ দোষে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মনুষ্যাদি প্রাণীর ন্যায় ইহাদেরও সুখদুঃখের

অনুভূতি আছে, পার্থক্য এই যে ইহারা নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করিতে পারে না।)

যদিও উপনিষদ্ এবং মনুসংহিতার উক্তিগুলিদ্বারাই আমার প্রতিপাদ্য বিষয় উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে; তথাপি উল্লিখিত তথ্য যে অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও লিপিবদ্ধ আছে, তাহা জানাইবার জন্য অন্যান্য স্মৃতিসংহিতা হইতেও কিছু প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। মনুর ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্যও বলেন—আর্য্যবংশে জন্মিয়াও যদি মানুষ মনঃ, বাক্য, বা দৈহিক কর্ম্মদ্বারা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তবে সে যথাক্রমে অন্ত্যজাতীয় মনুষ্য, পক্ষী এবং স্থাবররূপে পরবর্ত্তী জন্মে দেহ ধারণ করিয়া থাকে।

"অন্ত্যপক্ষিস্থাবরতাং মনোবাক্-কায়কর্ম্মজৈঃ।
দোষৈঃ প্রযাতি জীবোঽয়ং ভবং যোনিশতেষু চ॥"

—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ৩। ১৩১

যাজ্ঞবল্ক্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—আর্য্যবংশে জন্মিয়াও যে সকল মনুষ্য পরদ্রব্য আত্মসাৎ করিবার চিন্তা বা অন্যভাবে পরের অনিষ্টচিন্তা করে অথবা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তাহারা পরজন্মে অন্ত্যমনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে। মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও কূটসাক্ষী-প্রদাতা লোকেরা পরজন্মে পশু ও পক্ষীরূপে দেহধারণ করে। যাহারা পরস্বাপহরণ করে বা পরস্ত্রীতে উপগত হয়, অথবা শাস্ত্রবিগর্হিত উপায়ে হিংসা করে, তাহারা উদ্ভিজ্জাদি স্থাবররূপে জন্মান্তর লাভ করিয়া থাকে।

"পরদ্রব্যাণ্যভিধ্যায়ংস্তথানিষ্টানি চিন্তয়ন্।
বিতথাভিনিবেশী চ জায়তেঽন্ত্যাসু যোনিষু॥
পুরুষোঽনৃতবাদী চ পিশুনঃ পুরুষস্তথা।
অনিবদ্ধপ্রলাপী চ মৃগপক্ষিষু জায়তে॥
অদত্তাদাননিরতঃ পরদারোপসেবকঃ।
হিংসকাশ্চাবিধানেন স্থাবরেষ্বভিজায়তে॥

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ৩। ১৩৪-১৩৬

যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলিয়াছেন—ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকভোগান্তে পুনঃ পুনঃ হরিণ, কুকুর, শূকর ও উষ্ট্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। বহুজন্ম এইভাবে অতিক্রান্ত হইলে সে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। এইভাবে সুরাপানকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকভোগান্তে বহুজন্ম গর্দ্দভ এবং অতঃপর পুক্কশ ও বেন নামক অন্ত্যজযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় আর্য্যকুলে জন্মিয়া শ্যাবদন্ত

(মলিন ও বিকৃত দন্তযুক্ত) হয়। স্বর্ণহরণকারী তস্কর মৃত্যুর পর নরকভোগান্তে পুনঃ পুনঃ কৃমি, কীট ও পতঙ্গরূপে জন্মিয়া তাহার পর মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে এবং তখন তাহার হস্ত ও পদের নখগুলি কুৎসিত থাকিয়া তাহার অতীত পাপের সাক্ষ্য দান করে।

"মৃগশ্বশূকরোষ্ট্রাণাং ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি।
খরপুক্কশবেনানাং সুরাপো নাত্র সংশয়ঃ ॥
কৃমিকীটপতঙ্গত্বং স্বর্ণহারী সমাপ্নুয়াৎ।
... ...
ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ।
হেমহারী চ কুনখী দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ ॥"

—যাজ্ঞবল্ক্য ৩ | ২০৭-২০৯

অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও এই বিষয়ে এত বেশী প্রমাণ আছে যে, মানুষ কুকর্ম্ম করিলে যে মৃত্যুর পর যথার্থই পশু, পক্ষী, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে —ইহা নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায়। বিশেষ বিবরণের জন্য ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উদ্ভিজ্জের দেহে আত্মা আছে কি না ?

একদা ঋষিপ্রতিম বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ৺জগদীশচন্দ্র বসু মনুসংহিতার একটি শ্লোক দেখিয়া ভাবিতে আরম্ভ করেন—"তবে কি যথার্থই উদ্ভিজ্জের দেহে প্রাণ ও অনুভবশক্তি আছে ?" উল্লিখিত শ্লোকটিতে মনু বলিয়াছেন যে বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পূর্ব্বজন্মের গুরুতর পাপের ফলে উল্লিখিত স্থাবরযোনি লাভ করিয়া সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রকাশ করিতে পারে না ; কেবল নিজের অন্তরেই অনুভব করে। মনুসংহিতার উল্লিখিত শ্লোকটি ("তমসা বহুনৈতেন " ইত্যাদি) পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই শ্লোকটি পাঠ করিয়াই মহাত্মা জগদীশচন্দ্র বসু নূতনভাবে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, সত্যই বৃক্ষ-লতাদি উদ্ভিজ্জের দেহে প্রাণ এবং সুখদুঃখের অনুভূতি আছে। প্রাচীনতম স্মৃতিসংহিতাগ্রন্থে উল্লিখিত প্রকার উক্তি আছে বলিয়া জানিতে পারিয়া বহু প্রাচীনকাল হইতে পশ্চিমদেশেও অনুরূপ বিষয়ে গবেষণা হইয়াছে এবং কোন কোন পশ্চিমদেশীয় মনীষী উদ্ভিজ্জের দেহে জীবাত্মা আছে বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বজন্মের কৃত পাপের ফলে বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জেরা স্থাবরযোনি লাভ করিয়াছে বলিয়া মনু যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে উদ্ভিজ্জের দেহে জীবাত্মাও বিদ্যমান।

শুধু মনুসংহিতাতেই নহে, তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী উপনিষদ্‌সমূহে এবং যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি পরবর্ত্তী স্মৃতিগ্রন্থসমূহেও যে পাপের ফলে কোন কোন প্রাণীর উদ্ভিজ্জাদি-স্থাবরত্বলাভের কথা বিঘোষিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে প্রদর্শন করিয়াছি।

মৃত্যুর পর মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই এই পার্থিব দেহ বিনষ্ট হয়। পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার কালে তাহার জীবাত্মা শুধু পূর্ব্বজন্মের সূক্ষ্ম সংস্কারমাত্র লইয়া কর্ম্মানুযায়ী যোনিতে প্রবেশ করে এবং কালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতএব উল্লিখিত শাস্ত্রবচনসমূহ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির দেহে যেমন জীবাত্মা অবস্থান করেন, বৃক্ষ-লতাদি উদ্ভিজ্জের দেহেও তেমনি তাঁহার

অধিষ্ঠান আছে। জীবাত্মাই সুখ, দুঃখ প্রভৃতির অনুভবকারী। মনুষ্যের দেহস্থিত জীবাত্মার ন্যায় পশু, পক্ষী, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি সকলের দেহস্থিত জীবাত্মাই ঐ সকল দেহের সম্পর্কিত সুখদুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকেন। জীবাত্মাই প্রজনন-শক্তির উৎপাদক। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জেরাও যে বীজ, ফল, ফুল, চারা প্রভৃতি সন্তান প্রসব করে, ইহাও বস্তুতঃ তাহাদের দেহস্থিত জীবাত্মারই ক্রিয়া। মনুষ্যদেহের জীবাত্মা যেমন আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণপূর্ব্বক দেহযন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে পরিপাক করিয়া রক্তমাংসাদি গঠন করে, উদ্ভিজ্জের দেহস্থ জীবাত্মাও তেমনি খাদ্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক উদ্ভিজ্জের দেহের অংশ ও রস প্রস্তুত করিয়া থাকে। এইরূপে সুখদুঃখের অনুভূতি, প্রজননশক্তি, এবং বাল্য, কৈশোর, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থান্তর দেখিয়া নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায় যে মনুষ্যাদি-প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিজ্জের দেহেও জীবাত্মা বিদ্যমান। যে কারণে কেহ মনুষ্য, কেহ পশু বা পক্ষী, এবং কেহ উদ্ভিজ্জরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

স্বর্গত পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার 'জন্মান্তররহস্য' নামক গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে উদ্ভিজ্জের দেহে জীবাত্মা নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বমতের সমর্থনে কতকগুলি যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যুক্তিগুলি আমার বিবেচনায় বিচারসহ নহে। তাঁহার মতটি যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত শাস্ত্রবচনগুলি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উল্লিখিত গ্রন্থের ১৭শ সংস্করণ (১৩৫৭ সালে প্রকাশিত) দেখিয়াছি ; সুতরাং উহা হইতেই তাঁহার উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিব।

শিষ্যের এক প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কল্পিত গুরু বলিয়াছেন—"বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, পর্ব্বত প্রভৃতির দেহে আত্মা নাই।" বস্তুতঃ পাহাড়, পর্ব্বত প্রভৃতির দেহে যে আত্মা নাই, এই বিষয়ে আমরাও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত একমত। "অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি" (পাথরের হৃদয় নাই) প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যও এইরূপ মতই প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির দেহে আত্মার অনস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কল্পিত শিষ্য সম্ভবতঃ সংস্কৃত মহাভারত গ্রন্থখানি পড়েন নাই, যদি পড়িতেন তাহা হইলে মহাভারত হইতেই যে যুক্তি দেখাইতে পারিতেন, তাহার জন্য পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতদের শরণ লওয়ার প্রয়োজন হইত না ; কারণ মহাভারতোক্ত যুক্তিগুলির মধ্য হইতেই কয়েকটি যুক্তিমাত্র পশ্চিম-

দেশীয় মনীষীরা এই বিষয়ে প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কল্পিত শিষ্য ও গুরুর প্রশ্নোত্তরগুলিই আলোচনা করিব।

শিষ্যের প্রশ্ন: 'ইয়ুরোপীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্যার সমধিক চর্চ্চার ফলে এস্থলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রাণিগণের যেরূপ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ হইয়া সন্তান উৎপত্তি হয়, উদ্ভিদেরও সেইরূপ স্ত্রীকেশরে পুংরেণু (পরাগ) পতিত হইয়া বীজ জন্মে এবং ইহাদেরও মরা বাঁচা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই বিদ্যমান আছে।"

গুরুর উত্তর: "স্ত্রীকেশরে পুংরেণুর পতন 'বীজোৎপত্তির সাফল্য' ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ ক্রিয়াই জীবনধাতুর উৎপাদন করিয়া থাকে।" স্বমতের সমর্থনে গুরু যুক্তি দেখান—প্রত্যেক উদ্ভিজ্জে অসংখ্য জীবনধাতুপুঞ্জ আছে। কোন বৃক্ষের শাখা ছেদন কবিলে কতকগুলি পুঞ্জ পৃথক হইয়া পড়ে। তাহাতে মূলবৃক্ষের ক্ষতি হয় না; বরং ছিন্ন শাখা হইতে আর একটি নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাদ্বারা দেখা যায়, উদ্ভিজ্জের সর্ব্বদেহে একত্ব নাই। এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া গুরু মন্তব্য করেন: "অতএব উদ্ভিজ্জ সজীব পদার্থ হইলেও আত্মার আশ্রয় নহে।"

পাঠক মহোদয়গণ ভাবিয়া দেখুন—স্ত্রীপুরুষের যৌন মিলনের ফলে মানবীর, স্ত্রীপশুর বা পক্ষিণীর যে গর্ভসঞ্চার হয়, তাহারও হেতু 'বীজোৎপাদনহেতু সাফল্য ক্রিয়া' ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উল্লিখিত যুক্তি মনুষ্য-জন্মের প্রকার হইতে উদ্ভিজ্জ-জন্মের প্রকারকে পৃথক্ করিতে পারিতেছে না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অপর উক্তিটিও লক্ষ্য করিবার মত। তিনি বলিয়াছেন, উল্লিখিত সাফল্য-ক্রিয়াই "জীবনধাতুর উৎপাদন করিয়া থাকে।" জীবনধাতু মানে কি? ইহা কি জীবাত্মা হইতে পৃথক্? বস্তুতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথাদ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, নারীপুরুসের যৌন মিলনের ফলে যেমন মনুষ্যাদির গর্ভে নূতন জীবাত্মার আবির্ভাব ঘটে, ঠিক তেমনি উদ্ভিজ্জের স্ত্রীকেশর ও পুংরেণুর মিলনের ফলেই উদ্ভিজ্জের দেহেও নূতন জীবাত্মার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে; কারণ জীবাত্মা ও তথাকথিত জীবনধাতু অভিন্ন।

উদ্ভিজ্জেব সর্ব্বদেহে একত্ব নাই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাও আমাদের বিবেচনায় অসিদ্ধ। একটি বৃক্ষ বা লতার গোড়া কাটিয়া ফেলিলে তাহার সর্ব্বদেহই নিষ্প্রাণ হইয়া যায়। একটি কুষ্মাণ্ড-লতা যখন ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হইয়া যৌবনগর্ব্বে নূতন নূতন শাখাবিস্তার করতঃ ঘরের চালখানা আচ্ছাদন করিয়া থাকে, তখন তাহার গোড়ায় একটিমাত্র দা-এর কোপ লাগাইলে সেই বৃক্ষ হইতে

আর কেহ নূতন ফল, ফুল বা আগা পাইবে কি ? একটি বিশাল মুকুলিত আম্রবৃক্ষের মূল ছেদন করিলে সেই বৃক্ষ আর বাঁচে না। এই সকল ঘটনা তো আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং দেখা যায়, মনুষ্য-দেহের ন্যায় উদ্ভিজ্জের দেহেও একত্ব আছে। বৃক্ষের দুই চারিটি শাখা বা লতার অগ্রভাগের কিছু অংশ কাটিয়া ফেলিলে সম্পূর্ণ বৃক্ষ বা লতাটি মরিয়া যায় না সত্য ; কিন্তু অনুরূপ অবস্থা তো মনুষ্যাদিপ্রাণীর দেহেও দেখা যায়। দুইখানা হাত এবং দুইখানা পা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, অথচ সেই মানুষটি স্বাভাবিকভাবেই জীবিত আছে এবং বাক্যালাপ, আহার ইত্যাদি সব কিছুই করিতেছে—এরূপ অবস্থাও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। উল্লিখিত কারণে যদি উদ্ভিজ্জের সর্ব্বদেহে একত্ব নাই বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে মনুষ্যাদিপ্রাণীরও সর্ব্বদেহে একত্ব নাই। কেঁচো প্রভৃতি চলচ্ছক্তিসম্পন্ন প্রাণীর দেহে জীবাত্মা আছে বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীকার করেন ; অথচ কেঁচোর দেহের একাংশ কাটিয়া ফেলিলে আবার তাহা গজাইয়া উঠে। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যুক্তি টিকিল না। উল্লিখিত যুক্তির উপর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা আরও অদ্ভুত। তিনি বলিয়াছেন: "উদ্ভিজ্জ সজীব পদার্থ হইলেও আত্মার আশ্রয় নহে।" বস্তুতঃ জীব মানেই জীবাত্মা ; অতএব উদ্ভিজ্জকে সজীব পদার্থরূপে স্বীকার করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেই সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, উদ্ভিজ্জের দেহে জীবাত্মা আছে।

শিষ্যের অপর প্রশ্ন: "ওয়াট্ সাহেব বলেন যে, কোন কোন উদ্ভিজ্জমধ্যে অনুভবশক্তির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি লজ্জাবতীলতা, তেঁতুল, আমরুল, এবং দার্জ্জিলিং, বিহার ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের মাংসাশী বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন।"

গুরুর উত্তর: "আমার ধারণা, এই ঘটনার (লজ্জাবতীলতার পত্রের সঙ্কোচনাদির) প্রকৃত কারণ পত্র ও বৃন্তের সঞ্চার-নিবন্ধন জীবনধাতু-প্রবাহের কথঞ্চিৎ স্থিরতা বা মন্দগতি। তেঁতুল আদির পাতা সন্ধ্যাসমাগমে মুদ্রিত হয়। ওয়াট্ সাহেবের মতে ইহাই উহাদিগের নিদ্রার লক্ষণ। কিন্তু তাহা আলোক ও তাপের ন্যূনতানিবন্ধন জীবনধাতুর জৈবনিক গতির শিথিলতা।"

স্বমতের সমর্থনে গুরু যুক্তি দেখাইয়াছেন: "এই সমস্ত ঘটনা হইতে উদ্ভিজ্জের জ্ঞান ও চিন্তা অনুমান করিলে আমাদের আমাশয় এবং মাংসপেশীরও জ্ঞান এবং চিন্তা আছে বলিতে হইবে ; কারণ ভুক্তবস্তু পুষ্টিকর হইলে আমাশয় তাহাকে

সমুচিত কাল রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করে ; কিন্তু পুষ্টিকর না হইলে তাহা অগৌণে বহির্গত করিয়া দেয়, এবং মাংসপেশী কখন কখন এরূপ কম্পিত ও স্পন্দিত হয় যে, তাহা আমরা বিশেষ যত্ন করিয়াও নিবারণ করিতে পারি না।" এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া গুরু দৃঢ়তার সহিত শিষ্যকে উপদেশ দিয়াছেন : "অতএব উদ্ভিজ্জ ও স্থাবরাদির জ্ঞান, চিন্তা বা আত্মা নাই, ইহাই স্থির জানিও।"

পাঠক মহোদয়গণ ভাবিয়া দেখুন—লজ্জাবতী লতা ও তিন্তিড়ি বৃক্ষের মধ্যে জীবনধাতুর অস্তিত্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ জীবনধাতু ও জীবাত্মা যে অভিন্ন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্তি-দ্বারাই স্থির হইল যে, উদ্ভিজ্জের দেহে জীবাত্মার অবস্থিতি আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি যে যুক্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহা মোটেই বিচারসহ নহে। প্রাণিদেহস্থিত আমাশয় বা পাকস্থলী যে আহার্য্য জীর্ণ করে, উহা তাহার নিজস্ব ক্রিয়া নহে। এঞ্জিনের চালকের ইচ্ছায় যেমন এঞ্জিন চলে, ঠিক তেমনি দেহস্থিত আত্মার ইচ্ছানুসারে আমাশয় ও পাকস্থলী তাহাদের কার্য্য করিয়া থাকে। মাংসপেশীর স্পন্দনও আত্মার ইচ্ছানুসারেই সম্পাদিত হয়। দেহস্থিত মন কোন কোন সময়ে আত্মার অবাধ্য হইতে চায় বটে, কিন্তু সুদক্ষ রথী যেমন রথের ঘোড়াগুলিকে নিজের ইচ্ছামত দিকে লইয়া যান, ঘোড়ার ইচ্ছামত দিকে নহে ; তেমনি জীবাত্মার ইচ্ছায়ই উল্লিখিত মাংসপেশীর স্পন্দনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, মনের ইচ্ছায় নহে।

উদ্ভিজ্জের দেহে আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ কবিবার জন্য ৺সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ওয়াট্ সাহেবের 'উদ্ভিদ্ বিদ্যার প্রথম সোপান' নামক পুস্তকের ৩০ তম পৃষ্ঠা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া উহা খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন ; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহা তিনি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। উল্লিখিতস্থানে ওয়াট্ সাহেবের উক্তি যথা : "দুইটি চারা পরস্পরের নিকট রোপণ করতঃ একটিকে পতঙ্গাদি প্রাণী পদার্থ দিয়া এবং অপরটিকে না দিয়া দেখিতে হয়, যে চারা প্রাণিপদার্থ বা পোকা পায়, তাহা অবশ্যই বাড়ে। অতএব অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হয় যে সে জ্ঞানপূর্ব্বক পোকাগুলি ভক্ষণ করে।" ওয়াট্ সাহেবের উল্লিখিত মত খণ্ডনের জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, ঐরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটিও যুক্তিসঙ্গত হয় : 'রাম পীড়ানিবন্ধন সংজ্ঞাহীন হইয়া প্রলাপ বকিতেছে। ঔষধ পথ্য ঐ অবস্থায় উদরস্থ হইয়া রোগের উপশম ও শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছে।

·········অতএব অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হয় যে, সে জ্ঞানপূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্য ভক্ষণ করিতেছে।"

ইহার উত্তরে আমরা বলিব : রুগ্ন ব্যক্তি প্রলাপ বকিবার সময়েও সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহীন হয় না; কারণ তখনও ঔষধ খাওযার জন্য মুখব্যাদান করিবার কথা বলিলে সে মুখব্যাদন (হা) করে, এবং 'ঔষধ গিলিয়া খাও' বলিলে গিলিয়া খায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, তাহার কিছুটা জ্ঞান তখনও বিদ্যমান থাকে। যতক্ষণ দেহে আত্মা আছেন, ততক্ষণই তাহার পক্ষে ঔষধ সেবন সম্ভব। আত্মা নির্গত হইয়া গেলে আর সেই অচেতন দেহ ঔষধ সেবন করিতে পারে না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশ্বাস করেন : "সেই আবদ্ধ কীট বৃক্ষাদির পাচকরস-প্রভাবে জীর্ণ হইয়া লীন হয়।" ইহা সত্য; কিন্তু সেই পাচকরস ও তাহার কার্য্যকারিতা কে সৃষ্টি করে, তাহা তিনি চিন্তা করেন নাই। বস্তুতঃ উদ্ভিজ্জদেহস্থিত আত্মাই ঐরূপ পাচকরস সৃষ্টি করতঃ তাহাদ্বারা উদ্ভিজ্জের ভোজ্যপদার্থ জীর্ণ করাইয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে স্বমতের সমর্থনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে দৃষ্টান্তটি দেখাইয়াছেন, তাহাও বস্তুতঃ অগ্রাহ্য। তিনি লিখিয়াছেন—"ডাক্তার স্কালিঞ্জেনী একটা কাককে কিয়ৎ পরিমাণ মাংস ভক্ষণ করাইয়াই বধ করেন। তাহার মৃতদেহ জীবিত পক্ষীর উষ্ণতায় ৬ ঘণ্টা রাখিয়া উদর খুলিলে দৃষ্ট হইয়াছিল যে ভুক্তমাংস সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এস্থলে আত্মা ও জীবন-বিহীন কাকদেহ মাংস জীর্ণ করিতে পারিয়াছে।"

আমরা বলিব—ডাক্তার স্কালিঞ্জেনী যে ভাবে কাকটিকে হঠাৎ বধ করিয়া যেরূপ অবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আপাতদৃষ্ট মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত কাকের দেহের সহিত তাহার আত্মার সংযোগ ছিল। কোন প্রাণীর মৃত্যুকালে তাহার আত্মা সহজে পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিতে চায় না। আত্মাটি দেহ হইতে বহির্গত হওয়ার পরও আতিবাহিক দেহ ও মৃতদেহের মধ্যে একটা তড়িৎবস্তুর সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং ইহারই ফলে মৃত্যুর পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৃতদেহটি উষ্ণ থাকে। এই সত্য কথাটি ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেও স্বীকার করিয়াছেন। আমেরিকার বোষ্টন নিবাসী ডাক্তার এণ্ড্রু ডেভিস্ জ্যাকসন সাহেবের গ্রন্থ হইতে উক্ত সাধন-সম্পন্ন পরলোকতত্ত্ব-গবেষকের একটি নিজস্ব উপলব্ধির বিবরণ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া উহার সমর্থনে উল্লিখিত প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন।

উপরে যে উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'জন্মান্তররহস্য'

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৯০-৯১ হইতে গৃহীত। এখন যাহা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা উক্ত গ্রন্থের ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠার অন্তর্গত। এক বৃদ্ধার মৃত্যুকালে তথায় উপস্থিত থাকিয়া সাধনাশক্তির সাহায্যে নিজের ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে প্রবলতর করিয়া মনীষী ডাক্তার ডেভিস্ জ্যাকসন যাহা দেখিয়াছিলেন তাঁহার ভাষায় তাহা নিম্নপ্রকার—

"……দেখিলাম, বৃদ্ধার আত্মা উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়া তাহার মৃত শরীরের মস্তকের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। দেহ ও আত্মার এতদিনের ভালবাসাবাসি এতদিনের একত্র বাস, এতদিনের স্নেহ অনুরাগ যেন ছিঁড়িয়াও ছিঁড়িতে চাহে না। স্বামিগৃহগামিনী যুবতী বধূর মত আপনার পূর্ণ কৃতার্থতা, পূর্ণ-প্রণয়ের দেশে যাইতেও যেন একটি করুণাশৃঙ্খল তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরে, যেন দশবার অগ্রসর হইতে গিয়া বিশবার সেই পুরাতন ত্যক্ত গৃহখানি, সেই প্রিয়তম আবাল্যের স্নেহনীড়ের দিকে ফিরিয়া চাহিতে হয়।

দেখিলাম, আতিবাহিক দেহের শূন্যস্থ চরণ ও বৃদ্ধার সেই ভূমিশায়িত মৃত-দেহের মস্তকের মধ্যে একটি জীবনী-তড়িতের সূক্ষ্ম উজ্জ্বল, রন্ধনরজ্জু পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, মানুষে যাহাকে মৃত্যু কহে, তাহা একটি নবজন্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংসারে নাভিরজ্জু গলায় করিয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, মরণের পর অতীন্দ্রিয় রাজ্যে এইরূপ সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় জীবনী-রজ্জু লইয়া আতিবাহিক দেহের জন্ম হয়। জীবনীরজ্জু বা সূক্ষ্ম তড়িৎ-তন্তু ক্ষণকালের জন্য মৃতদেহ ও আতিবাহিক দেহকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখিয়া দেয়। সেইজন্যই মৃত্যুর পর এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলেও একটু জীবনীতড়িৎ মৃতদেহে ফিরিয়া আসে।"

শুধু ডাক্তার ডেভিস্ জ্যাকসনের উল্লিখিত অভিজ্ঞতাই নহে, অন্যান্য পরলোকগত আত্মার উক্তি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পরও যতক্ষণ দেহ উষ্ণ থাকে, ততক্ষণই তাহার সহিত জীবাত্মার সংযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ডাক্তার স্পালিঞ্জেনীকর্তৃক নিহত কাকের দেহে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহার জীবাত্মা অবস্থান করিয়াই উহার উদরস্থ মাংস জীর্ণ করাইয়াছিলেন। সুতরাং উদ্ভিজ্জের দেহে জীবাত্মা নাই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাদের কোনটাই টিকিল না।

মনুষ্য বা কোন জীবিত প্রাণীর দেহ হইতে একাংশ কর্ত্তন করিলে উহা পচিয়া

নষ্ট হয়, কিন্তু কোন কোন উদ্ভিজ্জের শাখা কর্ত্তন করিয়া অন্যত্র রোপণ করিলে তাহা হইতে নূতন উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি হয়—এই দৃষ্টান্ত দ্বারাও উদ্ভিজ্জের দেহে জীবাত্মার অভাব প্রমাণিত হয় না ; কারণ উদ্ভিজ্জের দেহস্থিত জীবকোষ প্রাণি-দেহস্থ জীবকোষের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ধরণের। এই কারণেই উদ্ভিজ্জেরা প্রাণীর ন্যায় কথা কহিতে বা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না। মনুষ্যের দেহস্থিত প্রতিটি রক্তবিন্দুতে অসংখ্য শুক্রকীট বিদ্যমান থাকে। চিত্তে কাম-প্রবৃত্তির উদয় হইলে ক্রমে সর্ব্বদেহ হইতে ক্ষরিত হইয়া শুক্রধাতু নির্দ্দিষ্ট আধারে সঞ্চিত হয়, এবং জননেন্দ্রিয়পথে নির্গত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

"মধ্যে তু হৃদয়স্যৈকা শিরা তত্র মনোবহা।
শুক্রং সঙ্কল্পজং নৃণাং সর্ব্বগাত্রৈর্বিমুঞ্চতি ॥"

উদ্ভিজ্জের সর্ব্বদেহেও এই প্রকার অসংখ্য শুক্রকীট থাকে ; তবে তাহাদের নির্গত হওয়ার রাস্তা একটি মাত্র নহে ; এইটুকু পার্থক্য। উদ্ভিজ্জদেহের বিভিন্ন তন্তু দিয়া ঐসকল জীবনোৎপাদক শুক্রকীট নির্গত হইতে পারে। এই কারণেই একই বৃক্ষ বা লতা হইতে বহু শাখা-প্রশাখা নির্গত হয় এবং কোন কোন উদ্ভিজ্জের কর্ত্তিত অংশও উপযুক্ত পরিবেশ পাইলে নূতন উদ্ভিজ্জরূপে নবজীবন লাভ করিতে পারে। মনুষ্যদেহের অসংখ্য শুক্রকীটেরা যেমন প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক্ মনুষ্যাকারে রূপান্তরিত হইতে পারে, উদ্ভিজ্জ-দেহস্থ অসংখ্য জীবাণুও তেমনি নূতন নূতন উদ্ভিজ্জদেহ ধারণ করিতে সমর্থ। ইহাদ্বারা উদ্ভিজ্জদেহে আত্মার অভাব প্রমাণিত হয় না। অতএব, উদ্ভিজ্জদেহে আত্মা আছেন, এবং পাপের ফলেই মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীরাও পুনরায় উদ্ভিজ্জরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া যে সকল শাস্ত্রবাক্য আছে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাস্তিকতার হেতু

স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। একদল ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং অপরদল করেন না। ভারতীয় সভ্যতাই পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম। এই কারণে অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশের বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত আস্তিক ও নাস্তিকদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের উল্লেখ দেখা যায়। বেদোক্ত আর্য্য ও অনার্য্যের সংগ্রাম বস্তুতঃ আস্তিক ও নাস্তিকদের সংগ্রাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদ-সংহিতার ১।১২৯।১১ মন্ত্রে ইন্দ্রকে পাপিষ্ঠ রাক্ষসদের হত্যাকারী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (হন্তা পাপস্য রক্ষসস্ত্রাতা বিশ্বস্য মাবতঃ)। ইহা হইতে বুঝা যায়—ঋগ্বেদের যুগেও একশ্রেণীর নাস্তিক দুর্বৃত্তের দল ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করিত এবং তাঁহাদের যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া দিত। ৩।১০।১৬ মন্ত্রে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে—"হে মঘবন্! তুমি রাক্ষসদিগকে বধ কর এবং তাহার পর যজ্ঞ সম্পন্ন কর।"

বিভিন্ন পুরাণে যে দেবাসুর-যুদ্ধের বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাও আস্তিক-নাস্তিক সংগ্রামেরই ইতিহাস। অসুর শব্দটি যে প্রাচীনকালে 'দেবতা-বিরোধী' অর্থে (ন সুর = অসুর) ব্যবহৃত হইত, প্রাচীন ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। নঞ এর ৬টি বিভিন্ন অর্থ প্রদর্শন করিবার সময় অসুর শব্দের নঞ্‌টি যে বিরোধ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ন্যায়শাস্ত্রের শব্দখণ্ডে এবং স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রে তাহা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হইয়াছে।

পাণিনির সূত্র 'অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ' হইতে জানা যায়—পরলোক আছে বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই আস্তিক-পদবাচ্য, এবং যাঁহাদের মতে পরলোক নাই, তাঁহারাই নাস্তিক নামে অভিহিত। পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেই ধর্ম্মকার্য্য বা সৎকার্য্য সাধনেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়। অতএব, আস্তিকেরা স্বভাবতঃই ধর্ম্মভীরু ও সৎকার্য্যসাধনে তৎপর হইয়া থাকেন। তাঁহারা নিজে না খাইয়াও পরকে খাইতে দেন এবং ইহজীবনে নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও পরজীবনের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ে যত্নবান্ হন।

অপরপক্ষে নাস্তিকদের পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস না থাকায় তাহারা ঘোর স্বার্থপর হইয়া উঠে। তাহাদের বিবেচনায়—এই জন্মই সবকিছু। অতএব, যেমন করিয়াই হউক, ইহজীবনে যথাসাধ্য সুখ-সুবিধা ভোগ করিবার জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগে। নিজেদের ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে তাহারা নরহত্যা, নারীহরণ, চৌর্য্য, বঞ্চনা, দেশদ্রোহ প্রভৃতি কোন কিছুর সাধনেই পরাঙ্মুখ হয় না। চার্ব্বাক তো স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য ভূতস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?।।"

—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ ; চার্ব্বাকদর্শনম্।

প্রত্যেকেই যদি ঋণ করিয়া ঘৃতাদি ভোগ্য পদার্থ ভোগ করিতে চায়, তাহা হইলে ঋণ দিবে কে ?—এই কথাটিও নাস্তিকেরা চিন্তা করিয়া দেখে না। তাহারা জানে—ধর্ম্মপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ লোকের সংখ্যাই জগতে অধিক ; সুতরাং তাহাদের ঋণ পাইতে এবং যথেচ্ছ ভোগে তাহা ব্যবহার করিতে কোন অসুবিধা হইবে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—মানুষের মধ্যে কেহ আস্তিক এবং কেহ নাস্তিক হয় কি কারণে ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রথমে সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, সৎসঙ্গ, চিন্তাশীলতা, দূরদর্শিতা ও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধিই আস্তিকতার হেতু এবং অসৎসঙ্গ, চিন্তাশক্তির অভাব, অদূরদর্শিতা ও পক্ষপাতদুষ্ট বিচারবুদ্ধি হইতেই নাস্তিকতার উদ্ভব হয়। কিন্তু এত সংক্ষেপে এতবড় একটা প্রশ্নের উত্তর দিলে অনেকেই তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, অতএব বিশ্লেষণ ও উদাহরণের সাহায্যে কথাগুলিকে স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করা যাক্।

শিশুদের প্রকৃতি থাকে স্বভাবতঃই সরল। তাহাদের মধ্যে চিন্তাশক্তি, দূরদর্শিতা বা নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির উদ্ভব হয় না। সরলতাবশতঃ শিশুরা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের মাতা, পিতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরা সকলেই সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। কোন বিষয় যখন তাহারা বুঝিতে পারে না, তখন মাতা, পিতা, শিক্ষক বা অন্য কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করে এবং উত্তরে যে কথা শুনে, তাহাকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়। এই বিষয়ে শিশুকে যে ভাবের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই ভাবটিই তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। নাস্তিক লোকের সন্তানেরা, নাস্তিক শিক্ষকের ছাত্র-ছাত্রী এবং নাস্তিক পরিবেশে প্রতিপালিত বা পরিবর্দ্ধিত শিশুরা হয় নাস্তিক। অপরপক্ষে আস্তিক ব্যক্তিগণের সন্তানেরা, আস্তিক শিক্ষকের

ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং আস্তিক পরিবেশে প্রতিপালিত বা পরিবর্দ্ধিত শিশুরা উল্লিখিত কারণেই পরম আস্তিক্য বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পরবর্ত্তী জীবনে যে সকল লোক তত্ত্বদর্শী সাধুপুরুষগণের সান্নিধ্যে আসেন, তাঁহারা প্রথম জীবনে নাস্তিক থাকিলেও ঐ সকল সজ্জনের সংসর্গহেতু আস্তিক্য-বুদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভারতবর্ষে যেমন রত্নাকর প্রভৃতি দস্যুরা সাধুসঙ্গের ফলে মহাত্মা হইয়া গিয়াছেন, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণের কোন কোন শিষ্যও ঠিক অনুরূপ কারণেই নিজেদের নাস্তিকতা ও জঘন্য আচরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম আস্তিক ও সদাচার-পরায়ণ হইয়া উঠিযাছিলেন। অপরপক্ষে আশ্রমে প্রতিপালিত, প্রথম জীবনে পরম সজ্জন লোকও যৌবনে কুসংসর্গে মিশিবার ফলে দুর্ব্বৃত্ত লম্পটে পরিণত হইয়াছেন—এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ কিভাবে মানুষকে যথাক্রমে আস্তিক ও নাস্তিকে পরিণত করে, উপরের আলোচনা হইতে তাহা বুঝা গিয়াছে। এক্ষণে চিন্তাশীলতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। সকল মানুষের চিন্তাশক্তি সমান নহে। অনেকের আবার চিন্তা করিবার শক্তি মোটেই নাই। যাহারা মোটেই চিন্তা করিতে পারে না, তাহাদের চরিত্র বা মতামত গঠনে শুধু সঙ্গগুণ বা সঙ্গদোষই কার্য্যকরী হইয়া থাকে। যাঁহারা তীক্ষ্ণ প্রতিভার অধিকারী, তাঁহারা নিজেদের চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে স্বভাবতঃ আস্তিক্য-বুদ্ধিবিশিষ্টই হইয়া থাকেন। যাহাদের চিন্তাশক্তি অল্প, তাহাদের মধ্যেই নাস্তিক্যভাবের আধিক্য দেখা যায়।

চিন্তাশীল মানুষ যখন দেখে—তাহার সম্মুখে একটি প্রাণী জন্মিতেছে, খেলিয়া বেড়াইতেছে, কখনও রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, আবার কখনও অকালে মরিয়া যাইতেছে, তখন স্বভাবতঃই তাহার মনে প্রশ্ন জাগে—এইরূপ ঘটে কেন? সে চিন্তা করিয়া দেখে—কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। মাতাপিতা না থাকিলে সন্তান জন্মে না। কেহ অগ্নির সাহায্যে রান্না না করিলে ভাত ফুটে না। চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি দ্রব্যেরও একজন না একজন নির্ম্মাতা অবশ্যই থাকে। এইরূপ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিমান্ লোকেরা বুঝিতে পারেন যে, এই জগতের একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্তা আছেন, এবং তিনিই প্রাণিজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ইত্যাদি ঘটাইতেছেন। গুরুতর পাপ ও পুণ্যের ফল ইহ জীবনেই মানুষকে ভোগ করিতে দেখা যায়। ইহা দেখিয়া চিন্তাশীল লোকেরা বিশ্বনিয়ন্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন।

অপরপক্ষে স্থূলবুদ্ধি লোকেরা উল্লিখিত প্রকারে চিন্তা করিতে না পারিয়া অনেক সময়েই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে। এই সকল স্থূলবুদ্ধি লোকেরা মনে করে—যাহা চোখে দেখা যায় না, তাহার অস্তিত্বই নাই। বাতাস চোখে দেখা না গেলেও চর্ম্মদ্বারা তাহার উপলব্ধি হয়; এই কারণে বাতাসের অস্তিত্ব তাহারা স্বীকার করে। তাহাদের মতে চক্ষুঃ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়ই যাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, এমন কোন বস্তু বা বিষয় থাকা সম্ভব নহে। ভগবান্ বা কর্ম্মফল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়ায় ইহাদের অস্তিত্ব ঐ সকল লোকের বিবেচনায় অবিশ্বাস্য। এই সকল দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক নাস্তিকদের উল্লিখিত অসার যুক্তির বিরুদ্ধে সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য সংস্কৃতভাষাময় মহাভারত হইতে একটি যুক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। শান্তিপর্ব্বের ১৮৭তম অধ্যায়ে (বোবিল্ল প্রেস, মাদ্রাজ) এই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

> "যথা হিমবতঃ পার্শ্বং পৃষ্ঠং চন্দ্রমসো যথা।
> ন দৃষ্টপূর্ব্বং মনুজৈর্ন চ তন্নাস্তি তাবতা॥
> তদ্বদ্ ভূতেষু ভূতাত্মা সূক্ষ্মো জ্ঞানাত্মবানসৌ।
> অদৃষ্টপূর্ব্বশ্চক্ষুর্ভ্যাং ন চাসৌ নাস্তি তাবতা॥"—(শ্লোক ৫৪-৫৫)

বঙ্গার্থ :—হিমালয়ের অপরপার্শ্ব এবং চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ যদিও মানুষ কখনও দেখিতে পায় না, তথাপি যেমন বলা চলে না যে ইহাদের অস্তিত্ব নাই; ঠিক তেমনি সূক্ষ্ম, জ্ঞানময় জীবাত্মা প্রত্যেক প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি চর্ম্মচক্ষুর অগোচর হইলেও একথা বলা চলে না যে, তাঁহার অস্তিত্ব নাই।

এই বিষয়ে আর একটি সুন্দর যুক্তি ছান্দোগ্যোপনিষদের (ষষ্ঠ অধ্যায়, ত্রয়োদশ খণ্ড) নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়েন। পুত্র নাস্তিক-ভাবাপন্ন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া ঋষি উদ্দালক তাহার কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব এবং সূক্ষ্মতর যুক্তিগুলি শ্বেতকেতু বুঝিতে পারিতেছেন না দেখিয়া পিতা উদ্দালক লৌকিক যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন। উদ্দালক বলিলেন—"বৎস! তুমি এই জলপূর্ণ পাত্রে একটি লবণখণ্ড রাখিয়া এখন চলিয়া যাও। আগামীকাল আবার আসিও; তখন তোমাকে সব বুঝাইয়া দিব।" শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে শ্বেতকেতু উপস্থিত হইলে উদ্দালক তাঁহাকে জলপূর্ণ পাত্র হইতে পূর্ব্বদিনের নিক্ষিপ্ত লবণখণ্ডটি তুলিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু লবণখণ্ডটি

তখন জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; সুতরাং শ্বেতকেতুর পক্ষে ইহাকে পৃথক্ করা আর সম্ভব নহে। তখন উদ্দালক ঋষি বলিলেন—"জলে নিক্ষিপ্ত লবণ যেমন বিলীন হইয়া রহিয়াছে, ব্রহ্মও তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিলীন হইয়া আছেন।" এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্বেতকেতুর মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাঁহার নাস্তিক্যভাব ঘুচিয়া গেল।

বস্তুতঃ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, এমন বস্তু বা বিষয়ও যে জগতে আছে, তাহা আমরা সর্ব্বদাই উপলব্ধি করিয়া থাকি। যে বাঙ্গালী কোনদিন বঙ্গদেশের বাহিরে যান নাই, দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, লণ্ডন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি সহর নিজের চোখে দেখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল সহর নাই—এমন কথা তিনি বলিতে পারেন না। অতিসূক্ষ্ম পরমাণু বা রোগবীজাণু আমরা চোখে দেখিতে পাই না বটে; কিন্তু শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদিগকেও দেখা যায়; সুতরাং ঐ সকল পরমাণু বা রোগবীজাণুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একবার একটি শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহার সূক্ষ্ম তরঙ্গ যে সহস্র সহস্র মাইল দূরেও পৌঁছিয়া থাকে, এবং এইরূপ অবস্থায় ঐ শব্দ স্বভাবতঃ অশ্রব্য (inaudible) হইলেও তাহাকে যে শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে পুনরায় শ্রবণযোগ্য করিয়া তোলা যায়, বর্ত্তমান যুগের শব্দ-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

সকলের ঘ্রাণশক্তি সমান নহে। মানুষ যেখানে কোন গন্ধের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না, সেইখানেও প্রখর-ঘ্রাণশক্তি-বিশিষ্ট কুকুর গন্ধের সন্ধান পায় এবং তাহারই সাহায্যে অনেক সময় অপরাধীদিগকে ধরিতে সমর্থ হয়—ইহা আজকাল সকলেই জানেন। জিহ্বা এবং ত্বকের সামর্থ্যের মধ্যেও এইরূপ কমবেশী থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে—মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তিদ্বারা অনুপলব্ধ বহু পদার্থ এবং মানুষের অজ্ঞাত বহু বিষয় এই ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান আছে।

সিদ্ধ মহাপুরুষেরা কঠোর সাধনার ফলে লোকাতীত শক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। সাধারণ মানুষ্ যাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, ঐ সকল মহাপুরুষেরা তাদৃশ বস্তু বা বিষয়গুলিও অনায়াসে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; অতএব, এইরূপ লোকাতীত শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ যে সকল সত্য স্বয়ং উপলব্ধি করতঃ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের মত ক্ষুদ্রশক্তি মানুষ যদি তাহা বুঝিতে বা উপলব্ধি করিতে না পারি, তাহা হইলে ঐ সকল সত্য মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইবে না।

সিদ্ধ মহাপুরুষেরা কিরূপ লোকাতীত শক্তির অধিকারী হন, নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি হইতে পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। একবার কোন নরহত্যার মোকদ্দমায় একজন বিখ্যাত সাধুকে (৺লোকনাথ ব্রহ্মচারী) সাক্ষী মানা হয়। বিপক্ষের উকীলের জেরার উত্তরে সাধুবাবা বলিলেন—তিনি প্রায় পোয়া মাইল দূর হইতে নরহত্যা সঙ্ঘটিত হইতে দেখিয়াছেন। উকীল আদালতকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, এত দূর হইতে হত্যাকারীকে চিনিতে পারা সাধুর পক্ষে সম্ভব নহে; অতএব তাঁহার সাক্ষ্য মূল্যহীন। ইহা শুনিয়া সাধুজী মৃদু হাসিয়া উকীলকে বলিলেন—"বাপু হে, তোমাদের মত সাধারণ লোকদের ইন্দ্রিয়শক্তি অপেক্ষা সাধুদের ইন্দ্রিয়শক্তি অনেক বেশী। আমাদের মত সাধুদের পক্ষে পোয়া মাইল দূরের কথা, দুই মাইল দূর হইতেও মানুষ চেনা সম্ভব।"

উকীল সাধুকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে জানালাপথে একটি দূরবর্ত্তী বৃক্ষ দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"ঐ যে বহুদূরে একটি উঁচু গাছ দেখা যাইতেছে, এখান হইতে উহার দূরত্ব দুই মাইলের মতই হইবে। বলুন তো, ঐ গাছে আপনি কি দেখিতেছেন।" সাধুজী কিছুক্ষণ বৃক্ষটির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া একে একে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার সংখ্যা, তাহার কোন ডালে কয়টি পাখী বসিয়াছে, কোন শাখায় কয়টি মরা প্রশাখা আছে, ইত্যাদি বর্ণনা করিবার পর বলিলেন—"ক্ষুদ্রাকৃতি কতকগুলি কাল রংএর পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধভাবে বৃক্ষটির মূলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত উঠিতেছে, এবং তাহাদেরই পার্শ্ব দিয়া লাল রং এর আর এক দল পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধভাবে নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে।" সাধুজীর এই সকল কথা শুনিয়া হাকিম হইতে আরম্ভ করিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইলেন। তখন হাকিমের নির্দ্দেশে কয়েকজন বিশ্বস্ত নিরপেক্ষ লোক দ্রুতগামী যানে আরোহণ-পূর্ব্বক সাধুর কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে গেলেন। ইঁহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন—সাধুর কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। বলা বাহুল্য, সাধুজীর সাক্ষ্য অনুসারেই অপরাধীর শাস্তি হইয়াছিল।

বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রের রচয়িতাগণ প্রত্যেকেই উল্লিখিত সাধুর চেয়েও অনেক বেশী সাধনশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া আস্তিক্যবাদ সম্বন্ধে যে সকল উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া আমাদের মতে চরম মূর্খতারই পরিচায়ক।

নাস্তিকদের মতে "লোকসিদ্ধো নৃপতিরেব পরমেশ্বরঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাগ্য ক্রমে দেশের শাসনক্ষমতা হস্তগত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই পরমেশ্বর। তাঁহা উপরে কোন অদৃশ্য পরমেশ্বর আর নাই। যদি নিজেদের দলের লোক শাসন ক্ষমতায় বসে, তাহা হইলে নাস্তিকদের সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়। ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নাস্তিকদের বিশ্বাস না থাকায় পুণ্যকার্য্য সাধনের জন্য কোনরূপ আগ্রহ ব পাপকার্য্য সাধনে কোনপ্রকার নরকাদির ভয় তাহাদের থাকে না। তাহার মনে করে, যে কোন সমাজবিরোধী, ধর্ম্মবিরোধী বা আইনবিরোধী কাজ করিয় ধরা না পড়িলেই হইল। এই কারণেই নাস্তিকেরা নানাবিধ অপকর্ম্ম করিয় প্রমাণ লোপ করে এবং এইভাবে রাজদণ্ডের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া ভাবে—আ তাহাদের শাস্তি পাওয়ার কোন কারণ নাই। এই কারণেই দুষ্টবুদ্ধি নাস্তিকের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের উপর নানাবিধ নির্য্যাতন করিয়া তাহাদের জীবন অতি করিয়া তুলে। এইরূপ নাস্তিক্যবুদ্ধির ফলেই রাক্ষসরাজ রাবণ পরস্ত্রী হরণ করিত। এই কারণেই দুর্ব্বৃত্ত নৃপতি বেন ঢক্কানিনাদসহকারে তাহার রাজ্যমধ্যে ঘোষণ করিয়াছিল—কেহ কোন যজ্ঞ, দান বা দেবক্রিয়া করিতে পারিবে না; করিলে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

"ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ।
ইতি ন্যবারয়দ্ধর্ম্মং ভেরীঘোষেণ সর্ব্বতঃ ॥"

—ভাগবত ৪ | ১৪ | ৬ (গীতাপ্রেস)

এইরূপ নাস্তিক্যবুদ্ধির ফলেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিলোপ সাধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল এবং তাহার সেনাবাহিনীকে আদেশ করিয়াছিল—যেখানেই দ্বিজাতির আধিপত্য, গোসেবা, বেদগ্রন্থ ও তাহার পঠনপাঠন, অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্য যে কোনরকম ক্রিয়া হইতে দেখিবে, সেখানেই গিয়া তোমরা ব্রাহ্মণ ও গরুগুলিকে কাটিয়া ফেলিবে এবং বেদগ্রন্থসহ ব্রাহ্মণ-পল্লীগুলিকে আগুনে পুড়াইয়া দিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় সেনাবাহিনীর প্রতি হিরণ্যকশিপুর আদেশ যথা—

"যত্র যত্র দ্বিজা গাবো বেদা বর্ণাশ্রমক্রিয়াঃ।
তং তং জনপদং যাত সন্দীপয়ত বৃশ্চত ॥"

—ভাগবত ৭ | ২ | ১২ (গীতাপ্রেস)

সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, মানুষ যে আস্তিক অথবা নাস্তিক হয়;

তাহার পশ্চাতে পাঁচটি বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে। সেই কারণগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে।

১। বংশপরম্পরা :—যে সকল লোকের মাতাপিতা স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ এবং পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষেরাও সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তাহারা সাধারণতঃ আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব বংশপরম্পরার প্রভাবেই পরম ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। জনকবংশীয় নৃপতিরা যে অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মপরায়ণতাই ইহার প্রধান কারণ। শিশুরা স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয় বলিয়াই পিতৃ-পিতামহাদির চরিত্র অনুসরণ করিয়া ধার্ম্মিক অথবা পাপপরায়ণ হইয়া থাকে। যে শিশু বাল্যাবধি তাহার মাতাপিতাকে চৌর্য্য, ব্যভিচার প্রভৃতি অপকর্ম্মে লিপ্ত দেখিতে পায়, সে স্বভাবতঃই ঐ সকল কুকর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে সতীনারীর কন্যারা সতী এবং ব্যভিচারিণীর কন্যারা ব্যভিচার-পরায়ণা হয়।

২। পারিপার্শ্বিক অবস্থা :—পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের বংশে পরম ধার্ম্মিক মাতাপিতার ঘরে জন্মিয়াও কোন কোন ছেলেমেয়ে ঘটনার আবর্ত্তে মাতাপিতার সান্নিধ্যলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। কাহারও বাল্যবয়সে হয় তো তাহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়; অন্যদের মাতাপিতা হয় তো ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত সন্তানের নিকট হইতে দূরে বাস করিতে বাধ্য হন। এই সকল ছেলেমেয়েরা—মাতা, পিতা বা পূর্ব্বপুরুষদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য না পাওয়ায় অনেক সময়ে বংশপরম্পরার সুফল বা কুফল হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা সর্ব্বদা যাহাদের সঙ্গে বাস করে বা চলাফেরা করে, যে সকল শিক্ষক বা শিক্ষিকার নিকট অধ্যয়ন করে অথবা যে সকল ভৃত্য বা পরিচালকদ্বারা পালিত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহার সহিত উক্ত ছেলেমেয়েদের সর্ব্বাধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মে, তাহার চরিত্রই উহারা অনুকরণ করিয়া থাকে।

৩। জন্মান্তরীয় অদৃষ্ট :—পূর্ব্বজন্মে মানুষ যে রকম কার্য্য করে, পরজন্মে তাহাকে উহার ফল ভোগ করিতে হয়। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে এইভাবে মানুষের যে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য গঠিত হয়, তাহা চোখে দেখা যায় না এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সাহায্যেও মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না; এই কারণে এবংবিধ কর্ম্মফলকে অদৃষ্ট নামে অভিহিত করা হয়। পূর্ব্বজন্মে যাঁহারা সৎকর্ম্ম সাধন করেন, তাঁহারা পরজন্মে উচ্চতর জন্মলাভের অধিকারী হন এবং তাহার ফলে

জন্মাবধি অধিকতর আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া নিজের সৌভাগ্যের পথ প্রশস্ত করিয়া থাকেন। যাহারা পূর্ব্বজন্মে অপকর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহারা নরকভোগের পর পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও হীনবুদ্ধি দুষ্কর্ম্মপরায়ণ নাস্তিকদের ঘরে জন্মিয়া থাকে এবং ইহার ফলে অধিকতর নাস্তিক্যবুদ্ধিদ্বারা কলুষিত হইয়া নিজের দুর্ভাগ্যের পথ প্রশস্ত করে। শাস্ত্র বলেন—কেহ যদি কোন সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাব অল্পাংশমাত্র সম্পাদন করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা জীবিত থাকিয়াও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য উহা সম্পূর্ণ করিতে না পারে, তাহা হইলেও এইরূপ সৎকর্ম্মের আংশিক সাধনের ফলে সেই ব্যক্তি পরজন্মে পুণ্যাত্মা সজ্জনগণের গৃহে জন্মলাভ করিয়া অধিকতর সৎকর্ম্ম সাধনের সুযোগ লাভ করে। গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে এই সকল কথা বলিয়া স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, সৎকর্ম্মপরায়ণ লোকদিগকে কখনও দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না এবং সৎকর্ম্মের অংশ মাত্রও উল্লিখিত উপায়ে সুফল প্রদান করিয়া থাকে। এই সম্বন্ধে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি যথা :—

"পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্ লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ —গীতা ৬।৪০—৪২

ঠিক এইভাবে কুকর্ম্মপরায়ণ লোকেরা দুর্গতির পথে প্রধাবিত হয়, এবং উপযুক্ত রাজদণ্ডভোগ, প্রায়শ্চিত্ত বা সাধুসঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা পাপের ক্ষয় না করিলে পরজন্মে তাহাদিগকে হীনমতি নাস্তিকদের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া দুর্ভাগ্যজনক নাস্তিক্য-বুদ্ধি দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইতে হয়।

৪। রাজা বা শাসকদের প্রভাব :—যে দেশের শাসনকর্ত্তারা ধর্ম্মপরায়ণ হন, সেই দেশের জনসাধারণও প্রায়ই ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া থাকে ; আর যে দেশের শাসকেরা নাস্তিক ও পাপপরায়ণ, সেই দেশের জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ নাস্তিক্যভাবে বিভোর এবং অসৎকর্ম্ম-পরায়ণ হয়। এই সম্বন্ধে গীতার শ্লোক যথা—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥" (৩।২১)

বাল্মীকির রামায়ণে নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক জাবালিকেও শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন—

"যদ্বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্বৃত্তাঃ সন্তি হি প্রজাঃ ॥"

—অযোধ্যাকাণ্ড ১০৯।৯

এই কারণেই দানবশাসিত দেশের লোকেরা দানব-প্রকৃতি, রাক্ষসশাসিত দেশের লোকেরা রাক্ষস-প্রকৃতি, এবং ধর্ম্মপ্রাণ পরোপকারক আর্য্যনৃপতিকর্ত্তৃক শাসিত দেশের লোকেরা স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া থাকে। এই কারণেই কেকয়রাজ অশ্বপতি ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—

"ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ ॥"

—ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৫।১১।৫

[আমার রাজ্যে কেহ চুরি করে না, মদ্যপান বা অপর কোন কুকর্ম্মও করে না। আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত এমন একজন লোকও নাই, যিনি অনাহিতাগ্নি অথবা অবিদ্বান্। এখানে কোন পুরুষ ব্যভিচার করে না; সুতরাং কোন নারীর ব্যভিচারিণী হওয়ায় প্রশ্নই উঠে না।] বিনয়ী কেকয়রাজ ব্রহ্মবাদিগণের প্রশ্নের উত্তরে আত্মপ্রশংসা না করিয়া প্রজাপুঞ্জের প্রকৃতি-বর্ণনাদ্বারাই বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনি সৎকর্ম্মপরায়ণ এবং প্রজাদিগকেও সুপথে পরিচালনে সক্ষম।

বাল্মীকির রামায়ণ হইতে জানা যায়, অযোধ্যাধিপতি দশরথ ধর্ম্মপরায়ণ ও সুশাসক ছিলেন এবং ইহার ফলেই তাঁহার রাজ্যের, বিশেষতঃ রাজধানীর লোকেরা সকলেই ধার্ম্মিক ছিল এবং এইভাবে রাজা ও প্রজাদের ধর্ম্মাচরণের ফলে রাজ্যে সর্ব্বদা শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিত। দশরথের গুণ-বর্ণনায় বাল্মীকি লিখিয়াছেন—

"তস্যাং পুর্য্যামযোধ্যায়াং বেদবিৎ সর্ব্বসংগ্রহঃ।
দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ ॥
ইক্ষ্বাকূণামতিরথো যজ্বা ধর্ম্মপরো বশী।
মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥
বলবান্নিহতামিত্রো মিত্রবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধনৈশ্চ সঞ্চয়ৈশ্চান্যৈঃ শক্রবৈশ্রবণোপমঃ ॥
যথা মনুর্ম্মহাতেজা লোকস্য পরিরক্ষিতা।
তথা দশরথো রাজা লোকস্য পরিরক্ষিতা ॥

তেন সত্যাভিসন্ধেন ত্রিবর্গমনুতিষ্ঠতা।
পালিতা সা পুরী শ্রেষ্ঠা ইন্দ্রেণেবামরাবতী ॥"

—বালকাণ্ড, ষষ্ঠসর্গ।

এইরূপ পরমধার্ম্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ সুশাসক নৃপতির শাসনে তাঁহার প্রজারা কিরূপ ধার্ম্মিক শান্তিপ্রিয় ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণনায় বাল্মীকি লিখিয়াছেন—

"তস্মিন্ পুরবরে হৃষ্টা ধর্ম্মাত্মানো বহুশ্রুতাঃ।
নরাস্তুষ্টা ধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈরলুব্ধাঃ সত্যবাদিনঃ ॥
নাল্পসন্নিচয়ঃ কশ্চিদাসীত্তস্মিন্ পুরোত্তমে।
কুটুম্বী যো হ্যসিদ্ধার্থোঽগবাশ্ব-ধনধান্যবান্ ॥
কামী বা ন কদর্য্যো বা নৃশংসো বা ন মন্থপঃ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ ॥
সর্ব্বে নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ধর্ম্মশীলাঃ সুসংযতাঃ।
মুদিতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ ॥
নামৃষ্টভোজী নাদাতা নাপ্যনঙ্গদনিষ্কধৃক্।
নাহস্তাভরণো বাপি দৃশ্যতে বাপ্যনাত্মবান্ ॥
নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা ন ক্ষুদ্রো ন বা তস্করঃ।
কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ ॥
স্বকর্ম্মনিরতা নিত্যং ব্রাহ্মণা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
দানাধ্যয়নশীলাশ্চ সংযতাশ্চ প্রতিগ্রহে ॥
. ...
নাষডঙ্গবিদিহাস্তি নাব্রতো নাসহস্রদঃ।
ন দীনঃ ক্ষিপ্তচিত্তো বা ব্যথিতো বাপি কশ্চন ॥
... ...
বর্ণেষ্বগ্র্যাচতুর্থেষু দেবতাতিথিপূজকাঃ।
কৃতজ্ঞাশ্চ বদান্যাশ্চ শূরাঃ বিক্রমসংযুতাঃ ॥

ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং চাসীদ্ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ।
শূদ্রাঃ স্বকর্ম্মনিরতাস্ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ ॥"

—বালকাণ্ড, ষষ্ঠ সর্গ।

[সেই নগরীশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় সকল মানুষই ছিল সর্ব্বদা আনন্দিত, ধর্ম্মপ্রাণ এবং প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন। তাহারা সকলেই ছিল সত্যবাদী, নির্লোভ এবং নিজ নিজ ধনে সন্তুষ্ট। প্রত্যেকেই প্রচুর ধন ও ধান্যাদি সম্পদ্ গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখিত এবং আত্মীয়গণের পোষণ করিত। প্রত্যেকের ঘরেই প্রভূত গো, অশ্ব প্রভৃতি সম্পদ্ ছিল এবং কাহারও কোন অভিপ্রায় অসিদ্ধ থাকিত না। বিশাল জনাকীর্ণ অযোধ্যা-নগরীতে একজনও কামুক, কদর্য্যস্বভাব, নৃশংস বা মদ্যপায়ী দেখা যাইত না। এই বিশাল নগরীর প্রত্যেক অধিবাসী সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সমগ্র নগরীতে একজনও নাস্তিক ছিল না। সকল নরনারীই ছিল ধর্ম্মশীল, সংযতচরিত্র এবং স্বতঃসন্তুষ্ট। তাহাদের নির্ম্মল চরিত্র ও সদাচার ছিল মহর্ষিদেরই তুল্য। কেহ নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিত না এবং প্রত্যেকেই প্রভূত স্বর্ণমুদ্রার অধিকারী ছিল। প্রত্যেকেই হস্তে অলঙ্কার এবং সর্বাঙ্গে গাত্রাবরণ (অঙ্গদ) পরিধান করিত। প্রত্যেকের ঘরেই যজ্ঞাগ্নি আহিত থাকিত এবং প্রত্যেকেই যজ্ঞ করিত। সমগ্র অযোধ্যানগরীতে একজনও সঙ্কীর্ণচেতাঃ, তস্কর, চরিত্রহীন বা বর্ণসঙ্কর ছিল না। ব্রাহ্মণেরা জিতেন্দ্রিয় এবং স্বকীয় বর্ণধর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। দান এবং অধ্যয়নে তাঁহারা সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন এবং অন্যের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবার কালে তাঁহারা সংযতভাবেই উহা গ্রহণ করিতেন (অবৈধ দান গ্রহণ করিতেন না)।

...প্রত্যেক দ্বিজ ষড়ঙ্গ বেদে অভিজ্ঞ এবং ব্রতপরায়ণ ছিলেন। দাতারা কখনও সহস্রের কম দান করিতেন না। সমগ্র নগরীতে একজনও দরিদ্র, বিক্ষিপ্তচিত্ত বা ব্যথিত লোক দেখা যাইত না।...শূদ্রসহ চারিবর্ণের লোকেরাই সর্ব্বদা দেবতা ও অতিথির সেবায় নিরত থাকিতেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃতজ্ঞ, বদান্য, বীর ও বিক্রমশালী ছিলেন।... ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগকে, বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়দিগকে, এবং শূদ্রেরা তিন বর্ণের দ্বিজাতিদিগকে মানিয়া চলিতেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বর্ণবিহিত ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন।]

অন্যান্য ধার্ম্মিক নৃপতিদের শাসনকালেও সর্ব্বদাই জনসাধারণের মধ্যে আস্তিক্য-বুদ্ধির উদয় হইত। অপরপক্ষে শুম্ভ, নিশুম্ভ, মহিষাসুর, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দানবগণের এবং রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসদের শাসনকালে তাহাদের রাজ্যের ও রাজধানীর লোকেরা কিরূপ কুকর্ম্মপরায়ণ ও নাস্তিক হইত, তাহার বর্ণনা বিভিন্ন পুরাণে এবং বাল্মীকির রামায়ণে লিপিবদ্ধ আছে।

৫। অজ্ঞতা ও অল্পজ্ঞতা :—বিজ্ঞ চিন্তাশীল লোকেরা যে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির ফলে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ লোকেরা নিজেদেব বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অভাবে সূক্ষ্ম বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া ভগবানের অস্তিত্ববোধেও অক্ষম হয় এবং স্বভাবতঃ নাস্তিক হইয়া থাকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধতত্ত্বের ভূমিকা

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের প্রতিটি মানুষ এইরূপ একটি ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, মৃত্যুর পর পরলোকগত ব্যক্তির তৃপ্তি ও মুক্তির জন্য শাস্ত্রোক্ত বিধানে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করা একান্ত আবশ্যক। বিপুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে রাস্তার ভিখারী পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে উল্লিখিত প্রকার কর্তব্যবুদ্ধি চিরকাল বিরাজিত ছিল এবং প্রত্যেকে নিজ ক্ষমতানুযায়ী শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সর্ব্বদাই করিয়া আসিয়াছে। শুধু হিন্দু-সমাজেই নহে; অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেও মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রচলন ছিল এবং আজও আছে। আমাদের প্রতিবেশী মুসলমানেরা ৪০ দিন অশৌচ ধারণের পর 'পাতিয়া' নামক এক শ্রেণীর পারলৌকিক কার্য্য করেন এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যেও অনুরূপ একটি পারলৌকিক ক্রিয়া প্রচলিত আছে।

দুঃখের বিষয় নাস্তিকতা বৃদ্ধির ফলে কিছুদিন যাবৎ মানুষের উল্লিখিত বিশ্বাস শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং বিশেষভাবে ভারতীয় হিন্দুদের উপরই ইহার সমধিক প্রভাব পড়িয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মীয় আচরণের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে রাজশক্তি তাহা সহ্য করে না; কিন্তু দুঃখের বিষয়—ভারতবর্ষে একমাত্র হিন্দুর ধর্ম্মক্রিয়াসম্বন্ধেই ইহার বিপরীত আচরণ দেখা যায়। হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে এবং অপপ্রচার, প্রলোভন ও দণ্ডভীতির সাহায্যে হিন্দুকে ধর্ম্মবিমুখ করিতে এদেশের শাসকেরাও এখন আর পশ্চাৎপদ নহেন। ফলে হিন্দু-সমাজ হইতে শাস্ত্রের অবশ্যকর্ত্তব্যতাসম্বন্ধীয় বিশ্বাস যেন ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে—শ্রাদ্ধ করিব কেন? ইহার উত্তরে আমি বলিব—

১। বেদাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্র শ্রাদ্ধের বিবরণ এবং শ্রাদ্ধ করিবার জন্য নির্দ্দেশ রহিয়াছে। দেশের সংবিধান এবং প্রচলিত আইনের চেয়েও শাস্ত্র বড় প্রমাণ;

অতএব শাস্ত্রনির্দ্দেশ মানিয়া শ্রাদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথা প্রত্যবায় হইবে। গীতায় শ্রীভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥" ১৬।২৪

অর্থাৎ কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য আর কোন্‌টা কর্ত্তব্য নহে, তাহা শাস্ত্র হইতেই জানিতে হয়। অতএব শাস্ত্রবিধান জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করাই মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য।

২। মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির আত্মা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পায়; প্রায়ই সংসারের মায়া কাটাইতে না পারিয়া আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহার শ্রাদ্ধাদি না করিলে জীবিত প্রিয়জনের অনিষ্ট করে। এই সকল তথ্য শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে এবং সাধক মহাপুরুষেরা সাধনার সাহায্যে ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। অতএব, প্রেতাত্মার তৃপ্তি ও মুক্তি এবং জীবিত ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে—

"প্রেতস্য শ্রাদ্ধকর্ত্তুশ্চ পুষ্টিঃ শ্রাদ্ধে কৃতে ধ্রুবম্।
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং সদা কার্য্যং শোকং ত্যক্ত্বা নিরর্থকম্ ॥" (২০।৩৬)

অর্থাৎ যাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হয় এবং যিনি শ্রাদ্ধ করেন, শ্রাদ্ধকার্য্যের ফলে ইঁহাদের উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়; সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য অনর্থক শোক না করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করাই উচিত।

৩। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল মহাত্মাকে সমগ্র হিন্দুজাতি ভগবদবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল আদর্শ পুরুষের অনুকরণ-পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা আমাদেরও অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। আজীবন ব্রহ্মচারী, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ক্ষত্রিয়কুলগৌরব, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ মহামতি ভীষ্ম শরশয্যায় শয়নকালে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

"দেবাসুরমনুষ্যাণাং গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্।
পিশাচ-কিন্নরাণাঞ্চ পূজ্যা বৈ পিতরঃ সদা ॥
পিতৄন্ পূজ্যাদিতঃ পশ্চাদ্দেবতাস্তর্পয়ন্তি বৈ।
তস্মাত্তান্ সর্ব্বযত্নেন পুরুষঃ পূজয়েৎ সদা ॥"

—অনুশাসনপর্ব্ব (হরিদাসীয়) ৭৬।৪—৫

[দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, পিশাচ, কিন্নর সকলেরই পিতৃগণের পূজা (শ্রাদ্ধাদি) করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথমে পিতৃগণের পূজা করিয়া তাহার পর দেবতার প্রীতিজনক কার্য্য করিতে হয়। অতএব, প্রত্যেক মানুষ প্রতিটি যজ্ঞে (পিতৃযজ্ঞই হউক আর দেবযজ্ঞই হউক) পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে।] মহাজ্ঞানী ভীষ্মের উপদেশ অবশ্য পালনীয় ; অতএব, এই কারণেও শ্রাদ্ধ করা হিন্দুমাত্রেরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন উঠিতে পারে-- শ্রাদ্ধ করিলে ইহাদ্বারা যথার্থই মৃতব্যক্তির আত্মার তৃপ্তি ও মুক্তিলাভ হয় কি ? ইহার উত্তরও শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেই রহিয়াছে। শ্রাদ্ধদ্বারা প্রেতাত্মার তৃপ্তি এবং মুক্তিলাভ হয় বলিয়াই শাস্ত্রে শ্রাদ্ধের বিধান দেওয়া হইয়াছে। বিষ্ণুসংহিতার উল্লিখিত বচনটিকে এই বিষয়ে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে— মৃত ব্যক্তির জন্য নিরর্থক শোক না করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করাই উচিত। ইহা লক্ষ্য করিবার মত। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিলে ইহাদ্বারা তাহার আত্মার উপকারের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই হয়। শোক-প্রকাশকারী আত্মায় বা আত্মীয়ার বিলাপের আকর্ষণে বিদেহী আত্মা পুনরায় সংসারের দিকে আকৃষ্ট হন, এবং বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন ; অতএব শোক শুধু নিরর্থক নহে, দারুণ অনিষ্টকারীও বটে। এই কারণেই মৃত ব্যক্তির জন্য শোক না করিবার উপদেশ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে রহিয়াছে। মৃত্যুদ্বারা আত্মার বিনাশ হয় না, শুধু অবস্থান্তর ঘটে ; অতএব শোক অনাবশ্যক। অপরপক্ষে শ্রাদ্ধদ্বারা বিদেহী আত্মার ঐহিক আকর্ষণের বিলুপ্তি ঘটে এবং মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত হয় ; সুতরাং শ্রাদ্ধ প্রেতাত্মার পক্ষে পরম কল্যাণকারক।

প্রেতাত্মার অস্তিত্ব যে আছে, তাহার প্রমাণ নানাভাবে পাওয়া যায়। দেশবন্ধু ৺চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের জীবনীতে দেখিলাম—৺অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি মনীষীরা যে সময়ে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন অন্যান্য আইনজীবীদের ন্যায় ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনও তাঁহাদের পক্ষে মামলা চালাইতে অসম্মত হন। ইহার পর ৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রেতাত্মা আসিয়া চিত্তরঞ্জনকে এই মামলার পরিচালন-ভার গ্রহণে সম্মত করেন। চিত্তরঞ্জন তখন নাস্তিক ছিলেন। প্রেতাত্মা যখন অদ্ভুত শক্তিবলে চিত্তরঞ্জনের নিজের হাতে তাঁহার টা. ১০০'০০ মূল্যের ২ খানা ষ্ট্যাম্প নষ্ট করিয়া দিলেন, তখনই চিত্তরঞ্জনের টনক নড়িল এবং মামলার পরিচালনভার গ্রহণেও তিনি সম্মত হইলেন।

চিত্তরঞ্জন নিজ চেম্বারে বসিয়া টা. ১০০'০০ মূল্যের একখানি ষ্ট্যাম্পে ইংরেজীতে নিজের নাম সহি করিতেছিলেন, এই সময়ে কোন অদৃশ্য শক্তি জোর করিয়া উক্ত ষ্ট্যাম্পের উপর তাঁহাকে দিয়া লিখাইয়া দিল "তোমাকে অরবিন্দের মোকদ্দমা লইতেই হইবে।" একশতটাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্পখানা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় চিত্তরঞ্জন ক্ষুব্ধ হইলেন এবং নূতন আর একখানা ষ্ট্যাম্প লইয়া উহাতে নাম সহি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এবারও কোন অদৃশ্য শক্তি পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি তাঁহাকে দিয়া লিখাইয়া ষ্ট্যাম্প্‌টি নষ্ট করিয়া দিল। চিত্তরঞ্জন তখন আপন মনে প্রশ্ন করিলেন—"কে আমাকে দিয়া এইরূপ করাইতেছে?" সঙ্গে সঙ্গে শূন্য হইতে কেহ বলিল "আমি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়... . " ইত্যাদি। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে উপাধ্যায়ের প্রেতাত্মার কিছুক্ষণ আলাপ হইল এবং চিত্তরঞ্জন প্রেতাত্মার অনুরোধে মামলাটির পরিচালনভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীতেও দেখি—বিভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যক্তির প্রেতাত্মা ছায়ামূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের উত্তরাধিকারী-দিগকে দিয়া শ্রাদ্ধ করাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধের ফললাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে যে সকল বিবরণ আছে, তাহা ক্রমে আলোচনা করিব। শ্রাদ্ধদ্বারা প্রেতাত্মার মুক্তি এবং তৃপ্তি লাভ সম্বন্ধে লৌকিক প্রমাণেরও অভাব নাই। এই সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আমার এক আত্মীয় সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং উত্তরভারতের প্রায় প্রতিটি দেশীয় রাজ্যের নৃপতির নিকট হইতে বার্ষিক বৃত্তি পাইতেন। এই বৃত্তির টাকায় তাঁহার সংসার বেশ সচ্ছলভাবেই চলিত। এই পণ্ডিত ব্যক্তিটির নাম ছিল ৺হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন। বার্ষিক বৃত্তি আদায়ের জন্য প্রতিবৎসর একবার তাঁহাকে সমগ্র উত্তরভারত পর্য্যটন করিতে হইত। বহু বড়লোকের বাড়ীতে তিনি শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানেও নিমন্ত্রিত হইয়া যাইতেন। ছেলেবেলায় উক্ত সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয়ের মুখে শ্রাদ্ধের ফল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়াছি।

একবার এক জমিদারবাড়ীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন। ৺হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয়ও ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে তথায় পণ্ডিতগণের মধ্যে শাস্ত্রালোচনা চলিতে থাকে। এই সময়ে একজন ভদ্রলোক আসিয়া পণ্ডিতগণকে প্রণাম করিলেন এবং কিছু বলিবার ইচ্ছায় জোড় হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জনৈক প্রবীণ পণ্ডিত তাঁহাকে বলিলেন—"কি বলিতে

চান, বলুন।" তখন ঐ ভদ্রলোকটি বলিতে লাগিলেন—"আমি নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে বাস করি। আমার বাসগৃহের উত্তরে একটি শাখাপ্রশাখাসমৃদ্ধ বৃহৎ বৃক্ষ আছে। কিছুদিন যাবৎ ঐ বৃক্ষে ভীষণ খট্‌ খট্‌ শব্দ হইতেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর হইতে এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হয় এবং সারারাত্রি আমরা ঘুমাইতে পারি না। ইহা দুষ্টলোকের কার্য্য ভাবিয়া আমরা দুর্ব্বৃত্তদিগকে ধরিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোন মানুষ বা অন্য কিছুই দেখিতে পাই নাই। পাড়ার ছেলেরা দিনের বেলা হইতে বৃক্ষটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তথাপি সন্ধ্যার পরই উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। পুলিশ আসিয়াও পাহারা দিয়াছে, কিন্তু ফল একই হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে ভূত বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু এখন নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছি যে ইহা ভূতেরই কার্য্য। পূর্ব্বে শুধু খট্‌খট্‌ শব্দই হইত, কিন্তু এখন দিনের পর দিন উপদ্রব বাড়িয়াই চলিয়াছে। এক এক দিন তো অবস্থা এমন অসহনীয় হইয়া উঠে যে, ঘরের মেয়েরা কাঁদিতে থাকেন। এক এক দিন রাত্রিতে এমন ঘটনা ঘটে যে, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া আমরা আহার করিতে বসিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে গরুর হাড়, মানুষের বিষ্ঠা ইত্যাদি নোংরা দ্রব্য আসিয়া আমাদের থালার কাছে পড়ে। সেদিন রাত্রিতে আমাদের আর খাওয়া হয় না। আপনারা দয়া করিয়া এমন একটা উপায় বলিয়া দিন, যাহাতে এই ভৌতিক উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইতে পারি।"

উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া ভদ্রলোক বিমর্ষমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন একজন পণ্ডিত বলিলেন—"গয়ায় গিয়া উহার মুক্তির জন্য পিণ্ডদান করিয়া আসুন।" ভদ্রলোকটি বলিলেন—"উহার নাম গোত্র কিছুই তো জানি না, কি বলিয়া গয়ায় পিণ্ড দিব?" ইহার পর কয়েকজন প্রবীণ পণ্ডিত নিজেদের মধ্যে কিছুটা আলোচনা করিলেন এবং তাঁহাদের মুখপাত্ররূপে একজন বলিলেন—"যাহার নামগোত্রাদি জানা না থাকে, তাদৃশ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের বিধানও শাস্ত্রে আছে। এইরূপ স্থলে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। আমি একটি মন্ত্র লিখিয়া দিতেছি, আপনি উহা লইয়া যান এবং গয়ায় গিয়া এই মন্ত্রদ্বারা পিণ্ডদান করুন। তাহা হইলেই ভূতের প্রেতত্ব-বিমুক্তি ঘটিবে এবং সে উপদ্রবের পরিবর্ত্তে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাইবে।" এই কথা বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় একটি মন্ত্র রচনা করিলেন এবং পড়িয়া সকল পণ্ডিতকেই শুনাইলেন। পণ্ডিতগণের সমর্থন লাভ করিয়া তিনি মন্ত্রটি উল্লিখিত ভদ্রলোকের হাতে দিলেন। উক্ত মন্ত্র যথা—

"মদ্‌বাট্যাশ্চোত্তরে ভাগে নিত্যং যঃ খট্‌খটায়তে।
তস্যৈবোদ্ধরণার্থায় পিণ্ডমেতং দদাম্যহম্‌ ॥"

ভদ্রলোকটি গয়ায় গিয়া উল্লিখিত মন্ত্রে পিণ্ডদান করেন এবং বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ভূতের উপদ্রব দূরীভূত হইয়াছে।

মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার 'মরণের পারে' নামক গ্রন্থে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারী শান্তিপ্রকাশ-বিরচিত 'অবিনশ্বর' গ্রন্থে, এবং ভারতে ও বিদেশে প্রকাশিত বহু পুস্তকে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অসংখ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আর্য্যসন্তানগণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একশ্রেণীর বর্ণাশ্রমবিদ্বেষী নাস্তিকেরা প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইতেছেন—

"মরা গরুতে আবার ঘাস খায় না কি ?"

সাধারণ মানুষ এইরূপ কথায় বিভ্রান্ত হয় এবং পারমার্থিক কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

নাস্তিক লোকেরা যে কেবল বর্ত্তমান কালেই আছে, এমন নহে ; যুগে যুগে ইহাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং হিন্দু-ভারতের পরমতসহিষ্ণুতার সুযোগ নিয়া ইহারা 'নাস্তিক-দর্শন' নামে একশ্রেণীর আপাতরম্য-যুক্তিসমন্বিত গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছে। ইহারা আপাতমধুর বাক্যে সরল-প্রকৃতি মানুষকে বিভ্রান্ত করে বলিয়া আর্য্যভারতে 'চার্ব্বাক' নামে অভিহিত হইয়াছে। চার্ব্বাক শব্দের অর্থ—চারু (সুন্দর) বাক্ (বাক্য) যাহার। বাল্মীকির রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড ; অধ্যায়—১০৮) হইতে আমরা জানিতে পারি, জাবালি নামক এক চার্ব্বাক শ্রীরামচন্দ্রকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া তৎকর্ত্তৃক কঠোরভাবে তিরস্কৃত হন। সংস্কৃত মহাভারত হইতে জানা যায়—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর এক চার্ব্বাক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় আসিয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করে এবং সভাস্থ ঋষিগণের শাপানলে দগ্ধ হয়। এই চার্ব্বাক দুর্য্যোধনের সখা ছিল এবং মহাভারতের রচয়িতা তাহাকে রাক্ষস-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। মহাভারতের ভাষায়—

"দুর্য্যোধন-সখা কশ্চিচ্চার্ব্বাকো নাম রাক্ষসঃ।"

এই শ্রেণীর চার্ব্বাকেরা যে নাস্তিক-দর্শন প্রণয়ন করে, তাহা 'চার্ব্বাক-দর্শন' নামে পরিচিত। উক্ত 'চার্ব্বাক-দর্শন' গ্রন্থখানা এখন আর পাওয়া যায় না ; তবে মাধবা-

চার্য্যের 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে উহার সারাংশ সন্নিবিষ্ট আছে। তাহা ছাড়া বৃহস্পতি-স্মৃতি, রামায়ণ, নৈষধীয়চরিত, তত্ত্বোপপ্লবসিংহ প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে চার্ব্বাকের বিভিন্ন যুক্তি লিপিবদ্ধ আছে। শ্রাদ্ধের বিরুদ্ধে চার্ব্বাকেরা যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি যুক্তিই প্রধান। যথা—

(১) "স্বর্গস্থিতা যদি তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিষ্ঠানামত্র কস্মান্ন দীয়তে ?"

[ভূমিতে পিণ্ডদান করিলে যদি স্বর্গস্থ পিতৃগণ উহা পাইতে পারেন, তাহা হইলে অট্টালিকার দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতিতে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের জন্য নীচের তলায় খাবার রাখিলেই তো চলিতে পারে।] তাৎপর্য্য এই যে, নীচের তলায় খাবার রাখিলে যেমন উপরের অধিবাসীরা উহা গ্রহণ করিতে পারেন না, তেমনি স্বর্গস্থ পিতৃগণও ভূমিস্থিত পিণ্ডাদি গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

(২) "গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্।
গেহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথি তৃপ্তিরবারিতা ॥"

[শ্রাদ্ধদ্বারাই যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ হয়, তাহা হইলে বিদেশগত ব্যক্তির সঙ্গে পাথেয় দেওয়ার প্রয়োজন কি ?] তাৎপর্য্য এই যে, বিদেশস্থ ব্যক্তি যেমন নিজ-গৃহস্থিত খাদ্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ, পরলোকগত প্রাণীরাও তেমনি পিণ্ডাদি গ্রহণে অসমর্থ।

উল্লিখিতপ্রকার যুক্তিদ্বারা নাস্তিক চার্ব্বাকেরা সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল করিতে চেষ্টা করে এবং সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ লইয়া তাহারা তাঁহাদিগকে অনেক স্থলেই বিভ্রান্ত করিতে সমর্থ হয়। সম্প্রতি চার্ব্বাকের উল্লিখিত প্রধান যুক্তি দুইটি খণ্ডন করিতেছি। যথা—

১। কোন অট্টালিকার দ্বিতল, ত্রিতল বা পঞ্চতল, সপ্ততল প্রভৃতিতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই নীচে নামিয়া আসিয়া খাদ্যাদি গ্রহণ করিতে পারেন এবং অনেকক্ষেত্রে এইরূপ করিয়াও থাকেন। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি—কোন একটি পাঁচতলা দালানের নীচের তলায় একটি হোটেল ছিল এবং উপরের তলাগুলির কোন কোন অংশে কিছু সংখ্যক ছাত্র ও চাকুরীজীবী বাস করিতেন। নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার ঘণ্টা পড়িত এবং উপরের তলার ঐ সকল লোক তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া নীচের তলার ডাইনিং হলে আহারে বসিতেন। যথারীতি আহার গ্রহণের পর পুনরায় তাঁহারা নিজ নিজ ঘরে চলিয়া যাইতেন। পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ

নির্দিষ্ট তিথিতে নির্দিষ্ট সময়েই করা হইয়া থাকে, এবং শ্রাদ্ধের আরম্ভকালে যে সকল মন্ত্রপাঠ করা হয়, তাহারাও উক্ত হোটেলের ঘণ্টার মতই কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং স্বর্গস্থিত পিতৃগণের পক্ষে শ্রাদ্ধস্থলে নামিয়া আসা এবং পিণ্ডাদি গ্রহণ করা যে সম্ভব, এই সত্যটিকে চার্ব্বাকদের উল্লিখিত যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিতেছে না।

দ্বিতীয়তঃ বৈদ্যুতিক লিফট্ বা রজ্জু প্রভৃতির সাহায্যে নীচের তলায় প্রদত্ত খাদ্য অনায়াসে উপরতলস্থিত লোকের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতে পারে। নীচের তলায় থাকিয়া কোন ব্যক্তি একটি বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিলেই অথবা দড়িবিশেষে টান দিলেই নীচের তলায় থালা প্রভৃতিতে স্থাপিত খাদ্য ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে আরম্ভ করে এবং অবিলম্বে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে। সুতরাং এইরূপ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা থাকিলে, উপরের বাসিন্দারা নীচে না নামিয়াও উপরে নিজ নিজ ঘরে থাকিয়াই নীচের তলায় স্থাপিত খাদ্যগুলি গ্রহণ করিতে পারেন। শ্রাদ্ধে পঠনীয় মন্ত্রগুলি উল্লিখিত বৈদ্যুতিক বোতাম বা রজ্জুর মত কার্য্য করে; সুতরাং স্বর্গে থাকিয়া পিতৃগণ পৃথিবীতে প্রদত্ত পিণ্ডাদি গ্রহণ করিতে পারেন। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, চার্ব্বাকের উল্লিখিত আপাতরম্য যুক্তিটির বস্তুতঃ কোন মূল্যই নাই।

২। বিদেশে যাওয়ার সময় আজকাল অনেকেই বেশী টাকা বা দ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া নেন না; কারণ ইহাতে নানা ঝামেলা আছে। টাকা রাস্তায় চুরি হওয়ার ভয় থাকে এবং বেশী দ্রব্যাদি সঙ্গে নিলে ইহাদের মাশুলও বেশী দিতে হয়। তাহা ছাড়া বেশী ভারী জিনিষ সঙ্গে থাকিলে মজুর সংগ্রহের জন্যও নানারূপ সমস্যায় পড়িতে হয়। এই কারণে বুদ্ধিমান লোকেরা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাঠাইয়া নিজেরা প্রায় খালি হাতে বিদেশে যাত্রা করেন। দেশের অভ্যন্তরেও দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার সময় কেহ ব্যাঙ্কের সাহায্য নেন, এবং অন্যেরা পোষ্টাল অর্ডার ব্যবহার করিয়া থাকেন। মোট-কথা, বুদ্ধিমান লোকেরা কোন সময়েই বেশী টাকা বা দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া চলাফেরা করেন না

আজকাল অনেক ছেলেমেয়ে বিদেশে থাকিয়া পড়াশোনা করে। প্রতি মাসেই নিজেদের দেশ হইতে তাহাদের পিতা, মাতা বা অন্য অভিভাবক ব্যাঙ্ক অথবা পোষ্টাপিসের মাধ্যমে তাহাদের কাছে টাকা পাঠাইয়া থাকেন। দেশের কোন ভাল জিনিষ পাঠাইবার ইচ্ছা হইলেও তাঁহারা ডাকবিভাগের মাধ্যমে পার্শ্বেল যোগেই উহা পাঠাইয়া থাকেন। ঐ সকল টাকা কড়ি বা দ্রব্যাদি পাইতে বিদেশস্থ লোকের কোন অসুবিধাই হয় না। ব্যাঙ্ক বা ডাকবিভাগ যেমন ঈপ্সিত ব্যক্তির

নিকট তাহার প্রাপ্য অর্থাদি পৌঁছাইয়া দেয়, মন্ত্রশক্তিও তেমনি পিতৃগণের নিকট শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের সূক্ষ্মভাগ পৌঁছাইয়া থাকে। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, চার্ব্বাকদের দ্বিতীয় যুক্তিটিও সম্পূর্ণ অসার। এইভাবে নাস্তিকদের প্রদর্শিত যাবতীয় যুক্তির অসারতা অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়।

যাহারা বলে "মরা গরুতে কি ঘাস খায়?" তাহাদিগকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে চাই—আত্মার নিত্যত্ব এবং জন্মান্তরবাদ তাহারা স্বীকার করে কি না। বেদাদি-শাস্ত্রে আত্মার নিত্যত্ব এবং জন্মান্তরবাদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লৌকিক অভিজ্ঞতাদ্বারাও উল্লিখিত বৈদিক সিদ্ধান্তের সত্যতাই প্রমাণিত হয়। অতএব সত্যকথা বলিলে বলিতে হইবে যে আত্মা নিত্য এবং প্রাণীর আত্মা যে পুনরায় দেহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নূতন প্রাণিরূপে আবির্ভূত হয় (জন্মগ্রহণ করে) একথাও সত্য। আত্মা যদি নিত্য হয় এবং জন্মান্তরগ্রহণও যদি সত্য হয়, তবে মরা গরু দেহান্তর-ধারণের পরে পুনরায় ঘাস বা অন্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবে—একথাও মানিয়া লইতে হয়।

মানুষ মরা গরুর শ্রাদ্ধ করে না। তাহার মাতা, পিতা বা অন্য আত্মীয়ের আত্মার তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। এই সকল মৃতব্যক্তির আত্মা যে তাহাদের দেহধ্বংসের পরেও বিদ্যমান থাকেন এবং প্রিয়জনের প্রদত্ত পিণ্ডাদির সূক্ষ্মভাগ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন, ইহা বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এবং সত্যদর্শী সাধকেরাও সাধনার সাহায্যে ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। সম্প্রতি প্ল্যাঞ্চেট্ নামক যন্ত্রের বা অন্যবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে অনেকেই প্রেতাত্মাকে আনয়ন করিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন। এই সকল কথাবার্ত্তা হইতে বুঝা যায়—সাধারণতঃ প্রেতাত্মার কামনা, বাসনা ইত্যাদি বিলুপ্ত হয় না এবং তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদিও থাকে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে বহু কথা বলিতে হয়; সুতরাং আপাততঃ তাদৃশ আলোচনায় বিরত রহিলাম। এক্ষেত্রে এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখি যে, একদিকে শাস্ত্রপ্রমাণ, অপরদিকে সর্ব্বজনমান্য পণ্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু ৺চিত্তরঞ্জন দাশ, স্বামী ৺অভেদানন্দ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং প্ল্যাঞ্চেট্ প্রভৃতির সাহায্যে প্রেতাত্মার আনয়ন ও তৎসহ আলাপ-আলোচনা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতেছে যে, মৃত্যুই শেষ নহে; ইহার পরেও আত্মার অস্তিত্ব ও ক্ষুধাতৃষ্ণা ইত্যাদি থাকে; সুতরাং তাহার তৃপ্তি ও মুক্তির জন্য শাস্ত্রোক্ত বিধানে শ্রাদ্ধাদি করা একান্ত আবশ্যক।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—মানুষ যেমন তাহার পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া গেলে বা নোংরা হইলে উহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥" ২।২২

অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে জানা যায়—মৃত ব্যক্তির আত্মা দেহত্যাগের পর প্রথমে কিছুকাল 'বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ' হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিলে, তাহারই ফলে উক্ত প্রেতাত্মা নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া কর্ম্মানুযায়ী যোনিতে প্রবেশ করেন। প্রেতশ্রাদ্ধ সম্পাদনের ইহাই আশু ফল। অতঃপর সাম্বৎসরিক একোদ্দিষ্ট বা পার্ব্বণ প্রভৃতি শ্রাদ্ধ করিলে তাহাতে প্রদত্ত পিণ্ডাদির সূক্ষ্ম অংশ যে কোন লোকে যে কোন অবস্থায় স্থিত সেই আত্মার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে।

শাস্ত্র বলেন—মৃত ব্যক্তির আত্মা যদি পুণ্যবলে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ডাদির সূক্ষ্ম ভাগ অমৃতের আকার ধারণ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি বিধান করে।

"দেবো যদি পিতা যাতি তদন্নমমৃতম্ভবেৎ।"

(এখানে 'দেবত্বম্' অর্থে 'দেবো' এই আর্ষ প্রয়োগটি হইয়াছে)। যদি মৃত ব্যক্তির আত্মা গবাদি-জন্তুরূপে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে পিণ্ডের সূক্ষ্মভাগ তৃণরূপে তাহার কাছে উপস্থিত হয়, এবং সে যদি বিষ্ঠাভুক্ ক্রিমিরূপে পুনরায় জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেও পিণ্ডাদির সূক্ষ্মভাগ বিষ্ঠাত্ব লাভ করিয়াই তাহার তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হয়। ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণের প্রদত্ত বিধান অনুসারে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা কখনই ব্যর্থ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থ হইতে জানা যায়—ভল্লুকরাজ জাম্ববানের গুহায় প্রবিষ্ট বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ মহাবল ভল্লূকরাজের সহিত দীর্ঘ ২৮ দিন মল্লযুদ্ধ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়েন। দীর্ঘকাল তাঁহাকে ভল্লূকের গুহা হইতে নির্গত হইতে না দেখিয়া, ভল্লূককর্তৃক তিনি নিহত হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গীরা চলিয়া যায় এবং যথাকালে তাঁহার শ্রাদ্ধ যথাবিধি সম্পাদিত হয়। যদিও বাসুদেব তখন জীবিত ছিলেন তথাপি শ্রাদ্ধে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ডাদির সূক্ষ্ম অংশ তাঁহার অবসন্ন

দেহে নূতন বল সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং ইহারই ফলে অষ্টাবিংশ দিবসে ভল্লুকরাজকে বধ করিয়া তিনি নির্গত হইতে পারিয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—অনেকেরই তো যথাবিধি শ্রাদ্ধ করা হয় না; ইহাদের সকলেরই প্রেতাত্মা নিজ নিজ মুক্তির জন্য কোন না কোন মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয় না কেন? ইহার উত্তর অতি স্পষ্ট। বোবা যেমন কথা বলিতে পারে না এবং দারুণ বাতব্যাধিগ্রস্ত লোক যেমন নড়াচড়া পর্য্যন্ত করিতে পারে না, তেমনি চিরকাল পাপচিন্তায় নিমগ্ন লোকেরা নিজ মঙ্গল চিন্তা করিতেও ভুলিয়া যায়। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির আত্মার ন্যায় উল্লিখিত মহাপাপীদের আত্মাও ছায়াদেহ ধারণ করিবার বা স্বেচ্ছানুসারে চলিবার বা কথা বলিবার শক্তিও হারাইয়া ফেলে; এই কারণেই প্রেতলোকে নিদারুণ দুর্দ্দশায় নিপতিত হইয়াও ইহারা উদ্ধার লাভের কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না। ইহারই ফলে কোন আত্মীয় বা পরোপকারী ব্যক্তির শরণাপন্ন হইয়া তাহার মুক্তির উপায় করিয়া দেওয়ার অনুরোধ জানাইতেও ইহারা সর্ব্বথা অসমর্থ থাকে।

শ্রাদ্ধ না করিলে ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর প্রেতাত্মা তাহার জীবিত আত্মীয়কে অভিসম্পাত করে এবং সে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইলে ভৌতিক উপদ্রবেরও সৃষ্টি করিয়া থাকে। কখন কখন উন্মাদ প্রভৃতি ব্যাধি সৃষ্টির জন্যও এই সকল প্রেতাত্মাই দায়ী। অতএব প্রেতের প্রীতিবিধান ও প্রেতত্ব-বিমুক্তির জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধ করা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধতত্ত্বের আদিকথা

প্রত্যেকটি কার্য্যেরই একটি কারণ থাকে। শ্রাদ্ধ যখন একটি ক্রিয়া, তখন তাহারও একটি কারণ থাকা সম্ভব। প্রত্যেক ক্রিয়ার যখন একটা উৎপত্তিকাল আছে, তখন শ্রাদ্ধরূপ ক্রিয়ারও একটি উৎপত্তিকাল থাকাই কি সম্ভব নহে?—এইরূপ প্রশ্ন অনেকের মনেই জন্মিতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক। সৃষ্টি, আলোকদান প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক একটি ক্রিয়া সুতরাং ইহাদের একটা আদি থাকাও সম্ভব। কিন্তু কোন্ সময়ে সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়, কোন্ দিন নক্ষত্রেরা আকাশে আলোকদান আরম্ভ করে, কোন্দিন হইতে অগ্নি প্রথম তাপদান আরম্ভ করিয়াছে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেই সম্ভব নহে। আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, যেদিন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক গুণত্রয়ের মধ্যে প্রথম বিকার উপস্থিত হইয়াছিল, সেইদিন হইতেই প্রথম সৃষ্টির আরম্ভ; যেদিন প্রথম জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হয়, সেইদিন হইতেই সে সর্ব্বপ্রথম আলোকদান আরম্ভ করে এবং অগ্নির উৎপত্তিদিবস হইতেই তাপদান আরম্ভ হয়। কিন্তু এইগুলির সন তারিখ নির্দ্ধারণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। ইহারা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে, সুতরাং ইহাদের ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করা যায়।

শ্রাদ্ধের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের পর হইতেই শ্রাদ্ধক্রিয়ার প্রথম আরম্ভ হয়। ইহা আজ হইতে কত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা, তাহা বলা সম্ভব নহে; অতএব শ্রাদ্ধেরও ব্যাবহারিক নিত্যতাই স্বীকার্য্য। ঋগ্বেদ প্রকাশের বা রচনার কাল আজ হইতে কত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী, এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কাহারও কাহারও মতে উক্ত সময় খ্রীষ্টের জন্মের ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী; আবার অন্যদের মতে ৬।৭ হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। আমার বিবেচনায় ঋগ্বেদ প্রকাশের কাল আরও অনেক বেশী পূর্ব্ববর্ত্তী। এই বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এই অতি প্রাচীন ঋগ্বেদেও শ্রাদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়। তবে বৈশিষ্ট্য এই যে, বৈদিক যুগে ইহাকে 'শ্রাদ্ধ' না বলিয়া 'পিতৃমেধ-যজ্ঞ' বলা হইত।

পিতৃমেধযজ্ঞে বা শ্রাদ্ধে যে পিতৃপুরুষগণ সূক্ষ্মদেহে আগমন করেন, এই বিশ্বাস ঋগ্বেদের যুগেও হিন্দুগণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। প্রমাণ স্বরূপ ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা—

"অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা
অথর্ব্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানা-
মপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।১৪।৬

বঙ্গার্থ :—অঙ্গিরানামক, অথর্ব্বানামক এবং ভৃগুনামক আমাদের পিতৃপুরুষগণ এইমাত্র আসিয়াছেন। তাঁহারা সোমরস পাইবার অধিকারী এবং যজ্ঞকার্য্যে অভিজ্ঞ। তাঁহাদের নির্দ্দেশিত সুবুদ্ধি, উদারতা এবং মঙ্গলজনক পথে আমরা বিদ্যমান থাকিব।

পিতৃমেধ-যজ্ঞেও বর্ত্তমানকালে প্রচলিত শ্রাদ্ধের ন্যায় দক্ষিণদিকে ভূমিতে কুশ স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর পিণ্ডাদি দান করা হইত এবং পিতৃগণ সূক্ষ্মদেহে আসিয়া ঐ সকল কুশের উপর বসিয়া পিণ্ড প্রভৃতির সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করিতেন—এইরূপ বিশ্বাস বৈদিক-যুগের হিন্দুদের অন্তরেও বিদ্যমান ছিল। ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি হইতে পাঠক-পাঠিকাগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"আচ্যা জানু দক্ষিণতো নিষদ্যেমং যজ্ঞমভিগৃহীত বিশ্বে।
মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেনচিন্নো যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম ॥" ১০।১৫।৬

বঙ্গার্থ :—হে পিতৃগণ! তোমরা দক্ষিণদিকে ভূমিনিহিত-জানু হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক এই যজ্ঞকে প্রশংসা কর। আমরা মনুষ্য, সুতরাং কোনরূপ অপরাধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ; কিন্তু এই নিমিত্ত তোমরা আমাদের কোনরকম অনিষ্ট করিও না।

"অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত, সদঃ সদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ।
অত্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রয়িং সর্ব্ববীরং দধাতন ॥" ১০।১৫।১১

বঙ্গার্থ :—হে অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ! তোমরা উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ। এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক আসনে প্রত্যেকে উপবেশন কর। এখানে কুশের উপর হোমের দ্রব্যসমূহ প্রসারিত আছে ; এইগুলি গ্রহণ করিয়া ধন ও পুত্রপৌত্রাদি দান কর।

"উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু।
ত আগমন্তু ত ইহ শ্রুবন্ত্বধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্ ॥" ১০।১৫।৫

বঙ্গার্থ ঃ—কুশের উপর এই সমস্ত মনোহর দ্রব্য সংস্থাপন করা হইয়াছে। পিতৃগণ সোমরস গ্রহণের জন্য এবং ঐ সকল দ্রব্য ভোগ করিবার জন্য আহূত হইয়াছেন। তাঁহারা আগমন করুন, আমাদের মন্ত্রপাঠ শ্রবণ করুন, আনন্দ প্রকাশ করুন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে পিতৃগণ, পিতৃলোক, পিতৃযাণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। দশম মণ্ডলের দুইটি সম্পূর্ণ সূক্তই পিতৃলোক সম্বন্ধে রচিত। চতুর্দ্দশ সূক্তের দেবতা পিতৃলোক ও যম এবং ইহার ঋষি যম। পঞ্চদশ-সূক্তের দেবতা পিতৃলোক এবং ঋষি শঙ্খ। উল্লিখিত দুইটি সূক্তের বিভিন্ন মন্ত্রে কব্য, বর্হিষদ্, সোম্য, অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর পিতৃগণেরও উল্লেখ দেখা যায়। ১০।২।৭ মন্ত্রে অগ্নিদেবের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"পিতৃলোকে যাইবার পথ কোন্‌টি তাহা তুমি জান; অতএব তুমি এরূপ ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর, যাহাতে ঐ পথ আলোকময় হইয়া উঠে।" ১০।১৪।৩ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"মাতলির প্রভু ইন্দ্র 'কব্য' নামক পিতৃলোকদের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন।" ১০।১৪।৪ মন্ত্রে যমকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—"হে যম! এই আরব্ধ যজ্ঞে আসিয়া উপবেশন কর। তুমি এই যজ্ঞ সম্বন্ধে অবহিত। তোমার সঙ্গে অঙ্গিরানামক পিতৃলোকদিগকে লইয়া আস।" ১০।১৪।১০ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্ব্বদা আমোদ-আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তরপথ দিয়া তাঁহাদের নিকট গমন কর।" এইভাবে চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ সূক্তের প্রায় প্রত্যেকটি মন্ত্রেই পিতৃমেধ-যজ্ঞ ও নানাশ্রেণীর পিতৃগণের উল্লেখ রহিয়াছে।

যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয়-সংহিতায় শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বহু কথা বলা হইয়াছে। বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধে যে বিখ্যাত রুদ্রাধ্যায় পাঠ করা হয়, ইহা তৈত্তিরীয়-সংহিতারই অন্তর্গত। এই রুদ্রাধ্যায়ের ভিতর দিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বীদের যে লোকাতীত বিনয় ও বিশ্বপ্রেম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সামবেদের বহু মন্ত্র শ্রাদ্ধকালে পাঠ করা হইত বলিয়াই সম্ভবতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু ইহাকে পিতৃদৈবত[১] বেদ বলিয়াছেন।

কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রের একবিংশ অধ্যায়ে পিতৃমেধ-যজ্ঞের বিধান দৃষ্ট হয়। উক্ত অধ্যায়ে পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ এবং পিতৃমেধ এই তিনটি যজ্ঞেরই বিধান আছে (পুরুষমেধঃ সর্ব্বমেধঃ পিতৃমেধশ্চ)। উল্লিখিত স্থানে যে ভাবে পিতৃমেধ-যজ্ঞের

১। সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যঃ।—মনুসংহিতা ৪।১২৪

বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয়—মৃততিথিতে মাসিক, সাম্বৎসরিক প্রভৃতি শ্রাদ্ধ তখনকার দিনেও প্রচলিত ছিল। শ্রৌতসূত্রকার বলিয়াছেন—মৃত ব্যক্তির মৃত্যু-বৎসর যদি জানা না থাকে, তাহা হইলেও পিতৃমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায়, মৃত্যু-বৎসর জানা থাকিলে পিতৃমেধ যজ্ঞ না করিয়া অন্য কোন প্রকার শ্রাদ্ধই করা হইত।

পিতৃমেধ যজ্ঞ কখন কিভাবে করিতে হইবে, তাহাও শ্রৌতসূত্রকার উল্লিখিত অধ্যায়েই পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ এই যে, যদি মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া থাকে, তবে কোন অযুগ্ম বর্ষে, আকাশে একটিমাত্র নক্ষত্র দেখিয়া পিতৃমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে। অথবা অমাবস্যা তিথিতে কিংবা গ্রীষ্ম বা শরৎকালের যে কোন দিনে একটিমাত্র নক্ষত্র দেখিয়া এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা চলিবে। এতদ্ব্যতীত মাঘ মাসেও এই যজ্ঞ করা চলে। পাঠকগণের অবগতির জন্য কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রের (২১ শ অধ্যায়) উল্লিখিত সূত্রগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"পিতৃমেধঃ সংবৎসরাস্মৃতৌ ॥ ১ ॥
অযুগ্মেষু বা ॥ ২ ॥
একনক্ষত্রে ॥ ৩ ॥
অমাবস্যায়াম্ ॥ ৪ ॥
নিদাঘ-শরন্মাঘেষু ॥ ৫ ॥"

বৈদিকযুগে সম্ভবতঃ ইহাকে 'শ্রাদ্ধ' বলা হইত না ; যজ্ঞই বলা হইত। শ্রাদ্ধ নামটির উল্লেখ এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিধানাবলী স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস (রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি)[২] শ্রেণীর-গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে।

মনু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রত্যেক স্মৃতিকারই শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর কথা বলিয়াছেন। মনু বলেন—দেবকার্য্যের চেয়েও পিতৃকার্য্যের গুরুত্ব অধিক। তাৎপর্য্য এই যে, দেবকার্য্য না করিলে প্রত্যবায় হয় না ; কিন্তু পিতৃকার্য্য না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। এই প্রসঙ্গে মনু যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, পিতৃকার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে বাধ্য হইয়াই কিছুটা দেবকার্য্যও করিতে হয় ; কিন্তু দেবকার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে পিতৃকার্য্য অবশ্য-করণীয় নহে। এই সম্বন্ধে মনুসংহিতার শ্লোক যথা—

"দেবকার্য্যাদ্ দ্বিজাতীনাং পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে।
দৈবং হি পিতৃকার্য্যস্য পূর্ব্বমাপ্যায়নং শ্রুতম্ ॥"৩।২০৩

২। ইতিহাসঃ ভারতঞ্চ বাল্মীকিকাব্যমেব চ। —ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ; শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩৩।২৩

যদিও মনু এখানে একটিমাত্র যুক্তি দেখাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, তথাপি ব্যাখ্যাকার হিসাবে আমরা আরও বহু যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারি। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পৃথক্ প্রবন্ধে করিব।

অত্রিসংহিতায় (শ্লোক—৩৫১) বলা হইয়াছে—পিতার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে না, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারগণও দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, পিতা বা অন্য আত্মীয়ের মৃত্যুর পর প্রথমে প্রতি মাসে এবং প্রতি বৎসরে একবার করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া মৃত্যুর একাদশ দিবসে (ব্রাহ্মণের জন্য) আদ্যশ্রাদ্ধটি অবশ্যই করা চাই।

"মৃতাহনি তু কর্ত্তব্যং প্রতিমাসন্তু বৎসরম্।
প্রতি সংবৎসরঞ্চৈবমাদ্যমেকাদশেঽহনি ॥"

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।২৫৬

অন্যান্য স্মৃতিতে এবং বিভিন্ন পুরাণেও অনুরূপ বিধান দৃষ্ট হয়। তাহা ছাড়া ঐ সকল গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটিতেই অমাবস্যা, উত্তরায়ণ, বিষুবসংক্রান্তি প্রভৃতি বিভিন্ন পর্ব্বদিনে এবং বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রেও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতিথিসমাগম চিরদিন ভারতীয় আর্য্যগণের কাছে পরম আদরের বিষয় ছিল। বাড়ীতে অতিথি আসিলে যে কোন দিন এই উপলক্ষে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিয়া বিশেষ বিশেষ উপচারে অতিথির সেবা করিবার জন্যও ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্র বিধান দেওয়া হইয়াছে। তখনকার দিনে 'রেশন' প্রথা ছিল না, এবং প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যসামগ্রী থাকিত; সুতরাং অতিথিসেবা প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য সাধনে তাঁহাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার কোন কারণ ছিল না।

বাল্মীকির রামায়ণ হইতে জানা যায়—দশরথের মৃত্যুর পর রাজধানীতে ভরত কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং ইহার পরেও জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে দিয়া পুনরায় শ্রাদ্ধ করাইবার জন্য রাজপরিবারের পরম হিতৈষী বিচক্ষণ মন্ত্রী সুমন্ত্র, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করেন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর দশরথের মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া শ্রাদ্ধ করিবার কথা বলেন। বনবাসী উক্ত অংমন্দাকিনী-নদীতে স্নান ও তর্পণ করিয়া উক্ত নদীর তীরে দক্ষিণাগ্র আছে (পুষ্প ইঙ্গুদীপিণ্যাক ও বদরীদল-মিশ্রিত পিণ্ড দান করতঃ পিতার শ্রাদ্ধ

১। সামবে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরে বলিব।

মহাভারতে দেখি—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর নিহত বীরগণের আত্মীয়েরা যথাবিধি তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ শুধু তাঁহার বিধবা পত্নী উত্তরাই করেন নাই ; পিতা অর্জ্জুন, পিতৃব্য যুধিষ্ঠির প্রভৃতি, এমন কি মাতুল শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত এই বীর যুবকের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এইভাবে সর্ব্বকালে ভারতীয় আর্য্যগণ বৈদিক বিধানে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং সম্প্রতিও যে ইহার প্রয়োজন আছে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধের উৎপত্তি-কথা

মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে, তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা) রহিয়াছে। ৪।৫ বৎসরের শিশু প্রায়ই মাতাপিতাকে নানারূপ প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিয়া থাকে। এইটা কি? ঐটা কি? এটা কেন করা হয়? এ কাজ কেন করিব?—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন সর্ব্বদাই শিশুদের মুখে শোনা যায়। শুধু শিশুকালেই নহে; সারা জীবন, এমন কি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এইরূপ জিজ্ঞাসা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতেই ঋষিরা নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, শিল্পী প্রভৃতির নূতন নূতন আবিষ্কারের পশ্চাতেও এইরূপ জিজ্ঞাসাই কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নূতন নূতন তথ্য জানিবার উদ্দেশ্যে রণক্ষেত্রে শরশয্যাশায়ী পিতামহ ভীষ্মের কাছে সর্ব্বদাই যাইতেন। যখনই যে বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের মনে সংশয় জন্মিয়াছে, তখনই তিনি সেই বিষয়ে পিতামহকে প্রশ্ন করিয়াছেন এবং মহাজ্ঞানী পিতামহ শাস্ত্র ও লোকাচারের ভিত্তিতে তাঁহার প্রত্যেকটি প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছেন।

এক সময়ে যুধিষ্ঠিরের মনে প্রশ্ন জন্মিল—লোকে যে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করে, ইহার উৎপত্তি হইল কখন এবং কে ই বা এই প্রথার সৃষ্টি করিল? যুধিষ্ঠির শুনিয়াছেন—অতি প্রাচীনকালে যখন ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি মুনিগণ যজ্ঞকার্য্যের প্রবর্ত্তন করেন, তখন হইতেই পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধও চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু কোন্ মুনি প্রথমে শ্রাদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। জিজ্ঞাসু যুধিষ্ঠির তাই ভীষ্মকে প্রশ্ন করিলেন—

"কেন সঙ্কল্পিতং শ্রাদ্ধং কস্মিন্ কালে কিমাত্মকম্।
ভৃগ্বঙ্গিরসকে কালে মুনিনা কতরেণ বা।"

—অনুশাসনপর্ব্ব (হরিদাসীয় সংস্করণ) ৭৮।১

যুধিষ্ঠিরের উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম যাহা বলিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয়, পিতৃযজ্ঞের আদি প্রবর্ত্তনকারীর নাম তিনিও জানিতেন না, তবে শ্রাদ্ধে দানীয় সামগ্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ব্রাহ্মণভোজনাদি প্রক্রিয়া যে সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল,

তাহা ভীষ্মের মোটামুটি জানা ছিল। নিজের জানা ঐতিহাসিক তত্ত্বটি ভীষ্ম তাঁহার নাতির কাছে বলিয়াছেন। ভীষ্মকথিত শ্রাদ্ধোৎপত্তির ইতিহাস নিম্নে সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

ব্রহ্মার অংশসম্ভূত ত্রিকালজ্ঞ ধর্ম্মপ্রবক্তা মহর্ষি অত্রির বংশে দত্তাত্রেয় নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। দত্তাত্রেয়ের পুত্রের নাম ছিল নিমি। ইঁহারও তপস্বিরূপে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। নিমির ঔরসে শ্রীমান্ নামে এক যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল তপস্যা করিবার পর পিতার জীবদ্দশায় শ্রীমানের পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। শোকসন্তপ্ত নিমি অশৌচ ধারণপূর্ব্বক যথাকালে তৎকালীন বিধান অনুসারে পুত্রের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। কিন্তু ইহার পরও পুত্রশোক তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিতে থাকে। দিবসে কোন কার্য্যেই তাঁহার মন বসিত না এবং রাত্রিতেও তাঁহার চোখে ঘুম ছিল না। এইভাবে কিছুকাল কাটাইবার পর পুত্র-স্নেহাতুর পিতা পরলোকগত পুত্রের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে তাহার শ্রাদ্ধ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে সকল পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করা হইত, তাহার নাম ছিল পিতৃযজ্ঞ বা পিতৃমেধ। 'শ্রাদ্ধ' শব্দটি সম্ভবতঃ নিমির সময় হইতেই ব্যবহৃত হইতে থাকে। নিমি যে শ্রাদ্ধ করিলেন, তাহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন এবং পুত্রের পিণ্ডের সহিত নানারূপ উপচারও প্রদান করিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহার পুত্রটি যে সকল জিনিস খাইতে ও ব্যবহার করিতে ভালবাসিত, তাহার সব কয়টিই নিমি শ্রাদ্ধকালে নিবেদন করিয়াছিলেন।

স্নেহের আতিশয্যে তো নিমি উল্লিখিত প্রকারে পরলোকগত পুত্রের শ্রাদ্ধ করিলেন; কিন্তু ইহার পরই তাঁহার মনে সংশয় জন্মিল— কোন শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই তিনি যে কার্য্যটি করিলেন, ইহাদ্বারা ধর্ম্মহানি ঘটে নাই তো? পরম ধার্ম্মিক নিমি শাস্ত্রবিরোধী বা ধর্ম্মবিরোধী কার্য্য করিবার কথা তো ভাবিতেই পারেন না। হায়, হায়, তবে কি ভাল করিতে গিয়া তিনি মন্দ করিয়া বসিয়াছেন? পূর্ব্বে ছিল পুত্রশোকের অশান্তি, আর এখন ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিল নিমির চিত্ত। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি বংশের আদি পুরুষ মহাত্মা অত্রিকে স্মরণ করিলেন।

নিজ বংশধরের আকুল আহ্বানে পিতৃলোকে মহর্ষি অত্রির আসন নড়িয়া

উঠিল। তৎক্ষণাৎ নিমিকে সান্ত্বনা দান করিবার উদ্দেশ্যে তিনি (সূক্ষ্মদেহে) ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। নিমির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অত্রি বলিলেন—"বৎস তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। তুমি যাহা করিয়াছ, এইভাবে শ্রাদ্ধ করিবার বিধান স্মরণাতীতকালে স্বয়ং বিধাতা রচনা করিয়াছেন (মা তে ভূদ্ ভীঃ পূর্ব্বদৃষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং ব্রহ্মণা স্বয়ম্)। অতঃপর শ্রাদ্ধের যাবতীয় বিধান নিমির কাছে বলিয়া মহর্ষি অত্রি অন্তর্হিত হইলেন। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে এই সকল বিধান লিপিবদ্ধ আছে। বস্তুতঃ 'অত্রিসংহিতা' নামক অতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে শ্রাদ্ধের যে সকল বিধান রহিয়াছে, এখানেও ঠিক সেইরূপ বিধান দেখা যায়। হইবেই বা না কেন? 'অত্রিসংহিতার' রচয়িতা স্বয়ং অত্রিই তো নিমিকে কথাগুলি বলিয়াছেন।

উল্লিখিত ঘটনাটি বিবৃত করিয়া ভীষ্ম উপসংহারে বলিলেন—নিমি যেভাবে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে অন্যান্য ঋষিরাও তাহারই অনুকরণে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

"তথা নিমৌ প্রবৃত্তে তু সর্ব্বএব মহর্ষয়ঃ।
পিতৃযজ্ঞাংস্তু কুর্ব্বাণ্ড বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥"

—অনুশাসনপর্ব্ব (হরিদাসীয়) ৭৮।৪৬

উল্লিখিত প্রকার শ্রাদ্ধদ্বারা শুধু প্রেতাত্মাদের তৃপ্তিই হয় না, তাহাদের জীবদ্দশায় কৃত যাবতীয় পাপকার্য্যের ফলও ইহা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে মহাভারত স্পষ্ট ভাবায়ই বলিয়াছেন—

"প্রেতাস্তু পিণ্ডসম্বন্ধান্মুচ্যন্তে তেন কর্ম্মণা।"

—অনুশাসনপর্ব্ব (ঐ) ৭৮।৬১

যা৭।
পিতৃযজ্ঞে
সামগ্রীর ফ

দশম পরিচ্ছেদ

পিতৃগণ

হিন্দুমাত্রেই তর্পণকালে সপ্ত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন। মাতা, পিতা প্রভৃতির তর্পণের পূর্ব্বে, এমন কি যমতর্পণেরও পূর্ব্বে উল্লিখিত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে হয়। ইঁহারা দিব্যপিতৃগণ নামে বিখ্যাত। ইঁহাদের তর্পণের পূর্ব্বে করিতে হয় ঋষিতর্পণ। ঋষিতর্পণে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই ১০ জন ঋষির উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিতে হয়। সংখ্যায় যদিও ইঁহারা ১০ জন, তথাপি ইঁহারা 'সপ্তর্ষি' নামে পরিচিত। এই কারণেই ব্যাকরণ-শাস্ত্রে 'সপ্তর্ষি' পদটিকে নিত্যসমাস-রূপে গণনা করা হয়। যে সাপে কামড়াইলে মানুষ বাঁচে না, তাহার নাম কৃষ্ণসর্প (কৃষ্ণসর্পঃ স বিজ্ঞেয়ো যেন দষ্টো ন জীবতি)। বাংলায় আমরা ইহাকে বলি 'কালসাপ'। এই কৃষ্ণসর্প বা কালসাপের রং কিন্তু সকল সময়ে কাল নহে। কখনও সাদা, কখনও বা বিচিত্র বর্ণের কালসাপও দেখা যায়। চন্দ্রবোড়ার রং বিচিত্র এবং সাদা গোখরার রং দুধের মত সাদা; কিন্তু ইহারাও কৃষ্ণসর্প-পদবাচ্য, কারণ ইহারা কামড়াইলেও মানুষ বাঁচে না। এইভাবে, উল্লিখিত ১০ জন ঋষিও 'সপ্তর্ষি' নামে পরিচিত।

ঋষিতর্পণের পরে কেন দিব্যপিতৃ-তর্পণ করা হয়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্বভাবতঃই মনুসংহিতার একটা শ্লোক স্মৃতিপথে উদিত হয়। উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে—হিরণ্যগর্ভসম্ভূত মনুর মরীচি প্রভৃতি যে সকল পুত্র ছিলেন, তাঁহাদের পুত্রগণই 'পিতৃগণ' নামে পরিচিত।

"মনোর্হিরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ,
তেষামৃষীণাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ ॥"
—মনুসংহিতা ৩।১৯৪

মূলে আছে 'মরীচ্যাদয়ঃ' (মরীচি প্রভৃতি)। এই 'আদি' শব্দদ্বারা যে অত্রি প্রভৃতি অবশিষ্ট নয় জনের কথাই বলা হইয়াছে, তাহাও মনুসংহিতার অন্য একটি শ্লোক হইতে জানা যায়। উক্ত শ্লোক যথা :—

"মরীচিমত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ ॥"
—মনুসংহিতা ১।৩৫

অতএব দেখা যাইতেছে যে মরীচি প্রভৃতি ঋষিরা পিতৃগণের আদিপুরুষ। এই কারণেই পিতৃগণের তর্পণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের তর্পণ করার বিধান দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন পুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি—উল্লিখিত মরীচি প্রভৃতি ১০ জন ঋষি হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মনুষ্যাদি উন্নত শ্রেণীর প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে। মরীচির পুত্র কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাণে আছে—

"মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপাত্তু ইমাঃ প্রজাঃ।
প্রচক্রিরে মহাভাগা দক্ষকন্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥"

অর্থাৎ মরীচিপুত্র কশ্যপ দক্ষের ১৪টি কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাদের গর্ভে বিভিন্ন শ্রেণীর দেবতা প্রভৃতি প্রাণী সৃষ্টি করিযাছিলেন। মনু বলেন—মহর্ষি অত্রি হইতে বর্হিষদ্ নামক পিতৃগণের উৎপত্তি হয়। এই পিতৃগণ হইতেই দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, কিন্নর প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"দৈত্যদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
সুপর্ণকিন্নরাণাঞ্চ স্মৃতা বর্হিষদোঽত্রিজাঃ ॥"
—মনুসংহিতা ৩। ১৯৬

উল্লিখিত প্রকার বিভিন্ন বর্ণনা দেখিয়া বুঝা যায়—তর্পণকালে যে ৭টি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দান করা হয়, ইঁহারা শুধু মানুষেরই পূর্ব্বপুরুষ নহেন; ইঁহাদের মধ্যে অনেকে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস, পিশাচ, কিন্নর প্রভৃতিরও পূর্ব্ব পুরুষ। এই কারণেই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কার্য্য কেবলমাত্র মানুষেরই কর্ত্তব্য নহে, দেবতা, অসুর, সর্প, রাক্ষস, পিশাচ, কিন্নর প্রভৃতি সকলেরই ইহা কর্ত্তব্য। এই কারণেই যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে মহামতি ভীষ্ম বলিয়াছেন—

"দেবাসুরমনুষ্যাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
পিশাচ-কিন্নরাণাঞ্চ পূজ্যা বৈ পিতরঃ সদা ॥"
—অনুশাসনপর্ব্ব (হরিদাসীয়) ৭৬। ৪

মনু বলেন—ঋষিগণ হইতে পিতৃগণের উদ্ভব হইয়াছে; আর পিতৃগণ দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জগতে স্থাবর জঙ্গম, যাহা কিছু আছে, তাহাদের সকলেরই উৎপত্তি হইয়াছে দেবগণ হইতে। মনুর ভাষায়—

"ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবমানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ ॥" ৩। ২০১

অতএব পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে—মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি যে সকল মনুষ্যাদি প্রাণীর মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইঁহারা সকলেই পিতৃগণের অন্তর্ভুক্ত এবং হিন্দুরা শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবার সময় ইঁহাদের সকলের তৃপ্তির জন্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

যে কোন দেশে, যে কোন দ্বীপে, যে কোন পর্ব্বতে, এমন কি যে কোন গ্রহে যে সকল মনুষ্যাদি প্রাণীর মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাঁহারা বিশ্বাসীই হউন আর অবিশ্বাসীই হউন, যে কোন ধর্ম্মমত মানিয়া চলুন অথবা না চলুন, তাঁহাদের দেহ দাহ করা হউক, গোর দেওয়া হউক, বা জলে, নালায় বা পর্ব্বতাদির উপরে নিক্ষিপ্তই হউক—হিন্দু-সন্তানেরা জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ইঁহাদের সকলের উদ্দেশ্যেই জল ও পিণ্ড দান করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মণতর্পণ এবং রামতর্পণের মন্ত্র দুইটিও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। লক্ষ্মণতর্পণে বলা হইয়াছে—

"আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু"

অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণাদি উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত সকলের তৃপ্তি হউক। রাম-তর্পণে বলা হইয়াছে—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীত-কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥"

[ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় ভুবনে যে সকল দেবতা, পিতৃগণ বা মানব আছেন বা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পিতৃপদবাচ্য। এই সকল পিতৃগণের তৃপ্তি হউক। শুধু পিতৃগণেরই নহে, মাতৃগণের এবং মাতামহকুলগুলিতে বর্ত্তমান সকল জীবেরই তৃপ্তি হউক। সপ্তদ্বীপ-নিবাসিগণের কোটী কোটী বংশের যে সকল প্রাণী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং ত্রিভুবনে যত বিদেহী আছেন, আমার প্রদত্ত এই জলধারা তাঁহাদের সকলের তৃপ্তি হউক।]

যে সকল অর্ব্বাচীন লোক নিজেদের সর্ব্বজ্ঞ মনে করিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নিন্দায় মুখর এবং যে সকল দুষ্টবুদ্ধি লোক সনাতন সত্য ধর্ম্মের বিলোপ সাধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহারা চাহিয়া দেখুন—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কত উদার। এত উদারতা অন্য কোন ধর্ম্মে কেহ দেখাইতে পারিবেন কি?

উপরে যে সাতটি পিতৃগণের কথা বলা হইল, তাঁহাদের মধ্যে অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ্, সৌম্য এবং সোমপ নামক পিতৃগণ ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষ, হবির্ভুক্ নামক পিতৃগণ ক্ষত্রিয়দের পূর্ব্বপুরুষ, আজ্যপা নামক পিতৃগণ বৈশ্যদের পূর্ব্বপুরুষ এবং সুকালীন নামক পিতৃগণ শূদ্রজাতির পূর্ব্বপুরুষ। এই সম্বন্ধে মনুবচন যথা—

"অগ্নিদগ্ধানগ্নিদগ্ধান কাব্যান্ বর্হিষদস্তথা।
অগিষ্বাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব নির্দ্দিশেৎ॥" ৩। ১৯৯
"সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপা নাম শূদ্রাণাস্ত সুকালিনঃ॥" ৩। ১৯৭

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে—উল্লিখিত পিতৃগণের যে সকল নামেব উল্লেখ শাস্ত্র গ্রন্থসমূহে বহিয়াছে, ঐ সকল নামের কি কোন সার্থকতা আছে? এই সংশযের উত্তরও শাস্ত্রগ্রন্থেই পাওয়া যায। মনু বলিযাছেন—অগ্নিষ্বাত্ত নামক পিতৃগণ হোম দ্বাবা তৃপ্তিলাভ করেন, সোমপা নামক পিতৃগণ স্তুতিপাঠ শ্রবণে প্রীত হন, পিণ্ড দানেব ফলে প্রীত হন বর্হিষদ্ নামক পিতৃগণ, এবং অবশিষ্ট সকল শ্রেণীর পিতৃগণই দ্বিজাতি-ভোজনেব ফলে প্রীতি লাভ কবিযা থাকেন। মনুর ভাষায়—

"অগ্নিষ্বাত্তা হুতৈস্তৃপ্তাঃ সোমপাঃ স্তুতিভিস্তথা।
পিণ্ডৈর্ব্বর্হিষদঃ প্রীতাঃ প্রেতাস্তু দ্বিজভোজনে॥"

গরুডপুবাণের অন্তর্গত যে 'রুচিস্তোত্র'টি শ্রাদ্ধকালে পাঠ করা হয়, তাহাতে দেখি—চাবিদিক্ বক্ষা কবিবার জন্য চারিটি পৃথক্ শ্রেণীব পিতৃগণের নিকট প্রার্থনা করা হইযাছে। রুচিস্তোত্রের ভাষায—

'অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতৃগণাঃ প্রাচীং রক্ষন্তু মে দিশম্।
তথা বর্হিষদঃ পান্তু যাম্যাং মে পিতরঃ সদা॥
প্রতীচীমাজ্যপাস্তদ্বদুদীচীমপি সোমপাঃ॥"

ইহা দেখিয়া মনে হয়, যে সকল পিতৃগণ দেবত্বলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নিষ্বাত্ত' নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা যজ্ঞাগ্নিতে প্রদত্ত আহুতিদ্বারা ...রেন এবং দেবতাদের মতই পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয় করিযা থাকেন। যে সকল তাহাদের সকলেং ...লোকে বা পিতৃলোকে অদ্যাপি প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের ...হ পশ্চিম দিক্ এবং অন্যেরা উত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া বিরাজ করেন। ...র পিতৃগণ যথাক্রমে আজ্যপা এবং সোমপা নামে প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকালে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই তৃপ্তি কামনা করা হয়। প্রমাণ-স্বরূপ রুচিস্তোত্রের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মন্ত্রটির উল্লেখ করা যাইতে পারে ; যথা—

"অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা।
ব্রজন্তু তৃপ্তিং শ্রাদ্ধেঽস্মিন্ পিতরস্তর্পিতা ময়া॥"

কি তর্পণকালে, কি শ্রাদ্ধে, সর্ব্বত্রই উল্লিখিত সপ্ত পিতৃগণের প্রীতি কামনা করা হইয়া থাকে।

উল্লিখিত ৭টি পিতৃগণ ছাড়া আরও নানাভাবে নানা সংখ্যায় পিতৃগণের উল্লেখ দেখা যায়। রুচিস্তোত্রে উল্লিখিত সপ্ত পিতৃগণ ব্যতীত আরও ৩১টি পিতৃগণের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই বিপুলসংখ্যক পিতৃগণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ৪টি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৫টি, তৃতীয় শ্রেণীতে ৬টি, চতুর্থ শ্রেণীতে ৭টি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ৯টি গণ রহিয়াছে। চারিগণে বিভক্ত পিতৃগণের নাম যথা—(১) সুখদ (২) ধনদ (৩) ধর্ম্মদ, এবং (৪) ভূতিদ। অর্থাৎ ইঁহারা যথাক্রমে সুখ, ধন, ধর্ম্ম এবং যশঃ প্রভৃতি বিভূতি দান করেন। পাঁচগণে বিভক্ত পিতৃশ্রেণীর মধ্যে আছেন—(১) মহান্ (২) মহাত্মা (৩) মহিত (৪) মহিমাবান্ এবং (৫) মহাবল নামক পিতৃগণ। ইঁহারাও নিজ নিজ নামানুযায়ী ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ছয়গণে বিভক্ত পিতৃশ্রেণীতে আছেন—(১) কল্যাণ (২) কল্যদ (৩) কল্যতর (৪) কল্যতরাশ্রয় (৫) কল্যতাহেতু, এবং (৬) অনঘ নামক পিতৃগণ। সপ্তগণবিশিষ্ট পিতৃশ্রেণীতে আছেন—(১) বর (২) বরেণ্য (৩) বরদ (৪) তুষ্টিদ (৫) পুষ্টিদ (৬) বিশ্বপাতা, এবং (৭) ধাতা নামক পিতৃগণ। নবগণ-বিশিষ্ট পিতৃশ্রেণীটি গঠিত হইয়াছে—(১) বিশ্ব (২) বিশ্বভুক্ (৩) আরাধ্য (৪) ধর্ম্ম (৫) ধন্য (৬) শুভাসন (৭) ভূতিদ (৮) ভূতিকৃৎ, এবং (৯) ভূতি নামক পিতৃগণদ্বারা। উল্লিখিত প্রত্যেকটি পিতৃগণই নিজ নিজ নামানুযায়ী ফল দান করিয়া থাকেন। উল্লিখিত পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে পিতৃগণের মোট সংখ্যা ৩১। ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকটই মঙ্গল প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে রুচি-স্তোত্রের নিম্নলিখিত মন্ত্রটির উল্লেখ করা যাইতে পারে ; যথা—

"একত্রিংশৎ পিতৃগণা যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ।
তে মেঽত্র তৃপ্তাস্তুষ্যন্তু দিশন্তু চ সদা হিতম্॥"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—প্রথমে যে সাতটি পিতৃগণের কথা বলা হইয়াছে, শেষোক্ত ৩১ পিতৃগণ কি তাঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথবা তাঁহাদের চেয়ে পৃথক্?

মনুসংহিতার একটি শ্লোক দেখিয়া মনে হয়—সর্ব্বপ্রথম যাঁহারা পিতৃত্বলাভ করেন, তাঁহারাই প্রথম সাতটি গণের অন্তর্ভুক্ত, এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিরাই শেষোক্ত ৩১টি গণে বিভক্ত। ইঁহারা সংখ্যায় গণনাতীত এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়াই অবস্থিত আছেন। মনুসংহিতার উল্লিখিত শ্লোকটি যথা—

"য এতে তু গণা মুখ্যাঃ পিতৃণাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষামপীহ বিজ্ঞেয়ং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্॥" ৩ | ২০০

শাতাতপসংহিতাতে দ্বাদশ পিতৃগণের উল্লেখও রহিয়াছে। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষ পিণ্ডভাগী; অর্থাৎ কেবল পিণ্ডদানের ফলেই ইঁহাদের তৃপ্তি হয়। বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে উর্দ্ধ তিন পুরুষ শ্রাদ্ধে পিণ্ডের লেপমাত্রদ্বারা তৃপ্ত হন। তদূত্তর তিন পুরুষ নান্দীমুখ এবং তদূত্তর তিন পুরুষ অশ্রুমুখ। উক্ত দ্বাদশ পুরুষ তর্পণ এবং শ্রাদ্ধদ্বারা পরিতোষপ্রাপ্ত হইলে সন্তান প্রদান করেন। যদি যথাবিধি ইঁহাদের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ না করা হয়, তাহা হইলে ইঁহারা উত্তম গতিলাভে অসমর্থ হইয়া বিদ্বেষবশতঃ নিজ বংশধরদের সন্তান বিনাশ করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে শাতাতপসংহিতার বচন যথা—

"পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাজঃ স্যুস্ত্রয়ো লেপভুজস্তথা।
ততো নান্দীমুখাঃ প্রোক্তাস্ত্রয়োঽপ্যশ্রুমুখাস্ত্রয়ঃ॥
দ্বাদশৈতে পিতৃগণাস্তর্পিতাঃ সন্ততিপ্রদাঃ।
গতিহীনাঃ সুতাদীনাং সন্ততিং নাশয়ন্তি তে॥" ৬ | ৫ – ৬

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে যাঁহাদিগকে 'নান্দীমুখ' নামে আখ্যাত করা হয়, উল্লিখিত শাতাতপ-সংহিতার বচনে বর্ণিত 'নান্দীমুখ' সংজ্ঞক পিতৃগণ তাঁহাদের চেয়ে ভিন্ন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধ-মাহাত্ম্য

মৃত্যুর পর যে প্রাণীরা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, এই বিষয়ে বিভিন্ন ঘটনা আর্য্য-শাস্ত্রের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে। মহাভারতের পরিশিষ্ট 'খিল হরিবংশ' নামে খ্যাত। উক্ত গ্রন্থ হইতে এই বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

মহর্ষি কৌশিকের সাতটি পুত্র ছিল। তাহারা সকলেই মহর্ষি গার্গ্যের আশ্রমে থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। পিতার মৃত্যুর পর গৃহে ফিরিবার আশা তাহারা এক-প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিল; অথচ পড়াশোনার দিকেও তাহাদের মনোযোগ একেবারেই ছিল না। এই ছেলেগুলিকে দিয়া অন্য কোন কাজ হইবে না বুঝিয়া গুরু তাহাদিগকে গোচারণে নিযুক্ত করেন। সেই যুগে ভারতবর্ষে গোচারণভূমির অভাব ছিল না। গরু লইয়া সাত ভাই বিভিন্ন মাঠে বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা আশ্রম হইতে বহু দূরে এক বিশাল মাঠে উপস্থিত হইল। নিকটে কোন খাদ্যসামগ্রী পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আশে পাশে কোথাও একটা ফলের গাছও নাই যে ফল ভক্ষণ করিয়া রাখাল ছেলেরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে। আশ্রম হইতে যে খাদ্য লইয়া তাহারা বহির্গত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে দেখিয়াও মূর্খ ছেলেদের মাথায় এই বুদ্ধিটুকু আসে নাই যে শীঘ্রই তাহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হইবে।

ক্ষুধার জ্বালায় সাত ভাই অস্থির। গাভীগুলির বাঁটেও এমন দুধ নাই যে সাত ভাইএর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারে। অন্য আহার্য্যও কাছে নাই। এইরূপ অবস্থায় ছোট একটি ছেলে প্রস্তাব করিল—একটা গরু মারিয়া উহার মাংসদ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলে কেমন হয়? বড় তিনটি ভাইএর কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল। পবিত্র ভারত-ভূমিতে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়া যে কেহ গোহত্যা ও গোমাংস-ভক্ষণের কথা চিন্তা করিতে পারে, ইহা তাহারা ভাবিতেও পারে নাই; আর কি না তাহাদেরই একটি সহোদর এইরূপ জঘন্য প্রস্তাব করিল। বড় তিন ভাই একযোগে ছোট ভাইটিকে ধিক্কার দিতে লাগিল; কিন্তু ছোটদের মধ্যে অপর তিনটি ভাই কনিষ্ঠের প্রস্তাবে সায় দিয়া জিদ ধরিল যে আপাততঃ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পাপকার্য্যও

করা আবশ্যক। বাঁচিয়া থাকিলে পরে প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা পাপক্ষয় করা যাইতে পারিবে। অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতে তাহারা রাজী নহে। জ্যেষ্ঠ তিন ভাই কিছুটা শাস্ত্রও জানিত। তাহারা অনেক বুঝাইল, কিন্তু ছোট চারিটি ভাইকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না।

পিতার মৃত্যুর পর হইতে জ্যেষ্ঠ ভাইটি সর্ব্বদা শ্রাদ্ধ করিত। সে ভাবিল—গোবধ যখন হইবেই, এবং গোমাংস-ভক্ষণরূপ মহাপাতক হইতেও যখন কনিষ্ঠ-ভাইদিগকে নিবৃত্ত করা যাইবে না, তখন এমন একটি কার্য্য করা যাক্, যাহার ফলে পাপের লাঘব হইবে এবং পিতৃলোকের কিছুটা অনুগ্রহ পাওয়ারও আশা করা যাইতে পারিবে। তখন সে বলিল—"ভাই সব! তোমরা যখন গোবধ এবং গোমাংস-ভক্ষণরূপ মহাপাতক করিয়াও প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছুক, তখন যে গরুটিকে বধ করিতে চাও, পূর্ব্বে তাহাকে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে নিবেদন কর। আমি শ্রাদ্ধের মন্ত্র জানি, ঐসকল মন্ত্র পাঠ করিয়া গরুটিকে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতে পারিব। অতঃপর পিতৃলোকের প্রসাদজ্ঞানে উহার মাংস ভক্ষণ করিলে আমাদের পাপ কিছুটা কম হইবে।"

অন্য ভাইয়েরা দেখিল—তাহাদের প্রাণ বাঁচাইবার পথে কোন বিঘ্ন থাকিতেছে না, সুতরাং তাহারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। জ্যেষ্ঠ ভাইটি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক একটি গরুকে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিল। অন্যেরা উহাকে হত্যা করিল, এবং সকলে মিলিয়া সেই নিবেদিত গরুর মাংস ভক্ষণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। ইহার পরেই তাহারা স্থির করিল যে আর বিলম্ব না করিয়া গৃহে ফিরিতে হইবে, অন্যথা প্রাণরক্ষার জন্য পুনরায় মহাপাপ করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। তখন তাড়াতাড়ি সকলে আশ্রমে ফিরিল এবং গুরুকে বলিল—তাঁহার গরুটিকে বাঘে মারিয়াছে।

উল্লিখিত ঘটনাটি হইতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে প্রাচীনকালেও ভারতে গোবধ এবং গোমাংসভক্ষণ মহাপাপরূপেই বিবেচিত হইত। অন্যায়কার্য্য কিছু-সংখ্যক লোক সকল যুগেই করিয়া থাকে। আজও দেশে চুরি, ডাকাতি, নারীহরণ, নরহত্যা প্রভৃতি দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান কিছুসংখ্যক লোকে করিতেছে এবং তাহার ফলে শাস্তিও পাইতেছে। হরিবংশে স্পষ্ট ভাষারই লিখিত আছে—ক্ষুধার্ত্ত বালকেরা মোহগ্রস্ত হইয়া নির্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ জঘন্যতম পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গোহত্যার চিন্তামাত্রই যে মহাপাপ, তাহাও হরিবংশের রচয়িতা স্পষ্টভাষায়ই

বলিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই প্রসঙ্গে হরিবংশের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা—

"তেষাং পথি ক্ষুধার্ত্তানাং বাল্যান্মোহাচ্চ ভারত !
ক্রূরা বুদ্ধিঃ সমভবত্তাং গাং বৈ হিংসিতুন্তদা ॥"

—হরিবংশপর্ব্ব ২১৷৮

এই প্রসঙ্গে শ্রাদ্ধের মাহাত্ম্যও স্মরণীয়। গুরুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানের ফলে মৃত্যুর পর উল্লিখিত সাত ভাই নরকে পতিত হইল এবং দীর্ঘকাল নরকভোগান্তে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিল। পাপকার্য্য অনুষ্ঠানের সময়েও তাহারা পিতৃ-লোকের শ্রাদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া সেই পুণ্যবলে মনুষ্যযোনিতে জন্মলাভ করিল ; কিন্তু পূর্ব্বজন্মে ব্যাধের চেয়েও হিংস্র এবং জঘন্য কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া তাহারা ব্যাধযোনিতে জন্মিল। পূর্ব্বজন্মকৃত শ্রাদ্ধরূপ সৎকার্য্যের ফলে পিতৃলোকের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ব্যাধজন্মেও উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-তনয়েরা জাতিস্মর হইল। ফলে পূর্ব্বজন্মকৃত কুকর্ম্ম ও তাহার ফল স্মরণ করিতে পারিয়া ব্যাধজন্মে তাহারা পরম ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল। ব্যাধবৃত্তি তো দূরের কথা, কাহাকেও একটি কুবাক্য পর্য্যন্ত তাহারা কখনও বলিত না। সকল সময়েই ভগবচ্চিন্তায় নিরত থাকিত।

এইভাবে ব্যাধজন্ম কাটাইয়া সাত ভাই দেহত্যাগ করতঃ হরিণরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিল। পিতৃলোকের আশীর্ব্বাদে এই জন্মেও তাহারা জাতিস্মর হইল। ব্যাধরূপে তাহারা জন্মিয়াছিল দশার্ণদেশে ; আর হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করিল কালঞ্জর পর্ব্বতে। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগরূক থাকায় হরিণজন্মেও তাহারা কদাপি কাহারও শস্যাদি নষ্ট করিত না ; এমন কি বৃক্ষ হইতে যে সকল জীর্ণপত্র স্বভাবতঃ নীচে ঝরিয়া পড়িত, তাহা ছাড়া অন্য কোন বৃক্ষপত্র বা তৃণাদিও তাহারা ভক্ষণ করিত না। মনে মনে সকল সময়েই ভগবান্‌কে স্মরণ করিত। এইভাবে হরিণজন্ম কাটাইয়া তাহারা শরদ্বীপে চক্রবাক-পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিল এবং জাতিস্মরত্ব লাভ করতঃ ধার্ম্মিক মুনিদের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া দেহত্যাগান্তে মানস-সরোবরে হংসরূপে পুনরায় জন্মিল। এই জন্মেও তাহারা জাতিস্মর হইল এবং ভগবচ্চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়া পরবর্ত্তী জন্মে পুনরায় দুর্লভ ব্রাহ্মণ ও রাজন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইল। হংসজন্মে সামান্য ত্রুটির ফলে এক ভ্রাতা রাজার ঘরে এবং অন্য দুই ভ্রাতা মন্ত্রীর ঘরে জন্মিল এবং পূর্ব্বজন্ম-সমূহের স্মৃতি

ভুলিয়া গেল। অবশিষ্ট চারি ভ্রাতা হংসজন্মেও সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ থাকায় সুপবিত্র কুরুক্ষেত্র জনপদে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়া জাতিস্মর হইল।

পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবার ফলেই যে তাহারা পিতৃগণের অনুগ্রহে পরবর্ত্তী বিভিন্ন জন্মে জাতিস্মরত্ব লাভে সমর্থ হয়, 'হরিবংশ' গ্রন্থে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের উক্তিরূপে তাহা স্পষ্ট ভাষায়ই লিপিবদ্ধ আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত কবিতেছি, যথা —

"তেষাং পিতৃপ্রসাদেন পূর্ব্বজাতিকৃতেন বৈ।
স্মৃতিরুৎপৎস্যতে প্রাপ্য তাং তাং জাতিং জুগুপ্সিতাম্ ॥"

—হরিবংশপর্ব্ব ১৯।৬

হরিবংশের মুদ্রিত পুস্তকে লিখিত আছে—সাত ভাইই প্রথম জন্মে ব্যাধ, দ্বিতীয় জন্মে হরিণ, তৃতীয় জন্মে চক্রবাক এবং চতুর্থ জন্মে হংসদেহ ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু পঞ্চম জন্মে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয় কাম্পিল্য নগরীব বাজা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভ্রাতা হয় তাঁহাব মন্ত্রী। অবশিষ্ট চারি ভ্রাতা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এবং পরে ঘটনাচক্রে সাত ভাইএবই মিলন ঘটে।

শ্রাদ্ধকালে ভোজনপাত্রে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্ন স্থাপন করিয়া তাঁহাদেব মনোরঞ্জনের জন্য বেদমন্ত্র ও শ্রাদ্ধের মাহাত্ম্য ইত্যাদি পাঠ করিবার বিধান আছে। এই সময়ে শ্রাদ্ধের মাহাত্ম্যরূপে যে কয়টি শ্লোক পাঠ করা হয়, তাহাতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণতনয়গণের পাঁচটি জন্মে ব্যাধাদিদেহধারণের উল্লেখ আছে। যাঁহারা শ্রাদ্ধ করেন বা শ্রাদ্ধকালে তথায় উপস্থিত থাকেন, এই সকল মন্ত্র তাঁহাদের খুবই পরিচিত। মন্ত্রগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে ॥
তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ন্তেভ্যোঽবসীদত ॥"

উল্লিখিত ঘটনাগুলি স্পষ্টই প্রমাণ করিতেছে যে শ্রাদ্ধ কখনও নিষ্ফল হয় না।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় আর্য্যসমাজে মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি ও মুক্তিকামনায় শ্রাদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রাদ্ধের বিধান এবং এতৎসংক্রান্ত বিবিধ তত্ত্ব লিপিবদ্ধ দেখা যায়। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে শ্রাদ্ধ করিলে শুধু মৃতব্যক্তির তৃপ্তি এবং মুক্তিই হয় না, শ্রাদ্ধকারী

ব্যক্তি নিজেও নানাভাবে উপকৃত হইয়া থাকেন। পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধকারী বংশধরটিকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং তাহার ফলে সেই বংশধর পুত্রসন্তান লাভ করিয়া বংশরক্ষায় সমর্থ হন। মনুষ্যসমাজে সকলেই অন্ততঃ একটি পুত্রলাভ করিতে চায়। একাধিক পুত্রও অনেকেরই কাম্য। পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে তাহারই ফলে মানুষের এই অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে। শুধু মাতাপিতাই নহেন, দ্বাদশ পিতৃগণই সন্তুষ্ট হইলে পুত্রবর প্রদান করিয়া থাকেন।

পিতৃগণ জীবদ্দশায় যাহাই করুন না কেন, এবং যেভাবেই তাঁহাদের মৃত্যু হউক না কেন, যথাবিধি শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিলে ইঁহাদের সদ্গতিলাভ হইয়া থাকে। যদি যথাবিধি ইঁহাদের শ্রাদ্ধ না করা হয়, তবে ইঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিতে বাধ্য হন এবং ফলে ইঁহাদের অনেকেই সদ্গতিলাভ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। এইভাবে সদ্গতিলাভে অসমর্থ পিতৃপুরুষেরা নিজ বংশধরগণের প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করেন, এবং তাহাদের সন্তান বিনাশ করতঃ তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করিয়া দেন। উদ্দেশ্য এই—আমার যখন সদ্গতিলাভ হইল না, তখন যাহার দোষে আমার এই দুর্ভোগ, সেও যেন সদ্গতিলাভ করিতে না পারে। ইঁহারা নিজের জীবিত বংশধরদিগকে নির্ব্বংশ করেন এবং ফলে তাহাদেরও শ্রাদ্ধ করিবার মত উত্তরাধিকারী না থাকায় তাহারাও সদ্গতিলাভে অসমর্থ হইয়া থাকে। মহর্ষি শাতাতপ বলেন—

"গতিহীনাঃ সুতাদীনাং সন্ততিং নাশয়ন্তি তে।" ৬।৬

শাতাতপসংহিতাতে উল্লিখিত-প্রকার গতিহীন ও সন্তাননাশক পিতৃগণকে ৩৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে; যথা—

১। অশ্বের ক্ষুরাঘাতে বা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া যাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

২। যিনি শূকরকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন।

৩। মহিষ, বৃষ প্রভৃতির শৃঙ্গাঘাতে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৪। পর্ব্বতের উপর হইতে পতিত হইয়া যিনি মরিয়াছেন।

৫। বৃক্ষপতনে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৬। গাড়ীর চাকায় পিষ্ট হইয়া যিনি মরিয়াছেন।

৭। গিরিশৃঙ্গ বা উচ্চস্থান হইতে স্বেচ্ছায় পতিত হইয়া যিনি মরিয়াছেন।

৮। অগ্নিদগ্ধ হইয়া যিনি মরিয়াছেন।

৯। কাষ্ঠদণ্ডাদির আঘাতে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

১০। শস্ত্রাঘাতে (বা অস্ত্রাঘাতে) যাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

১১। প্রস্তরের আঘাতে যিনি মরিয়াছেন।

১২। বিষ-ভক্ষণে (স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়) যাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

১৩। যিনি উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করিয়াছেন (স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়)।

১৪। ব্যাঘ্র প্রভৃতি নরঘাতক জন্তু যাঁহাকে হত্যা করিয়াছে।

১৫। যিনি সর্পদংশনে বা অজগরকর্তৃক ভক্ষিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

১৬। হস্তিপদতলে পিষ্ট হইয়া বা হস্তীর দন্তাঘাতে যাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

১৭। রাজদণ্ড লাভ করিয়া যিনি মরিয়াছেন।

১৮। দস্যুহস্তে যিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

১৯। শত্রুকর্তৃক যিনি নিহত হইয়াছেন।

২০। চিতা বা নেকড়ের আক্রমণে যিনি মারা গিয়াছেন।

২১। গাছের গুঁড়ি প্রভৃতির চাপায় যিনি মরিয়াছেন।

২২। শূল প্রভৃতি অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া যিনি মারা গিয়াছেন।

২৩। যিনি জীবদ্দশায় শৌচের বিধি মানিয়া চলিতেন না।

২৪। জীবদ্দশায় বৈদিক সংস্কার অথবা মৃত্যুর পর দাহাদি সংস্কার যাঁহার হয় নাই।

২৫। বিসূচিকারোগে যাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

২৬। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে যিনি মারা গিয়াছেন।

২৭। একসঙ্গে বেশী খাইতে গিয়া গলায় শক্ত খাদ্য (মাংসাদি) আট্‌কাইয়া যিনি মরিতে বাধ্য হইয়াছেন।

২৮। দাবানলে দগ্ধ হইয়া যিনি মরিয়াছেন।

২৯। অতিসার (রক্তাতিসার ?) রোগে যাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

৩০। সাকিনী প্রভৃতি উপগ্রহগণের পাল্লায় পড়িয়া যিনি নিহত হইয়াছেন।

৩১। বজ্রাঘাতে যাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

৩২। যাঁহারা পাপকার্য্য করার ফলে অস্পৃশ্যত্ব লাভ করিয়া সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

৩৩। জীবদ্দশায় শাস্ত্রবিধি না মানিয়া যাঁহারা অপবিত্র হইয়াছিলেন।

৩৪। পাপকার্য্যের ফলে পাতিত্য লাভ করিয়া সেই অবস্থায় যাঁহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন ; এবং

৩৫। যাঁহারা নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে শাতাতপসংহিতার বচন যথা :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
"অশ্ব-শূকর-শৃঙ্গাদ্রি-দ্রুমাদি-শকটেন চ।

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
ভৃগ্বগ্নি-দারু-শস্ত্রাশ্ম-বিষোদ্বন্ধনজৈর্ম্মৃতাঃ॥

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
ব্যাঘ্রাহি-গজ-ভূপাল-চৌর-বৈরি-বৃকাহতাঃ।

২১ ২২ ২৩ ২৪
কাষ্ঠ-শল্যমৃতা যে চ শৌচ-সংস্কার-বর্জ্জিতাঃ॥

২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯
বিসূচিকান্নকবল-দবাতীসারতো মৃতাঃ।

৩০ ৩১
সাকিন্যাদিগ্রহৈর্গ্রস্তা বিদ্যুৎপাতহতাশ্চ যে॥

৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫
অস্পৃশ্যা অপবিত্রাশ্চ পতিতাঃ পুত্রবর্জ্জিতাঃ।
পঞ্চত্রিংশৎপ্রকারৈশ্চ নাপ্নুবন্তি গতিং মৃতাঃ॥" ৬।১-৪

উল্লিখিত ৩৫ প্রকার পিতৃগণের মধ্যে ১০ প্রকার পিতৃগণ ক্রমশঃ প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি মাসে গর্ভস্থ সন্তানের বিনাশ ঘটাইয়া থাকেন। ব্যাঘ্রাদিদ্বারা নিহত পিতৃগণ প্রথম মাসে, সর্পদষ্ট পিতৃগণ দ্বিতীয় মাসে, হস্তিকর্ত্তৃক নিহত পিতৃগণ তৃতীয় মাসে, রাজদণ্ডে মৃত পিতৃগণ চতুর্থ মাসে, দস্যুহস্তে নিহত পিতৃগণ পঞ্চম মাসে, শত্রুকর্ত্তৃক নিহত পিতৃগণ ষষ্ঠ মাসে, চিতা বা নেকড়ের আক্রমণে নিহত পিতৃগণ সপ্তম মাসে, গাছের গুঁড়ি প্রভৃতির চাপায় মৃত পিতৃগণ অষ্টম মাসে, শূলাদিবিদ্ধ পিতৃগণ নবম মাসে এবং জীবদ্দশায় অশুচি পিতৃগণ দশম মাসে গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট করেন।

উপরের তালিকাস্থিত দশম হইতে ২১ শ সংখ্যক মোট দ্বাদশটি পিতৃগণ অকালে গর্ভপাত ঘটাইয়া থাকেন। বিষ ভক্ষণাদির ফলে যাঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাদৃশ পিতৃগণ কখনও দশম পুরুষ, কখনও বা দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত নিজ বংশধরদের পুত্রসন্তানগুলিকে বিনাশ করিয়া থাকেন। এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুগুলিকে বিনাশ করিবার সামর্থ্য ইঁহারা রাখেন; তাহার পর শিশুরা ইঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। যে সকল পিতৃপুরুষ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়াছেন, তাঁহারা

সর্ব্বাবস্থায় নিজ জ্ঞাতিদিগকে নিঃসন্তান রাখিতে চেষ্টা করেন। এই সম্বন্ধে শাতাতপ-সংহিতার কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"দশ ব্যাঘ্রাদিনিহতা গর্ভং বিঘ্নন্ত্যমী ক্রমাৎ।
দ্বাদশাস্ত্রাদিনিহতা আকর্ষন্তি চ বালকম্॥
বিষাদিনিহতা ঘ্নন্তি দশসু দ্বাদশস্বপি।
বর্ষৈকবালকং কুর্য্যাদনপত্যোঽনপত্যতাম্॥" ৬ | ৭-৮

গয়াশ্রাদ্ধ এবং পার্ব্বণাদিশ্রাদ্ধের ফলে উল্লিখিত পিতৃগণের মুক্তি ঘটে। সাধারণ-ভাবে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলেও ইঁহারা উন্নততর গতিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাদৃশ অবস্থায় ইঁহারা আর জ্ঞাতি বা বংশধরদের অনিষ্ট করিতে চান না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বংশরক্ষার জন্য পিতৃপুরুষের পুনর্জ্জন্মগ্রহণ

শুক্লযজুর্ব্বেদ বলেন—শ্রাদ্ধাদিকার্য্যদ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিবিধান করিলে তাঁহারা সুন্দর পুত্রসন্তানরূপে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পত্নীর গর্ভে আবির্ভূত হন এবং যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া বংশধারা রক্ষা করেন।

"আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজম্।
যথেহ পুরুষোঽহসৎ।"

—বাজসনেয়ীসংহিতা, অধ্যায়—২, কণ্ডিকা—৩৩

বেদশাস্ত্রে যাঁহাদের গভীর বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের বুঝিবার পক্ষে উল্লিখিত শ্রুতি-বাক্যটিই যথেষ্ট। যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্রের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন না, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য অন্যপ্রকার প্রমাণ প্রদর্শন করাও প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—কোন কোন শাস্ত্রবিশ্বাসী লোক নিজের পুত্রকে বিবাহের দীর্ঘকাল পরেও নিঃসন্তান থাকিতে দেখিয়া এবং পুত্র ও পুত্রবধূর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত চিকিৎসা প্রভৃতি করাইয়া অবশেষে পুত্রবধূকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, মৃত্যুর পর তিনি নিজেই পুনরায় তাঁহার পুত্রবধূর গর্ভে পুত্রসন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর দুই বৎসর মধ্যেই তাঁহার সেই পুত্রবধূ সুন্দর পুত্রসন্তান লাভ করতঃ পরলোকগত শ্বশুরের উল্লিখিত আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হন। এই সম্বন্ধে আমার পরমারাধ্যা ৺মাতৃদেবীর মুখে যে ঘটনাটি শুনিয়াছি, সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

৺মাতৃদেবীর মুখে শ্রুত ঘটনাটি বিবৃত করিবার পূর্ব্বে ঘটনাস্থল ও তাহার নায়কের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস একটু বলা আবশ্যক মনে করি। শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগ জুড়িয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা সুবিদ্নারায়ণের রাজত্ব ছিল। তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল 'ইটা'। দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার না করায় এই হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে দিল্লী হইতে বিপুল মোগলবাহিনী প্রেরিত হয়। বীর রাজা সুবিদ্নারায়ণ প্রাণপণ শক্তিতে আক্রমণকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না। সম্মুখযুদ্ধে শত্রুপক্ষের একটি বুলেটের আঘাতে বিদ্ধ হইয়া তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূপাতিত হন এবং তাঁহার সৈন্যেরা মোগল আক্রমণের

বেগ সহ্য করিতে না পারিযা এবং রাজার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া গুরুতর আহত রাজ-দেহটিকে রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিযাই পলায়ন করে। এইভাবে রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ মোগলদের হাতে বন্দী হইযাছিলেন। দুঃখের বিষয়, শেষপর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠা ও ক্ষত্রিযোচিত বীরধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ কঃতঃ পুনবায় নিজ রাজ্যের অধীশ্বর হন। তখন হইতে ইনি এবং ইঁহার বংশধরেবা ‘দেওয়ান উপাধি ধারণ করতঃ দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধিরূপে ইটারাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

যুদ্ধে পরাজযেব পর রাজা সুবিদ্‌নাবাযণের ভ্রাতুষ্পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়েরা হতাবশিষ্ট সৈন্যসহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং নিজেদের আত্মীস্বজন, স্ত্রীপুত্র, স্বর্ণ, বস্ত্র প্রভৃতি যথাসম্ভব সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে উত্তরদিকে পলাযন করিতে থাকেন। তখন বর্ষাকাল, সুতবাং নৌকা ছাড়া পলাযন কবা সহজসাধ্য হইত না। উত্তবদিকে অনেক দূর অগ্রসব হওয়ার পব তাঁহাবা নির্জ্জন, বিস্তীর্ণ বনভূমিব মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই বনের ভিতর দিয়া তখন একটি বিশাল নদী প্রবাহিত হইত। এই নদীপথেই রাজবংশীয লোকেরা বনভূমিব অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে গুপ্তচরেব মুখে তাঁহাবা সংবাদ পাইলেন যে, মোগল সৈন্যেরা চারিদিকে তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বেডাইতেছে। বেগতিক দেখিযা তাঁহারা এই বনভূমিতেই আপাততঃ বাস করিবেন বলিযা স্থিব করিলেন। সঙ্গে তণ্ডুল প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী যাহা আনিযাছিলেন, তাহাতে অনেকদিন চলিল।

হেমন্তকালে তাঁহারা লক্ষ্য কবিলেন—বনভূমির মধ্যে এমন এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল রহিয়াছে, সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই যাহাতে প্রচুর ধান্যাদি শস্য উৎপাদন করা সম্ভব। তখন সৈনিকেরা কৃষিকায্য আবম্ভ কবিলেন এবং রাজবংশীয় লোকেরা তাহাদেব নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র সর্ব্বপ্রথম যেখানে বসতি স্থাপন কবেন, তথায় একটি নালা কাটিযা উহার মৃত্তিকাদ্বারা গৃহ-নির্ম্মাণের স্থানগুলিকে উচ্চভূমিতে পরিণত করা হইযাছিল। শ্রীহট্টের কথ্য ভাষায় নালাকে বলে ‘জুবি’, এই কারণে তাঁহাদের বাসস্থানের নাম হয় কালীজুরি। রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রেব নাম কালীকুমার কি কালীচরণ ঐ রকম একটা কি ছিল, এবং তাঁহার নামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়াই গ্রামের উল্লিখিত নাম রাখা হয়। তখন হইতে কালী-জুরিতে নূতন জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং কালক্রমে তাঁহাদের বংশধরেরা কেহ মৌজপুর গ্রামে, কেহ বা দণ্ডপাণিপুর গ্রামে গিয়া জমিদারীর অংশ গ্রহণপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। রাজবংশীয় লোকেরা তখন হইতে চৌধুরী উপাধি ধারণ করেন।

ব্রাহ্মণোচিত শর্ম্মা উপাধিটিও তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের পুরাতন দলিলেও নামের সঙ্গে 'শর্ম্মা চৌধুরী' এইরূপ উপাধি দেখা যায়।

কালীজুরি গ্রামের জমিদারী কালক্রমে বিনষ্ট হয় এবং বিশাল তড়াগের তীরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর জমিদারদের স্থাপিত বাড়ীতে পুরাতন দালানের ধ্বংসাবশেষের উপর ছনবাঁশদ্বারা কাচা ঘর তৈরী করিয়া তাঁহাদের উত্তরাধিকারী ৺রাধাগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী বাস করিতে থাকেন। এই ৺রাধাগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরীই বর্ত্তমান ঘটনাটির নায়ক। ইনি ছিলেন আমার মাতামহ। ইহারই স্নেহের তনয়া স্বর্গগতা জননীর মুখে নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনিয়াছি।

৺রাধাগোবিন্দ চৌধুরীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যা আমার স্বর্গগতা জননী। আমার ছোট মাতুল শ্রীকৃষ্ণকুমার শর্ম্মা চৌধুরী এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি মোক্তারী করিতেন। বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্রদের সহিত শিলচর সহরে (কাছাড় জেলায়) বাস করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অধুনা স্বর্গত রামকুমার শর্ম্মা চৌধুরীকে নিঃসন্তান দেখিয়া ৺রাধাগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী বংশরক্ষার জন্য পুত্রবধূকে ঔষধ, কবচ প্রভৃতি প্রয়োগ করেন। কিন্তু কিছুতেই ফল হয় না। অবশেষে মৃত্যুশয্যায় শায়িত চৌধুরী মহাশয় তাঁহার রোদন-পরায়ণা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "নাতির মুখ দেখিয়া মরিতে পারিলাম না বলিয়া একটা দুঃখ রহিল। তুমি কোন চিন্তা করিও না মা! মৃত্যুর পর আমিই তোমার পুত্ররূপে জন্মিয়া বংশরক্ষা করিব।" এইরূপ মন্তব্য করিবার অল্পক্ষণ পরেই চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু ঘটে। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কিন্তু সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিলেন যে, চৌধুরী মহাশয়ের দেহত্যাগের ২ বৎসর মধ্যেই তাঁহার পুত্রবধূ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। আমার পরমারাধ্যা ৺মাতৃদেবী তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং স্বকর্ণে তাঁহার পিতার মন্তব্যটি শুনিয়াছিলেন; আর ২ বৎসর মধ্যে মাতুলপুত্রের জন্ম তো সর্ব্বজনসুবিদিত ঘটনা। আমার মাতৃদেবী বিশ্বাস করিতেন এবং আমিও বিশ্বাস করি—৺রাধাগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরীর আত্মাই বংশ রক্ষার জন্য পুনরায় তাঁহার পুত্রবধূর গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর সর্ব্বানন্দও পূর্ব্বজন্মে তাঁহার ঠাকুর্দ্দা ছিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরকৃত শ্রাদ্ধের ফল

সাধারণতঃ পুত্রই পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। নিঃসন্তান ব্যক্তির পত্নী তাঁহার শ্রাদ্ধ করার অধিকারিণী। অপুত্রক ব্যক্তির কন্যা বা দৌহিত্র তাঁহার শ্রাদ্ধ করেন। পিতার জীবদ্দশায় একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ঘটিলে পৌত্র প্রভৃতি শ্রাদ্ধকার্য্যের অধিকারী হন। পুত্র, পত্নী, পৌত্র, দৌহিত্র, কন্যা প্রভৃতির অবর্ত্তমানে যে কোন জ্ঞাতি তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। জ্ঞাতির অবর্ত্তমানে যে কোন স্বজাতি শ্রাদ্ধ করিলেও প্রেতের মুক্তিলাভ হয়। যে ব্যক্তির মৃত্যুর পর কোন স্বজাতি তাহার শ্রাদ্ধ করে না, সে স্বভাবতঃই প্রেতত্ব লাভ করিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। যে কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল পরেও এবম্বিধ কোন প্রেতের মুক্তির জন্য শ্রাদ্ধ বা গয়াপিণ্ড দান করেন, তাহা হইলেও উক্ত প্রেত তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। এই সম্বন্ধে বহু তথ্য শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে রহিয়াছে এবং বহু জ্ঞানবান্ ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও এই প্রকার শ্রাদ্ধ বা গয়াপিণ্ড দানের সুফল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। কিভাবে নামগোত্রাদি না জানিয়াও জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি-কর্ত্তৃক রচিত "মদ্বাট্যাশ্চোত্তবে ভাগে " ইত্যাদি মন্ত্রে গয়াপিণ্ড দান করিয়া জনৈক ভদ্রলোক প্রেতের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা পূর্ব্ববর্ত্তী একটি পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।

ভিন্নবর্ণের ব্যক্তিও যদি কোন প্রেতত্বপ্রাপ্ত মানবের আত্মার মুক্তির জন্য নিজ গৃহে থাকিয়াও শ্রাদ্ধ করেন, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তির মুক্তিলাভ হয়। এই সম্বন্ধে একটি ঘটনার বিবরণ গরুড়পুরাণে বিবৃত হইয়াছে। এই ঘটনাটি স্বয়ং শ্রীভগবান্ ভক্ত বাহন গরুড়ের কাছে বিবৃত করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য গরুড়পুরাণের সপ্তম অধ্যায় (উত্তর খণ্ড) হইতে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

ত্রেতাযুগে বভ্রুবাহন নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল মহোদয়পুর। এই রাজা প্রভূত সামরিক শক্তির অধিকারী হইয়াও কদাপি অন্যের পীড়া উৎপাদন করিতেন না এবং সর্ব্বদা যজ্ঞ, দান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যে ব্রতী থাকিতেন। সদাচার, সচ্চরিত্রতা, দয়া প্রভৃতি সদ্গুণের জন্য এই রাজার প্রভূত

খ্যাতি ছিল। স্বভাবতঃ দয়ালু হইলেও অপরাধীদিগকে দণ্ড দান করিবার কালে ইনি কঠোর বা নিষ্ঠুর হইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। এক সময়ে রাজা বভ্রুবাহন মৃগয়া করিবার জন্য সৈন্যদলসহ বনে গমন করেন। শিকারের সন্ধানে গভীর বনে প্রবেশ করিয়া রাজা একটি হরিণকে বাণবিদ্ধ করিলেন। আহত হরিণটিকে খুঁজিতে খুঁজিতে রাজা ক্রমে সেই বন ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী অন্য একটি বনে প্রবেশ করিলেন। হরিণটি যে পথে গিয়াছিল, তাহাতে স্থানে স্থানে রক্তের দাগ লাগিয়াছিল, এবং ঐ চিহ্নগুলি দেখিয়াই রাজা বনান্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ পথভ্রমণের ফলে রাজার অত্যধিক ক্লান্তিবোধ হইল এবং তিনি দারুণ পিপাসা অনুভব করিতে লাগিলেন। সৈন্যেরা বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা তখন সময়-সাপেক্ষ। নিকটেই একটি স্বচ্ছ সরোবর দেখিয়া রাজা উহাতে নামিয়া অবগাহন করিলেন, এবং আকণ্ঠ জল পান করিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। মাথার উপর দ্বিপ্রহরের সূর্য্য যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। নিকটেই একটি ছায়াবহুল ন্যগ্রোধবৃক্ষ দেখিয়া রাজা তাহার নীচে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ঐ ন্যগ্রোধবৃক্ষে একটি কদাকার প্রেত বাস করিত। তাহার কেশগুলি ছিল ঊর্দ্ধমুখ এবং দেহ ছিল মলিন, কুব্জ ও মাংসহীন। সকল সময়েই এই প্রেত ক্ষুধাতৃষ্ণায় দারুণ ক্লেশ অনুভব করিত। এই ঘোর বনে কোন মানুষ আসিত না। এক সৌম্যদর্শন পুরুষকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া প্রেতের মনে কৌতুহল জন্মিল, এবং এই ব্যক্তিদ্বারা তাহার মুক্তিলাভের উপায় হইতে পারে ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে রাজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজাকে সম্বোধন করিয়া প্রেত বলিল—"হে মহাত্মন্! আপনার সাক্ষাৎ লাভ করায় আমার মনে হইতেছে, এতদিনে বোধ হয় আমার প্রেতত্ব মুক্তির উপায় ঘটিল।"

রাজা জানিতে চাহিলেন—কি কারণে লোকটি এই ভয়ঙ্কর-আকৃতি-বিশিষ্ট প্রেতত্ব লাভ করিয়াছে এবং জীবদ্দশায় তাহার পরিচয়ই বা কি ছিল। রাজার প্রশ্নের উত্তরে প্রেত তাহার মনুষ্য-জন্মের পরিচয় এবং প্রেতত্ব-লাভের হেতু সবিস্তারে বর্ণনা করিল। বিদিশা-নগরে এক সম্ভ্রান্ত বৈশ্যের গৃহে জন্মলাভ করিয়া সে মনুষ্যদেহে বহু পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। তাহার নাম ছিল সুদেব। ভাগ্যদোষে সে নিঃসন্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয়। তখন তাহার পত্নীও জীবিত ছিল না, এবং অন্য কোন আত্মীয় বা জ্ঞাতিও তাহার শ্রাদ্ধ করে নাই। এইভাবে জীবদ্দশায়

যথেষ্ট পুণ্যকার্য্য করা সত্বেও একমাত্র শ্রাদ্ধ না হওয়ার ফলে ধনবান্ বৈশ্য স্থদেব এই ঘোরাকৃতি প্রেতের রূপ প্রাপ্ত হইয়া দিবারাত্রি ক্ষুৎপিপাসায় অসহ্য ক্লেশ অনুভব করিতেছে। এইভাবে নিজের পরিচয় দিয়া প্রেত রাজাকে অনুরোধ করিল যে, তিনি যেন দয়াপরবশ হইয়া তাহার শ্রাদ্ধ করেন; কারণ, তাহার মুক্তিলাভের ইহাই একমাত্র উপায়। অতঃপর রাজা বভ্রুবাহন প্রেতকে প্রশ্ন করিয়া তাহার নিকট হইতে আরও বহু তত্ত্বকথা জানিতে পারিলেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রেতের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহার শ্রাদ্ধ করিলেন। বভ্রুবাহন-কৃত সেই শ্রাদ্ধের ফলেই প্রেত মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

বভ্রুবাহনের কথিত প্রেতের উল্লিখিত সাক্ষাৎকার এবং রাজাকর্তৃক কৃত শ্রাদ্ধের ফলে তাহার প্রেতত্ব-বিমুক্তি যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা; কল্পনামাত্র নহে,—তাহাও গরুড়পুরাণ স্পষ্ট ভাষায়ই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ঘটনাটি বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"কেবল পুত্রদত্ত শ্রাদ্ধই নহে, সম্পর্কহীন ভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিকর্তৃক কৃত শ্রাদ্ধও প্রেতের মুক্তিসাধনে সমর্থ। এই বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর।" গরুড়পুরাণের ভাষায়—
"শ্রীভগবানুবাচ—

"শ্রাদ্ধেন পুত্রদত্তেন স্বর্যাতীতি কিমুচ্যতে।
প্রেতোঽপি পরদত্তেন গতঃ স্বর্গমথো শৃণু॥
অত্রৈবোদাহরিষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
ঔর্দ্ধদেহিকদানস্য পরমাহাত্ম্যসূচকম্॥" ৭। ১৫—১৬

প্রেত কিরূপ কাতরভাবে তাহার শ্রাদ্ধ করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিল, নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়।

প্রেত রাজাকে বলিতেছে—

"ত্বমৌর্দ্ধদৈহিকং কৃত্বা মামুদ্ধর মহীপতে!
বর্ণানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং রাজা বন্ধুরিহোচ্যতে॥
তস্মাৎ তারয় রাজেন্দ্র! মণিরত্নং দদামি তে।
যথা মে সদ্গতির্ভূয়াৎ প্রেতযোনিশ্চ গচ্ছতি॥" ৭। ৪২—৪৩

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন—রাজাকে শুধু রাজধর্ম্মের দোহাই দিয়াই প্রেত ক্ষান্ত হয় নাই; তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণে মণিরত্ন প্রদান করিবে বলিয়াও সে প্রলোভন

দেখাইয়াছে। প্রেতত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাহার কিরূপ প্রবল ইচ্ছা ছিল, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়। অবশ্য ধর্ম্মপ্রাণ রাজা বভ্রুবাহন কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া শুধু কর্ত্তব্যবোধেই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক প্রেতের মুক্তিলাভের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন।

ভিন্নবর্ণের লোক কি কি ভাবে প্রেতের মুক্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিতে পারেন, তাহাও প্রেত বভ্রুবাহনের কাছে বলিয়াছিল। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রেতত্ববিমুক্তি কামনায় বিষ্ণুপূজা বা স্বুবর্ণ-নির্ম্মিত ঘট প্রভৃতি দান করিলেও প্রেতের মুক্তিলাভ হয়।

"অতো বক্ষ্যামি তে বিষ্ণুপূজাং প্রেতত্বনাশিনীম্।"

এবং "দানং প্রেতঘটং নাম সর্ব্বাশুভ-বিনাশকম্।
দুর্লভং সর্ব্বলোকানাং দুর্গতিক্ষয়কারকম্॥"

প্রভৃতি শ্লোক হইতে উল্লিখিত তথ্যগুলি নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায়।

উপসংহারে গরুড়-পুরাণ আমাদিগকে জানাইয়াছেন—পুত্রকৃত শ্রাদ্ধ যে মানুষকে মুক্তির পথে প্রেরণ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? পরকৃত শাদ্ধের ফলেও বৈশ্য স্বদেবের প্রেতাত্মা মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিল। গরুড়পুরাণের ভাষায়—

"শ্রাদ্ধেন পরদত্তেন গতঃ প্রেতোঽপি সদ্‌গতিম্।
কিং পুনঃ পুত্রহস্তেন পিতা যাতীতি চাদ্ভুতম্?"

শ্রাদ্ধ যে কখনও ব্যর্থ হয় না, উল্লিখিত ঘটনাটি হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাজা দশরথের শ্রাদ্ধ

ঋগ্বেদ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থেও যে পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধের উল্লেখ আছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। বস্তুতঃ স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সময়েই ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে শ্রাদ্ধ-প্রথা চলিয়া আসিতেছে। সময়ে সময়ে দানব ও রাক্ষসেরা অন্যান্য বৈদিক কর্ম্মের সহিত এই শ্রাদ্ধ প্রথাটির ও বিলোপ সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। যাহা সত্য, যাহার দৃষ্টফল বিদ্যমান, তাহা কি কখনও সভ্যজগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে? শ্রাদ্ধ করিলে কিভাবে ফল লাভ হয়, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাল্মীকির রামায়ণ হইতে দশরথ প্রভৃতির শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল কথা জানা যায়, কেবলমাত্র তাহাই বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

পুত্রহীন রাজা দশরথ পুত্রলাভের আশায় পর পর তিনটি বিবাহ করিয়াও পুত্র মুখ দর্শনে অসমর্থ হন। ঘটনাচক্রে তিনি একদা শিকার করিবার উদ্দেশ্যে বনে গিয়া শব্দভেদী বাণদ্বারা ভুলক্রমে একটি মুনিপুত্রকে হত্যা করেন এবং নিহত বালকের পিতাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। এই অভিশাপটি বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে বরস্বরূপই হইয়াছিল। মুনি অভিশাপ দিয়াছিলেন—"আমি যেমন পুত্রশোক পাইলাম, তুমিও তেমনি পুত্রশোক লাভ করিয়া সেই জ্বালায় দেহত্যাগ করিবে।" পুত্র জন্মিলে তবে তো রাজার পুত্রশোক হইবে। মুনির শাপে তাই রাজার পুত্র জন্মিয়াছিল এবং জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে বনবাসের আদেশ দিয়া সেই জ্বালায়ই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশ্য পুত্র জন্মিবার জন্য রাজাকে একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানও করিতে হইয়াছিল। রামায়ণ যাঁহারা পড়িয়াছেন, এই সকল বৃত্তান্ত তাঁহাদের সুবিদিত।

দুষ্ট দাসী মন্থরার প্ররোচনায় ছোটরাণী কৈকেয়ী যখন রাজাকে তাঁহার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া এক বরে ভরতকে রাজ্যদান এবং অপর বরে শ্রীরামচন্দ্রকে ১৪ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে জিদ ধরিলেন এবং প্রতিজ্ঞা-পূরণার্থ একান্ত অনিচ্ছায় রাজা দশরথ তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন রামচন্দ্রের বনগমন এবং সেই শোকে দশরথের মৃত্যু ঘটিল। কৈকেয়ীনন্দন ভরত তখন মাতুলালয়ে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক ছুটিল এবং যথা-কালে ভরত রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া প্রথমেই ভরতকে

পিতৃদেহের দাহকার্য্য সম্পাদন করিতে হইল। বর্ত্তমানকালে আমরা যেভাবে অশৌচ ধারণ করি, ভরতও ঠিক তেমনি অশৌচ ধারণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে তাঁহার পিতার শয়নকক্ষেই তিনি ভূমিতে তৃণশয্যা রচনা করিয়া তথায় ১০ রাত্রি শয়ন করিলেন। ক্ষত্রিয়দের অশৌচ ১২ দিন ; তন্মধ্যে ১০ দিন মৃত ব্যক্তির শয়নকক্ষেই তৃণশয্যায় শয়ন করিতে হয়। ব্রাহ্মণদের যেমন দশম দিবসে দেহ কিছুটা শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়দেরও তেমনি একাদশ দিবসে দেহের আংশিক শুদ্ধি জন্মে। ইহাই উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে। প্রমাণস্বরূপ রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড (গৌড়ীয় সংস্করণ) হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা—

"প্রবিশ্য তস্মিংশ্চ পিতুর্নিবেশনে
তৃণানি সংস্তীর্য্য দশাহমাতুরঃ।
ততঃ স সুষ্বাপ তমেব চিন্তয়ন্
পিতুর্নিবেশং ভরতঃ প্রতাপবান্॥" ৮৫ | ২৬

বঙ্গার্থ ঃ—অতঃপর পিতার বাসগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক প্রতাপশালী ভরত তৃণশয্যা রচনা করিয়া শোকাতুরচিত্তে দশ দিন অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে ভরত কেবলমাত্র পিতার মৃত্যু বিষয়েই চিন্তা করিতেন।

দশ দিন পর যথারীতি শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া ভরত পিতার শ্রাদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। দ্বাদশ দিবসে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিবার পর তিনি যথাবিধি ত্রয়োদশ দিবসীয় শ্রাদ্ধটি সম্পন্ন করিলেন। ব্রাহ্মণদের পক্ষে যেমন একাদশাহে সম্পাদনীয় শ্রাদ্ধটিই প্রধান, ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও তেমনি ত্রয়োদশাহে সম্পাদনীয় শ্রাদ্ধটিই প্রধান। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভরত ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন এবং মহামূল্য বস্ত্র, গরু, বিবিধ যানবাহন, দাসদাসী, ধনরত্নপূর্ণ গৃহ এবং উত্তম ভূষণ প্রভৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। বাল্মীকির ভাষায় ঃ—

"সমতীতে দশাহে তু কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ।
চক্রে দ্বাদশিকং শ্রাদ্ধং ত্রয়োদশিকমেব চ॥
দদৌ চোদ্দিশ্য পিতরং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনন্তথা।
মহার্হাণি চ বস্ত্রাণি গাশ্চ বাহনমেব চ॥
যানানি দাসীর্দাসাংশ্চ বেশ্মানি বসুমন্তি চ।
ভূষণানি চ মুখ্যানি রাজস্তস্যৌর্দ্ধদেহিকে॥"

—অযোধ্যাকাণ্ড ৮৬ | ১—৩

মুখ্যতঃ পিতার শ্রাদ্ধ জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই কর্ত্তব্য ; কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র তখন নির্ব্বাসিত এবং তাঁহাকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব নহে। বনে গিয়াও অশৌচকালের মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি না, ইহার নিশ্চয়তা নাই ; সুতরাং রাজধানীতে উপস্থিত পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরতই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিলেন। ভরতের কৃত শ্রাদ্ধদ্বারাই হয়তো দশরথের মুক্তি হইবে ; কিন্তু যথাবিধি শ্রাদ্ধ না করিলে তাঁহার নির্ব্বাসিত পুত্রদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ অপরাধী হইবেন। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া রাজপরিবারের পরম হিতৈষী প্রধান সচিব সুমন্ত্র ভরত ও শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া রাম-লক্ষ্মণের অন্বেষণে বাহির হইলেন। বনে গিয়া তাঁহারা খুঁজিতে খুঁজিতে রাম-লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং তাঁহাদিগকে দিয়াও যথারীতি শ্রাদ্ধ করাইলেন।

বনে গিয়া ভরত ও শত্রুঘ্ন পিতার মৃত্যুসংবাদ রামকে জানাইলেন। তখন চারি ভাই একসঙ্গে পবিত্র মন্দাকিনী-নদীতে স্নান করিয়া এই পবিত্র নদীর জলদ্বারা পিতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণমুখী হইয়া হস্তযুগলদ্বারা জলাঞ্জলি ধারণ করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে উহাদ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। এই সকল কথা বাল্মীকির রামায়ণে স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে।

তর্পণের পর শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। বনবাসী রাম রাজপরিবারের টাকাকড়ি গ্রহণ করিতে পারেন না ; সুতরাং বনবাসকালে তাঁহার পক্ষে যাহা সম্ভব, তাদৃশ বন্য তণ্ডুলাদিদ্বারাই তিনি পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। তবে শাস্ত্রীয় বিধান কোনটিই তিনি লঙ্ঘন করেন নাই। মন্দাকিনী-নদীর তীরে একটি পরিষ্কার স্থানে বসিয়া শ্রীরামচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাগ্র-কুশোপরি ইঙ্গুদী ও বদরীফলযুক্ত পিণ্যাক-তণ্ডুলের পিণ্ড স্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ-সহকারে উহা পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছিলেন।

রাজা দশরথ সর্ব্বদা উত্তম শালিতণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিয়া গিয়াছেন ; আর রাম কি না তাঁহার প্রেতাত্মাকে দিতেছেন বন্য তণ্ডুলের অন্ন—এই কথা ভাবিয়া রামের মনে যথেষ্ট দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাব এই বনবাসের জন্য তো রামচন্দ্র নিজে দায়ী নহেন ; দশরথই তো তাঁহাকে বনবাসে পাঠাইয়া গিয়াছেন। বনবাসী রামের পক্ষে বন্য তণ্ডুল ছাড়া অন্যকিছু পাওয়া তো সম্ভব নহে। রামচন্দ্র পিণ্ড-দানকালে কৈফিয়ৎস্বরূপ পিতাকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন—শাস্ত্র বলেন, মানুষ নিজে যেরূপ অন্ন ভক্ষণ করে, শ্রাদ্ধকালে সেইরূপ অন্নদ্বারাই পিণ্ডদান-

কার্য্য সম্পাদন করিবে ; অতএব এই অবস্থায় রামের পক্ষে যাহা সম্ভব তাদৃশ পিণ্ডই তিনি দিতেছেন ; অবস্থা বিবেচনা করিয়া দশরথের প্রেতাত্মা যেন ইহাদ্বারাই সন্তুষ্ট হন। পিতৃভক্ত রাম এই সকল কথা বলিতে বলিতে যথাশাস্ত্র মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে বাল্মীকি লিখিয়াছেন—

"ততো মন্দাকিনীতীরে শুচৌ দেশে নরাধিপঃ।
পিতুর্ন্যবর্ত্তয়চ্ছ্রীমান্ নিবাপং ভ্রাতৃভিঃ সহ॥
ঐঙ্গুদং বদরোন্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্ত্ত ইদং বচনমব্রবীৎ॥
ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ! প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নঃ পুরুষো নূনং তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ॥"

—অযোধ্যাকাণ্ড ১১১ | ৩৪—৩৬

রাজা দশরথ যদি জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে নির্ব্বাসিত না করিতেন, তাহা হইলে রাজধানীতে থাকিয়া রাম অতি উত্তম শালিতণ্ডুল প্রভৃতি রাজভোগ্য অন্নাদিদ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিতেন ; কিন্তু ভাগ্যদোষে তিনি নিজেই সেই রাস্তা বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতারা এইভাবে পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাঁহাদের চেয়েও অনেক বেশী ব্যথা পাইয়াছেন রামজননী পতিব্রতা রাজ্ঞী কৌশল্যা।

দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে দিয়া প্রাথমিকভাবে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করাইয়া কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ রামকে দেখিবার জন্য বনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন রাজার কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা বনের উদ্দেশ্যে চলিলেন। ক্রমে মন্দাকিনীনদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন—অল্পক্ষণ পূর্ব্বে রামচন্দ্র তথায় পিতার উদ্দেশ্যে যে পিণ্ডদান করিয়াছেন, তাহা তখনও বিরাজ করিতেছে। এই বন্য তণ্ডুলের পিণ্ড দেখিয়া ব্যথায় বিদীর্ণ হইল রাজমহিষী কৌশল্যার অন্তর। অবিরাম অশ্রুধারা আর্দ্র করিয়া দিল তাঁহার বদনমণ্ডল। অন্যান্য রাজমহিষীদিগকে এই পিণ্ড দেখাইয়া তিনি মনের দুঃখে বলিলেন—"হায় হায়, তোমরা সবাই চাহিয়া দেখ, সর্ব্বদা দেবভোগে যিনি অভ্যস্ত, সেই রাজ্যাধিপতি দশরথ আজ কি রকম পিণ্ড-লাভ করিলেন। চতুঃসমুদ্রপরিবেষ্টিতা বিশাল ধরিত্রীর অধীশ্বর দেবরাজের ন্যায় ঐশ্বর্য্যবিভূষিত সেই রাজাধিরাজ কি না আজ ইঙ্গুদীফল ও পিণ্যাক-তণ্ডুলের পিণ্ড গ্রহণ করিলেন। এই শ্রেণীর পিণ্ড একমাত্র তপস্বীদের শ্রাদ্ধেই শোভা

পায়। হায় হায়, রঘুবংশতিলক রাম কিনা আজ এইরূপ পিণ্ডদ্বারাই পিতার শ্রাদ্ধ করিলেন। ইহা দেখিয়াও ভাগ্যহীন আমার হৃদয় কেন সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না?"

বাল্মীকির ভাষায়—

"সা তমিঙ্গুদপিণ্যাকং দৃষ্ট্বা দ্বিগুণ-দুঃখিতা।
উবাচ দেবী কৌশল্যা সর্ব্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ॥
ইদমিক্ষ্বাকুনাথেন রাঘবেণ মহাত্মনা।
পিতুরিক্ষ্বাকুনাথস্য ন্যুপ্তং পশ্যত যাদৃশম্॥
তস্য দেবসমস্যেদং পার্থিবস্য মহাত্মনঃ।
নৈতদৌপয়িকং মন্যে ভুক্তভোগস্য ভোজনম্॥
চতুরন্তাং মহীং ভুক্ত্বা মহেন্দ্রসদৃশো বিভুঃ।
কথমিঙ্গুদপিণ্যাকং স ভুঙ্‌ক্তে বসুধাধিপঃ॥
অতো দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
যত্র রামঃ পিতুর্দদ্যাত্তাপসান্নাত্বমীদৃশম্॥
রামেণেঙ্গুদপিণ্যাকং পিতুর্দ্দত্তং সমীক্ষ্য চ।
কথং মমেদং হৃদয়ং ন বিদীর্য্যেৎ সহস্রধা?"

—অযোধ্যাকাণ্ড ১১২ | ১০—১৫

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রাজা পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ

জীবদ্দশায় মানুষ কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে নানারূপ পাপকার্য্য করিতে বাধ্য হয়। এইরকম লঘু পাপের কুফল দূর করিবার ক্ষমতা শ্রাদ্ধের আছে। গুরুতর পাপ করিয়াও যদি মানুষ শ্রাদ্ধতর্পণাদিদ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি-সাধনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ গুরুতর পাপের কুফলও অনেকটা লঘু হইয়া থাকে। এই কারণে শ্রাদ্ধ করার ফলে মৃত ও জীবিত (যাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হয় এবং যিনি শ্রাদ্ধ করেন) উভয়েই উপকৃত হন।

সাধারণতঃ পুত্রের জীবদ্দশায় মাতাপিতার মৃত্যু হয়; এই কারণে প্রায় সর্ব্বত্র পুত্রেরাই মাতাপিতার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে পিতার জীবদ্দশায় পুত্রের মৃত্যু হয়, সেই ক্ষেত্রে পিতাই পুত্রের শ্রাদ্ধ করেন। মহাভারত হইতে আমরা জানিতে পারি—অতি প্রাচীনকালে রাজর্ষি নিমির জীবদ্দশায় তাঁহার শ্রীমান্ নামক পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি সেই পুত্রটির শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যত্রও এইভাবে পিতা বা অন্য গুরুজনকর্তৃক পুত্র প্রভৃতির শ্রাদ্ধের দৃষ্টান্ত আছে।

স্মরণাতীত কাল হইতে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা অবশ্যকর্ত্তব্যরূপেই ভারতীয় আর্য্যসমাজে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র হিন্দুসমাজ যাঁহাদিগকে ভগবদবতার-রূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই মর্য্যাদাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র এবং পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণও নিজ নিজ পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ যেভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ যে অন্যান্য আত্মীয়দের, এমন কি ভাগিনেয় অভিমন্যুরও শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়।

মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে আমরা জানিতে পারি—কুরুরাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম, বৈমাত্রের ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর এবং অন্যান্য জ্ঞাতিরাও যথাবিধি তাঁহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়াছিলেন। পত্নী কুন্তী এবং পুত্র যুধিষ্ঠির তো বিশেষভাবেই শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়াছিলেন। নগরবাসী রাজভক্ত প্রজাগণ রাজাকে পিতৃতুল্য মনে করিতেন; এই কারণে তাঁহারাও রাজপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সহিত রাজার তর্পণাদি করিয়া দ্বাদশ রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন করতঃ রাজার

উদ্দেশ্যে শোকপ্রকাশ এবং শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছিলেন। কেবল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রজারাই নহেন ; ব্রাহ্মণ প্রজারাও রাজপুত্রগণের সঙ্গে সমানভাবেই রাজার তর্পণ ও শোকপ্রকাশাদি করিয়াছিলেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"ততো ভীষ্মোঽথ বিদুরো রাজা চ সহ পাণ্ডবৈঃ।
উদকঞ্চক্রিরে তস্য সর্ব্বাশ্চ কুরুযোষিতঃ॥
চুক্রুশুঃ পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে ভীষ্মঃ শান্তনবস্তথা।
বিদুরো জ্ঞাতয়শ্চৈব চক্রুশ্চাপ্যুদকক্রিয়াঃ॥
কৃতোদকাংস্তানাদায় পাণ্ডবান্ শোকবিহ্বলান্।
সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো রাজন্! শোচন্ত্যঃ পর্য্যবারয়ন্॥
যথৈব পাণ্ডবা ভূমৌ সুষুপুঃ সহ বান্ধবৈঃ।
তথৈব নাগরা রাজন! শিশ্যিরে ব্রাহ্মণাদয়ঃ॥
তদনানন্দমস্বস্থমাকুমারমহৃষ্টবৎ।
বভূব পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং নগরং দ্বাদশ ক্ষপাঃ॥"

—আদিপর্ব্ব (হরিদাসীয়) ১২১।২৮—৩২

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহের দাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার পরই ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতি সকলে তাঁহার উদ্দেশ্যে তর্পণ করিয়া উল্লিখিত প্রকারে ভূমিশয্যা গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আর একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে জানা যাইতেছে যে, মহাভারতের যুগেও ক্ষত্রিয়েরা ১২ দিন মরণাশৌচ ধারণ করিতেন ; অর্থাৎ সেই যুগেও ব্রাহ্মণের মরণাশৌচ ১০ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন এবং শূদ্রের ৩০ দিন ধারণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি এক শ্রেণীর সাম্যবাদী লোক যে সর্ব্ববর্ণের দশাহাশৌচের ধুয়া তুলিয়াছেন, ইহা বস্তুতঃ মহাভারতেরও আচারবিরোধী।

উল্লিখিতপ্রকারে ১২ দিন অশৌচ-ধারণের পর পাণ্ডুর বিধবা পত্নী কুন্তী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র, জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম প্রভৃতি সকলেই তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশ্য জ্যেষ্ঠপুত্র যে ভাবে শ্রাদ্ধ করেন, অন্যান্য আত্মীয়েরা সেইভাবে করেন না। জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রথম এবং প্রধান শ্রাদ্ধকর্ত্তা। মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই জ্যেষ্ঠ-পুত্রের শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য আরম্ভ হয়। প্রথমে পূরক পিণ্ডদান এবং পরে দানাদি কার্য্য সমাপনান্তে আদ্যাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি মুখ্যতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই

কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠপুত্রের অবর্ত্তমানে জীবিত পুত্রদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনিই এই সকল কার্য্য করেন। অপুত্রক ব্যক্তি বিবাহিত হইলে এবং মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রী জীবিত থাকিলে উল্লিখিত সমুদয় কার্য্য স্ত্রীকেই করিতে হয়। অবিবাহিত বা মৃতদার ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করেন জীবিত জ্ঞাতি বা আত্মীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, যুধিষ্ঠিরই মুখ্যতঃ পিতার পিণ্ডদানাদি যাবতীয় শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জননী, সহোদর, বৈমাত্রের ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণ করিয়াছিলেন শুধু দানাদিকার্য্য। মৃতব্যক্তির তৃপ্তি বা মুক্তি কামনায় যে সকল দানাদি কার্য্য শ্রদ্ধার সহিত করা হয়, তাহাও শ্রাদ্ধপদবাচ্য; কারণ শ্রাদ্ধশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'শ্রদ্ধার সহিত দান' (শ্রদ্ধয়া দানম্ শ্রাদ্ধম্)।

মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে আমরা জানিতে পারি—পাণ্ডুর শ্রাদ্ধে কুরুবংশীয় জ্ঞাতিগণকে এবং সহস্র সহস্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকেও ভোজন করানো হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ পিতৃভক্ত রাজপুত্র যুধিষ্ঠির পিতার মুক্তি-কামনায় বহুমূল্য রত্নাদি সামগ্রী এবং বহুসংখ্যক উত্তম গ্রাম বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। এই বিরাট্ ভোজন-কার্য্য ও শ্রাদ্ধাদি নগরীর বাহিরে একটি প্রশস্ত মাঠেই সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং শ্রাদ্ধান্তে নগরবাসিগণ শোভাযাত্রা-সহকারে পাণ্ডবগণকে সঙ্গে লইয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উক্ত শোভাযাত্রায় শুধু নগরবাসীরাই যোগদান করেন নাই, বহু-সংখ্যক জনপদবাসীও (গ্রামাঞ্চলের লোকও) ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধান্তে পাণ্ডবেরা যেমন দীর্ঘকাল মৃত পিতার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, নগরবাসী এবং জনপদবাসী প্রজারাও তেমনি তাহাদের পিতৃপ্রতিম প্রজারঞ্জন নৃপতির জন্য শ্রদ্ধাভরে শোক প্রকাশ করিয়াছিল। মহাভারতের (হরিদাসীয়) ভাষায়—

"ততঃ কুন্তী চ রাজা চ ভীষ্মশ্চ সহ বন্ধুভিঃ।
দদুঃ শ্রাদ্ধং তদা পাণ্ডোঃ স্বধামৃতময়ন্তদা॥
কুরূংশ্চ বিপ্রমুখ্যাংশ্চ ভোজয়িত্বা সহস্রশঃ।
রত্নৌঘান্ বিপ্রমুখ্যেভ্যো দত্ত্বা গ্রামবরাংস্তথা॥
কৃতশৌচাংস্ততস্তাংশ্চ পাণ্ডবান্ ভরতর্ষভান্।
আদায় বিবিশুঃ সর্ব্বে পুরং জানপদাস্তদা॥
সততঞ্চান্বশোচন্ত তমেব পুরুষর্ষভম্।
পৌরজানপদাঃ সর্ব্বে মৃতং স্বমিব বান্ধবম্॥"

—আদিপর্ব্ব ১২২।১—৪

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মহাভারতে শ্রাদ্ধের উল্লেখ

মহাভারতের নানা স্থানে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বহু কথা বলা হইয়াছে। বৈদিকযুগে যে ভাবে শ্রাদ্ধ কবা হইত, তাহার নাম ছিল 'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ'। বর্ত্তমানকালে যেভাবে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার প্রথম প্রবর্তন করেন অত্রিবংশীয় রাজর্ষি নিমি। অত্রিসংহিতায় এইরূপ শ্রাদ্ধের বিশেষ বিধান দৃষ্ট হয়, এবং মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্বেব (হবিদাসীয় সংস্করণ) ৭৮তম অধ্যাযে তাহাব বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি।

শ্রাদ্ধকালে মাতা, পিতা বা অন্য মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে 'দক্ষিণপ্লবনে দেশে' দক্ষিণাগ্রকুশোপরি পিণ্ডদান কবিয়া বেদমন্ত্র পাঠ কবিবাব বিধান স্মবণাতীত কাল হইতে প্রচলিত আছে। পরবর্ত্তীকালে উল্লিখিত বেদমন্ত্রের সঙ্গে স্মৃতিকাবগণের নামকীর্ত্তন, গোহত্যাকাবী মুনিপুত্রগণেব উপাখ্যান এবং দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির চবিতকথাও ইতিহাসরূপে যোগ করা হয়। বর্ত্তমানে ঐ সকল ঐতিহাসিক তথ্যও বেদমন্ত্রের অঙ্গরূপেই পঠিত হইয়া থাকে। ইতিহাসের পঞ্চমবেদত্ব অর্থাৎ বেদতুল্যত্ব শ্রুতিতেও স্বীকৃত হইয়াছে। দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠির সম্বন্ধীয় যে দুইটি শ্লোক শ্রাদ্ধকালে বেদমন্ত্রের সঙ্গে পাঠ করা হয়, মহাভারতে আদিপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়েই তাহা লিপিবদ্ধ দেখা যায। উক্ত মন্ত্র দুইটি যথা—

"দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ।
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে, সমৃদ্ধে-
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে, সমৃদ্ধে-
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥"

—আদিপর্ব্ব (হরিদাসীয়) ১।১১—১২

কুরুরাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যে তাঁহার পুত্র ও জ্ঞাতিরা শাস্ত্রোক্ত বিধানে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আদিপর্ব্বের ১২২ তম অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি।

শ্রাদ্ধকালে যে যজ্ঞবরাহের অর্চ্চনা করা হয়, তাহা কোন্ সময় হইতে কি কারণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহার উল্লেখ রহিয়াছে শান্তিপর্ব্বের ৩৩০ তম অধ্যায়ে। দেবর্ষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে নরনারায়ণ বলিয়াছেন—অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবী সমুদ্রগর্ভে মগ্না ছিলেন, তখন ভগবান্ বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দন্তদ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করেন। এই কারণেই ঋষিগণ পিতৃযজ্ঞারম্ভে বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

নারদ প্রশ্ন করিয়াছেন—মৃত্তিকার উপর কুশস্থাপন করতঃ তদুপরি তিনটি পিণ্ড স্থাপন করা হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও ঐরূপ করিবার বিধান আছে, এবং শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত লোকেরা উল্লিখিত শ্রুত্যুক্ত বিধি অনুসারেই কুশোপরি পিণ্ডত্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। এইভাবে তিনটি পিণ্ড দেওয়ার কারণ কি এবং এইগুলিকে পিণ্ডই বা বলা হয় কেন?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে নরনারায়ণ বলেন—ভগবান্ গোবিন্দ আদিবরাহরূপে দন্তদ্বারা পৃথিবীকে যখন জলমধ্য হইতে উত্তোলন করেন, তখন তাঁহার দেহ জল ও কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায়ই তিনি দ্বিপ্রহরের আহ্নিককাল সমাগত হইয়াছে দেখিয়া মৃত্তিকোপরি কুশস্থাপন-পূর্ব্বক দন্তদ্বারা তিনটি পিণ্ড তদুপরি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি লোকশিক্ষার্থ সঙ্কল্পপূর্ব্বক নিজ গাত্রোৎপন্ন তিলসংযোগে উল্লিখিত তিনটি পিণ্ড পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। ভগবান্ আদিবরাহের উল্লিখিত কার্য্যের অনুকরণে অদ্যাপি ভারতীয় আর্য্যসম্প্রদায়ের লোকেরা কুশোপরি পিণ্ডত্রয় স্থাপনপূর্ব্বক পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া থাকেন। মহাভারতের ভাষায় দেবর্ষি নারদের প্রশ্ন যথা—

"ত্রীন্ পিণ্ডান্ ন্যস্য বৈ পৃথ্ব্যাং পূর্ব্বং দত্ত্বা কুশানিতি।
কথন্তু পিণ্ডসংজ্ঞাস্তে পিতরো লেভিরে পুরা॥"

—শান্তিপর্ব্ব (হরিদাসীয়) ৩৩০।১১

নরনারায়ণের উত্তর যথা—

"ইমাং হি ধরণীং পূর্ব্বং নষ্টাং সাগরমেখলাম্।
গোবিন্দ উজ্জহারাশু বারাহং রূপমাস্থিতঃ॥

স্থাপয়িত্বা তু ধরণীং স্বে স্থানে পুরুষোত্তমঃ।
জলকর্দ্দমলিপ্তাঙ্গো লোককার্য্যার্থমুত্থতঃ ॥
প্রাপ্তে চাহ্নিককালে তু মধ্যদেশগতে রবৌ।
দংষ্ট্রাবিলগ্নাংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্ বিধূয সহসা প্রভুঃ ॥
স্থাপয়ামাস বৈ পৃথ্ব্যাং কুশানাস্তীর্য্য নারদ।
স তেনাত্মানমুদ্দিশ্য পিত্র্যঞ্চক্রে যথাবিধি ॥
সঙ্কল্পয়িত্বা ত্রীন্ পিণ্ডান স্বেনৈব বিধিনা প্রভুঃ।
আত্মগাত্রোষ্মসম্ভূতৈঃ স্নেহগর্ভৈস্তিলৈরপি ॥
প্রোক্ষ্যাপবর্গং দেবেশঃ প্রাঙ্মুখঃ কৃতবান স্বযম্।
মর্য্যাদাস্থাপনার্থঞ্চ ততো বচনমুক্তবান্ ॥"

—শান্তিপর্ব্ব ৩৩০।১২—১৭

আদিপর্ব্বের ১৪৪ তম অধ্যায় হইতে জানা যায—জতুগৃহদাহের ফলে পাণ্ডবেরা নিহত হইযাছেন শুনিযা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি জ্ঞাতিগণ পাণ্ডবদের নাম-গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিযাছিলেন। তর্পণ বস্তুতঃ শ্রাদ্ধেরই অঙ্গ। আদিপর্ব্বে বলা হইয়াছে—ধৃতরাষ্ট্র ও তাহার পুত্রগণ পাণ্ডবদের মৃত্যুসংবাদ শুনিযা অন্যান্য জ্ঞাতিগণের সহিত বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক একবস্ত্রে জলে নামিযা স্নান করেন এবং তাহার পর পাণ্ডবগণের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলিও দান করেন। মহাভারতের ভাষায়—

"সমেতাশ্চ ততঃ সর্ব্বে ভীষ্মেণ সহ কৌরবাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রশ্চ গঙ্গামভিমুখা যযুঃ ॥
একবস্ত্রা নিরানন্দা নিরাভরণবেষ্টনাঃ।
উদকং কর্ত্তুকামা বৈ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম ॥
এবং গত্বা ততশ্চক্রে জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।
উদকং পাণ্ডুপুত্রাণাং ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥"

—আদিপর্ব্ব (হরিদাসীয়) ১৪৪।১৫—১৭

আদিপর্ব্বের দশম অধ্যায় হইতে জানা যায়—মহর্ষি জরৎকারু এক সময়ে তাঁহার পিতৃপুরুষগণের দর্শন লাভ করেন। জরৎকারু বিবাহ করেন নাই, ফলে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করিবেন এবং অতঃপর পিতৃপুরুষেরা আর জলপিণ্ড পাইবেন না—এই কারণে মনোদুঃখে তাঁহারা জরৎকারুকে দর্শন দিয়া দারপরিগ্রহ

করিবার জন্য অনুরোধ করেন। পিতৃগণের মনোভাব জানিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জনের জন্য জরৎকারু মুনি বিবাহ করতঃ পিতৃলোকের জলপিণ্ড লাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শাস্ত্র বলেন—মানুষ জন্মিবার সময় তিনটি ঋণ লইয়া পৃথিবীতে আসে। উক্ত ত্রিবিধ ঋণ যথা—(১) দেব-ঋণ (২) ঋষি-ঋণ এবং (৩) পিতৃ-ঋণ। যথাবিধি যজ্ঞসম্পাদন না করিলে দেবঋণ হইতে, এবং দান না করিলে ঋষি ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না। ঠিক তেমনি সন্তানোৎপাদন করিতে না পারিলে মানুষ পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

"ঋণং দেবস্য যাগেন, ঋষীণাং দানকর্ম্মণা।
সন্তত্যা পিতৃলোকানাং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ॥"

পিতৃগণের নির্দ্দেশে দারপরিগ্রহ করতঃ বংশরক্ষা ও পিতৃলোকের জলপিণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া মহর্ষি জরৎকারু পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে জানা যায়—যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি জীবিত যোদ্ধারা এবং অন্যান্য জীবিত লোকেরা প্রত্যেকেই যুদ্ধে নিহত নিজ নিজ জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতির পুত্রেরাও সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সুতরাং জীবিত বৃদ্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজোচিত আড়ম্বরের সহিতই পুত্রাদির শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি মৃত পুত্রগণ ও পৌত্রদের প্রত্যেকের আত্মার তৃপ্তিকামনায় প্রচুর-পরিমাণ উত্তম শালির অন্ন, বহুতর উত্তম গরু এবং অন্যান্য ধন ও বহুমূল্য রত্নাদি বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। কর্ণের পুত্রেরা সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, সুতরাং একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান হিসাবে যুধিষ্ঠিরই কর্ণ ও তাঁহার পুত্রগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা যদিও জীবিত ছিলেন, তথাপি উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানটিকে হত্যা করিবার ফলে তিনি ভ্রূণহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত এবং পাতিত্যদোষে দুষ্ট। তাহা ছাড়া উক্ত অপরাধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া লোকালয় হইতে নির্ব্বাসিত; সুতরাং দ্রোণের শ্রাদ্ধও যুধিষ্ঠিরই করিয়াছিলেন। শিষ্য হিসাবে গুরুর শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার যুধিষ্ঠিরের ছিল। বিরাটরাজ, পঞ্চালরাজ দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রুপদ-পুত্রগণ, উত্তর প্রভৃতি বিরাটপুত্রগণ এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণের শ্রাদ্ধও স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর পিতা, ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণের শ্রাদ্ধ করিবার সময় তিনি দ্রৌপদীকে দিয়াও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দানাদি করাইয়াছিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির কিরূপ আড়ম্বরের সহিত শ্রাদ্ধ ও অঙ্গস্বরূপ দানাদিকার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার মনোজ্ঞ বর্ণনা শান্তিপর্ব্বে লিপিবদ্ধ আছে। প্রত্যেকটি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি ও মুক্তির উদ্দেশ্যে সমস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধন, বস্ত্র, মূল্যবান্ রত্ন এবং গোধন দান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। কেবল নিজের জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণের শ্রাদ্ধ করিয়াই মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্ষান্ত হন নাই, যুদ্ধে নিহত যে সকল ক্ষত্রিয়ের কোন জ্ঞাতি বা আত্মীয় জীবিত ছিলেন না, তাহাদের প্রত্যেকের জন্যই তিনি আড়ম্বর সহকারে শাস্ত্রানুযায়ী শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। মৃত ব্যক্তিগণের আত্মার তৃপ্তি-কামনায় রাজা যুধিষ্ঠির বহুসংখ্যক পান্থশালা নির্ম্মাণ এবং জলাশয়-খননও করিয়াছিলেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই সম্বন্ধে শান্তিপর্ব্বের (হরিদাসীয) কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

"ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা জ্ঞাতীনাং যে হতা মৃধে।
শ্রাদ্ধানি কারযামাস তেষাং পৃথগুদারধীঃ॥
ধৃতরাষ্ট্রো দদৌ রাজা পুত্রাণামৌর্দ্ধদেহিকম্।
সর্ব্বকামগুণোপেতমন্নং গাশ্চ ধনানি চ॥
রত্নানি চ বিচিত্রাণি মহার্হাণি মহাযশাঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তু কর্ণস্য দ্রোণস্য চ মহাত্মনঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নাভিমন্যুভ্যাং হৈড়িম্বস্য চ রক্ষসঃ॥
বিরাট প্রভৃতীনাঞ্চ সুহৃদামুপকারিণাম্।
দ্রুপদ-দ্রৌপদেযানাং দ্রৌপদ্যা সহিতো দদৌ॥
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি পৃথগেকৈকমুদ্দিশন্।
ধনৈশ্চ বস্ত্রৈ রত্নৈশ্চ গোভিশ্চ সমতর্পয়ৎ।
যে চান্যে পৃথিবীপালা যেষাং নাস্তি সুহৃজ্জনঃ।
উদ্দিশ্যোদ্দিশ্য তেষাঞ্চ চক্রে রাজৌর্দ্ধদেহিকম্॥
সভাঃ প্রপাশ্চ বিবিধাস্তড়াগানি চ পাণ্ডবঃ।
সুহৃদাং কারযামাস সর্ব্বেষামৌর্দ্ধদৈহিকম্॥"

—শান্তিপর্ব্ব ৪২।১—৭

যুদ্ধের পর যখন শোকসন্তপ্ত নারীগণ তাঁহাদের মৃত পতি, পুত্র প্রভৃতির সাক্ষাৎ দর্শন কামনা করিয়াছিলেন, তখন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় যান এবং পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান করতঃ মৃতব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকে

তর্পণ করিলে নদীগর্ভ হইতে সেই মৃত ব্যক্তিদের ছায়ামূর্ত্তিগুলি উত্থিত হয়। তর্পণ বস্তুতঃ শ্রাদ্ধের অঙ্গ ; সুতরাং মৃত ব্যক্তিদের ছায়ামূর্ত্তিদর্শনও যে শ্রাদ্ধ বা তর্পণের ফলেই সম্ভব, তাহাও উক্ত ঘটনা হইতে জানা যাইতেছে। কুরুবংশীয় এবং অন্যান্য নারীগণ মৃত আত্মীয়গণের দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে কিভাবে ব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডব প্রভৃতি পুরুষদের সহিত গঙ্গায় গিয়া তর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় মহাভারতের ঋষি লিখিয়াছেন—

"তে সমাসাদ্য গঙ্গান্তু শিবাং পুণ্যজলোচিতাম্।
হ্রদিনীং বপ্রসম্পন্নাং মহানূপাং মহাবলাম্॥
ভূষণান্যুত্তরীয়াণি বেষ্টনান্যবমুচ্য চ।
ততঃ পিতৃণাং পৌত্রাণাং ভ্রাতৃণাং স্বজনস্য চ॥
পুত্রাণামার্য্যকাণাঞ্চ পতীনাঞ্চ কুরুস্ত্রিয়ঃ।
উদকঞ্চক্রিরে সর্ব্বা রুদত্যো ভৃশদুঃখিতাঃ।
সুহৃদাঞ্চাপি ধর্ম্মজ্ঞাঃ প্রচক্রুঃ সলিলক্রিয়াঃ॥

—স্ত্রীপর্ব্ব (হরিদাসীয়) ২৭।১—৩

আশ্বমেধিক পর্ব্ব হইতে জানা যায়—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আত্মীয়গণের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া বসুদেব প্রভৃতি জীবিত আত্মীয়গণ সকলেই তাহাদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি স্বজনগণ কুরুক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই বসুদেব আত্মীয়গণের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারেন এবং তাঁহাদের আত্মার উদ্দেশ্যে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য আত্মীয়দের সহিত তাঁহার ভাগিনেয় অভিমন্যুরও শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। কেবল কৃষ্ণই নহেন ; বসুদেব, সাত্যকি প্রভৃতি সকল জীবিত আত্মীয়ই পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত আত্মীয়গণের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহাদের শূরবংশীয় আত্মীয়েরা ৬০ হাজার ব্রাহ্মণকে বিবিধ ভোজে আপ্যায়িত করতঃ স্বর্ণ, গোধন, বস্ত্র ও শয্যাদি দ্বারা তুষ্ট করিলে ব্রাহ্মণেরা বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আপনারা এত বেশী দান করিতেছেন।" মহাভারতের ভাষায়—

"এতচ্ছ্রুত্বা তু পুত্রস্য বচঃ শূরাত্মজস্তদা।
বিহায় শোকং ধর্ম্মাত্মা দদৌ শ্রাদ্ধমনুত্তমম্॥

তথৈব বাসুদেবোঽপি স্বস্রীয়স্য মহাত্মনঃ।
দয়িতস্য পিতুর্নিত্যামকরোদৌর্দ্ধদৈহিকম্॥
ষষ্টিং শতসহস্রাণি ব্রাহ্মণানাং মহাভুজঃ।
বিধিবদ্ ভোজযামাস ভোজ্যং সর্ব্বগুণান্বিতম্॥
আচ্ছাদ্য চ মহাবাহুর্দ্ধনতৃষ্ণামপানুদৎ।
ব্রাহ্মণানাস্তদা কৃষ্ণো যদভূদ রোমহর্ষণম্॥
সুবর্ণঞ্চৈব গাশ্চৈব শয়নাচ্ছাদনন্তথা।
দীযমানাস্তদা বিপ্রা প্রভূতমিতি চাব্রুবন॥
বাসুদেবোঽপি দাশার্হো বলদেবঃ স-সাত্যকিঃ।
অভিমন্যোস্তদা শ্রাদ্ধমকুর্ব্বন্ সত্যবিক্রমাঃ॥"

—আশ্বমেধিকপর্ব্ব (পুনা) ৬১।১—৬

উল্লিখিত প্রকারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনের আরও বহু উদাহরণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। অনুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় মহামতি ভীষ্ম তাঁহার নিকট বলিয়াছেন। ভীষ্মের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহাভারতের যুগেও কেহ কেহ শ্রাদ্ধকে পিতৃযজ্ঞ নামে অভিহিত করিতেন। তাহা ছাড়া শ্রাদ্ধের ফলে যে পিতৃগণ প্রসন্ন হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে পুত্ররবদানে অভিনন্দিত করিয়া থাকেন, এইরূপ বিশ্বাসও মহাভারতের যুগে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যাহারা আড়ম্বর সহকারে শ্রাদ্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক দানাদি কার্য্য করিতেন, তাঁহারা মহাভারতের যুগেও যশোলাভে সমর্থ হইতেন। এই সম্বন্ধে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

"শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্। শ্রাদ্ধকর্ম্মবিধিং শুভম্।
ধন্যং যশস্যং পুত্রীয়ং পিতৃযজ্ঞং পরন্তপ!"

—অনুশাসন (হরিদাসীয়) ৭৬।৩

মহামতি ভীষ্ম বলিয়াছেন যে, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করা শুধু মনুষ্যদেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস, পিশাচ, কিন্নর প্রভৃতি সকলের পক্ষেই পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধে ভীষ্মের উক্তি যথা—

"দেবাসুর-মনুষ্যাণাং গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্।
পিশাচ-কিন্নরাণাঞ্চ পূজ্যা বৈ পিতরঃ সদা॥"

—অনুশাসন (ঐ) ৭৬।৪

উল্লিখিত প্রসঙ্গে শাস্ত্রোক্ত প্রায় সকল বিধানই ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের কাছে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। অনুশাসনপর্ব্বের ৭৮তম অধ্যায়ে জিজ্ঞাসু যুধিষ্ঠিরের নিকট 'পিতৃগীতা' নামক গাথাটিও ভীষ্মকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। এই গাথাটি পূর্ব্বকালে ভীষ্ম মহাত্মা সনৎকুমারের নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাষায় 'পিতৃগীতা' নামধেয় গাথাটি লিপিবদ্ধ আছে।

মহাভারতের পরিশিষ্টভাগ 'হরিবংশ' নামে খ্যাত। উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহামতি ভীষ্ম কেবল লোকমুখে শুনিয়াই শ্রাদ্ধের উপযোগিতা শিক্ষা করেন নাই ; এই বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও ছিল। ভীষ্ম বলিয়াছেন যে, তিনি যখন ভক্তিভরে তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতার হস্তটি ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া ভীষ্মের সম্মুখে অবস্থান করিতেছিল। পরলোকগত সেই নৃপতির হস্তে ভীষ্ম পরিষ্কারভাবেই কেয়ূর, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি হস্তাভরণও দেখিয়াছিলেন। ভীষ্মের পিতা শান্তনুর জীবদ্দশায় যেভাবে তাঁহার করতল রক্তবর্ণ ছিল, উক্ত হস্তের তলটিও তেমনি রক্তবর্ণ দেখাইতেছিল। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কল্পে কুশোপরি পিণ্ডদান করিবার বিধানই বেদাদিশাস্ত্রে রহিয়াছে, এই কথা জানিয়া এবং পুরোহিতের উপদেশ শুনিয়া তিনি আবির্ভূত পিতৃহস্তে পিণ্ড না দিয়া কুশোপরিই পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্ম এই কথাও বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত কারণে কুশোপরি পিণ্ডদান করার পর তাঁহার পিতার হস্ত সাদরে উহা গ্রহণ করিয়াছিল, এবং অশরীরী পিতা তাঁহাকে শুনাইয়া প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাক্যও উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই প্রসঙ্গে হরিবংশের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

"শ্রাদ্ধকালে মম পিতুর্ময়া পিণ্ডঃ সমুদ্যতঃ।
তং পিতা মম হস্তেন ভিত্ত্বা ভূমিমযাচত॥
হস্তাভরণপূর্ণেন কেয়ূরাভরণেন চ।
রক্তাঙ্গুলিতলেনাথ যথাদৃষ্টঃ পুরা ময়া॥
নৈষ কল্পে বিধির্দৃষ্ট ইতি সঞ্চিন্ত্য চাপ্যহম্।
কুশেম্বেব ততঃ পিণ্ডং দত্তবানবিচারয়ন্॥
ততঃ পিতা মে সুপ্রীতো বাচা মধুরয়া তদা।
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রীয়মাণো ময়ানঘ!"

—হরিবংশপর্ব্ব ১৬।১৯—২২

শ্রাদ্ধের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা এবং মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু তথ্য হরিবংশ-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে ভরদ্বাজমুনির মূর্খ পুত্রগণ যেভাবে শ্রাদ্ধকার্য্যের ফলে গোহত্যারূপ মহাপাপ করিয়াও পরবর্ত্তী কয়েকটি জন্মে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং পূর্ব্বজন্মের কার্য্যাবলী স্মরণপূর্ব্বক ধর্ম্মপথে মতি রাখিয়া পঞ্চম জন্মে পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাই সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দেবযান ও পিতৃযাণ

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তীকালে রচিত স্মৃতি, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে দেবযান ও পিতৃযাণ নামক রাস্তা দুইটির উল্লেখ দেখা যায়। সংস্কৃত 'যা' ধাতুর অর্থ 'গমন করা' এবং তাহা হইতে উৎপন্ন 'যান' শব্দটি রাস্তা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'দেবযান' শব্দের অর্থ 'দেবলোকে যাওয়ার রাস্তা' এবং 'পিতৃযাণ' শব্দের অর্থ 'পিতৃলোকে যাওয়ার রাস্তা', নাস্তিকেরা দেবলোক ও পিতৃলোকের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না বটে ; কিন্তু তাহাতে আস্তিক-দের কিছু যায় আসে না। বিচক্ষণ আস্তিকেরা জানেন—মূক ব্যক্তি যেমন কথা বলিতে, বধির ব্যক্তি কাহারও কথা শুনিতে এবং অন্ধ ব্যক্তি কোন কিছু দেখিতে পারে না, নাস্তিকেরাও ঠিক তেমনি দেবলোক ও পিতৃলোকের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হয়। মূক, বধির ও অন্ধ লোক যেমন তাহাদের এক একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়তার ফলে বাক্যোচ্চারণ প্রভৃতি এক একটি কর্ম্ম সাধনে অক্ষম হয়, নাস্তিকেরাও ঠিক তেমনি তাহাদের বুদ্ধিমান্দ্যের দোষে উল্লিখিত শাশ্বত স্বপ্রকাশ সত্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে। বেদাদি-শাস্ত্রে সর্ব্বত্র দেবযান ও পিতৃযাণের অস্তিত্বের উল্লেখ এবং তাহাদের নানাবিধ প্রাঞ্জল বর্ণনা থাকায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিরা উল্লিখিত দুইটি পথের অস্তিত্ব ও তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। আজও ভারতের সাধক ও জ্ঞানী লোকেরা উল্লিখিত দ্বিবিধ পন্থার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতঃ যজ্ঞ প্রভৃতি এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবার জন্য জনগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন। 'পিতৃযাণ' শব্দটি পিতৃলোকে যাওয়ার যে কোন রাস্তাকে না বুঝাইয়া একটা বিশেষ রাস্তাকে বুঝাইয়া থাকে, এই কারণে ইহাতে মূর্দ্ধন্য ণকার যুক্ত হয়।

বেদাদিশাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের সন্দেহ আছে, তাঁহারাও নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে এইগুলি তীক্ষ্ণধী ঋষিগণ কর্তৃক রচিত। সেই যুগে হিন্দুদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল ; সুতরাং তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য যেরূপ শব্দবিন্যাসের প্রয়োজন, তাদৃশ শব্দবিন্যাসের সাহায্যেই শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে দেবযান ও পিতৃযাণ সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনাচার, অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন দোষে

সম্প্রতি ভারতীয় আর্য্য-সন্তানগণের বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে; এবং তাহারই ফলে বেদাদি-শাস্ত্রের সুস্পষ্ট উক্তিগুলিও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন আর বুঝিতে পারেন না। এই কারণে বর্ত্তমানযুগের হিন্দুসন্তানদিগকে দেবযান ও পিতৃযাণের স্বরূপ প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। পাঠক-মহোদয়গণ জানেন—পোষ্টগ্র্যাজুয়েট্-ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদিগকে কোন বিষয় বুঝাইবার জন্য বিচক্ষণ অধ্যাপকেরা যে রকম ভাষা ব্যবহার করেন, কোন স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগকে সেই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য উল্লিখিত ভাষা উপযুক্ত নহে। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে বুঝাইবার জন্য ভাষা ও উদাহরণ প্রয়োগ প্রভৃতি নানা বিষয়ে আরও অনেক বেশী সরলতা সম্পাদনের প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমান যুগের হিন্দুসন্তান-দিগকে শাস্ত্রার্থ বুঝাইবার জন্যও তেমনি ভাষার প্রয়োগে এবং উদাহরণের বিন্যাসে অনেক বেশী সরলতা-সম্পাদন আবশ্যক। এই কার্য্যে আমি কতদূর সাফল্য লাভ করি, বিচক্ষণ পাঠক-পাঠিকাগণই তাহা বিচার করিবেন।

ঋগ্বেদীয় দশম মণ্ডলের বিভিন্ন মন্ত্রে পিতৃলোকে যাইবার রাস্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ দেখা যায়। ১০।২।৭ মন্ত্রে অগ্নিদেবতার স্তুতিপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"পিতৃলোকে যাইবার পথ কোনটি, তাহা তুমি জান। অতএব তুমি এমন উজ্জ্বল হও, যাহাতে ঐ পথ আলোকময় হইয়া উঠে।" উক্ত মণ্ডলের চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ সূক্ত দুইটির বিভিন্ন মন্ত্রে পিতৃলোক ও পিতৃগণ সম্বন্ধে আরও বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত দেবযান সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর উল্লেখ ঋগ্বেদের নানাস্থানে দেখা যায়।

যজুর্ব্বেদের শতপথব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে—মৃত্যুর পর কেহ কেহ 'দেবযান' নামক রাস্তা অবলম্বন করতঃ স্বর্গে গমন করেন এবং অন্যেরা 'পিতৃযাণ' নামক রাস্তায় পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকেন।

"স এষ দেবযানো বা পিতৃযাণো বা পন্থাঃ।" —শতপথব্রাহ্মণ ১।৯।৩।২

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণেও দেবযান ও পিতৃযাণের উল্লেখ রহিয়াছে এবং ঐ রাস্তা দুইটি অবলম্বনের অধিকারী কাহারা, এই বিষয়েও অনেক কথা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের তৃতীয়কাণ্ড, দশম-প্রপাঠকস্থিত একাদশ অনুবাকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সামবেদের ছান্দোগ্যোপনিষদ্ও দেবযান ও পিতৃযাণ সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে—পঞ্চম অধ্যায়ের দশম খণ্ডে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে।

বিভিন্ন স্মৃতিসংহিতায়, বিভিন্ন পুরাণে এবং মহাভারতেও দেবযান ও পিতৃযাণ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। স্মৃতি, পুরাণ ও মহাভারতে লিপিবদ্ধ উল্লিখিত কথাগুলি বস্তুতঃ বেদবাক্যেরই ব্যাখ্যা স্বরূপ; সুতরাং পৃথগ্‌ভাবে এইগুলি উদ্ধৃত করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

দেবযান ও পিতৃযাণের স্বরূপ

শ্রুতি বলেন—তত্ত্বজ্ঞানী লোকেরা তত্ত্বজ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়া 'দেবযান' নামক পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক পুনরাবৃত্তিরহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর পুণ্যাত্মা লোক পুনরায় জন্মমৃত্যুর অধীন হন না। এই দেবযান-নামক পথের স্বরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদে পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। উক্ত উপনিষদ্ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তত্ত্বজ্ঞানী লোকের আত্মা দেহ-ত্যাগের পরই অর্চ্চির মধ্যে প্রবিষ্ট হন। অতঃপর অর্চ্চিঃ হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, তথা হইতে উত্তরায়ণ নামক মাসগুলিতে, তথা হইতে সম্বৎসরে, সম্বৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রে, তথা হইতে বিদ্যুতে এবং বিদ্যুৎ হইতে বিরাট্-পুরুষে গমন করিয়া থাকেন। এই বিরাট্-পুরুষই উল্লিখিত আত্মাকে ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন করিয়া দেন। পার্থিব দেহ পরিত্যাগের পর ব্রহ্মে বিলীন হওয়া পর্য্যন্ত আত্মা যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া গমন করেন বলিয়া এখানে অভিহিত হইল, এই সকল পদার্থই শ্রুতিতে দেবযান নামে কথিত হইয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষায়—

"তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চ্চিষমভি-সম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙেতি মাসাংস্তান্ ॥১॥ মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽ-মানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি ॥২॥"

—অধ্যায় ৫; খণ্ড ১০ ॥

পিতৃযাণ বলিতে কি বুঝায়, তাহাও ছান্দোগ্যোপনিষদ্ স্পষ্টভাষায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলেন---দেবালয়-প্রতিষ্ঠাদি পুণ্যকর্ম্ম সাধনের ফলে যে পুণ্যার্জ্জন হয়, তাহার ফলে মৃত ব্যক্তির আত্মা দেহত্যাগের পরই ধূমে প্রবিষ্ট হন। অতঃপর ধূম হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষে এবং তথা হইতে দক্ষিণায়ন নামক মাসগুলিতে প্রবেশ করেন। এই সকল লোকের আত্মা সম্বৎসরে প্রবেশ না করিয়াই

সোজাসুজি পিতৃলোকে গমন করেন। পিতৃলোক হইতে এই আত্মা মহাকাশে প্রবিষ্ট হন এবং মহাকাশের মধ্য দিয়া চন্দ্রলোকে প্রবেশ করেন। পুণ্যার্জ্জিত কাল চন্দ্রলোকে বাস করিবার পর পুনরায় ইঁহাদের পতন ঘটে। চন্দ্রলোকে যাওয়ার সময় ইঁহারা যে পথে যান, ফিরিবার সময় ঠিক সেই পথে ফিরেন না। পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা চন্দ্রলোক হইতে স্খলিত হইয়া মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হন। আকাশ হইতে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমে ধূমের আকৃতি লাভ করেন। অতঃপর এই ধূমাবস্থা আরও ঘনীভূত হয় এবং ইঁহারা মেঘের সঙ্গে মিলিয়া যান। অতঃপর মেঘ হইতে বৃষ্টির সঙ্গে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ব্রীহি, যব, তিল, মাষ, বৃক্ষ, ফল প্রভৃতির আকার ধারণ করেন। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী যখন শস্য, ফল বা তৃণ, লতা, পাতা ইত্যাদি ভক্ষণ করে, তখন ঐ সকল আত্মাও ভক্ষণকারীর দেহে প্রবিষ্ট হন এবং কালে তাহাদের দেহে রেতঃরূপ ধারণ করতঃ সহবাসকালে ঐ জাতীয় নারীর, স্ত্রী-পশুর, বা পক্ষিণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হন। তথায় ভ্রূণরূপ ধারণপূর্ব্বক যথাকালে প্রাণি-শিশুরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

শেষোক্ত শ্রেণীর পুণ্যবান্ লোকদের আত্মা যে পথে চন্দ্রলোকে গমন করেন, শুধু সেই পথটির নামই কি পিতৃযাণ, অথবা চন্দ্রলোক হইতে যে পথে তাঁহারা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন, তাহাও পিতৃযাণ-পদবাচ্য—এই সম্বন্ধে ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে পরিষ্কার উল্লেখ দেখা যায় না। 'পিতৃযাণ' শব্দস্থিত 'যাণ' অংশটির ব্যুৎপত্তি চিন্তা করিলে আপাততঃ মনে হয়—পিতৃলোকে বা চন্দ্রলোকে যাওয়ার পথটিই 'পিতৃযাণ' নামে অভিহিত হইয়াছে, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নহে; কারণ যান ও প্রত্যাবর্ত্তন শব্দদুইটির অর্থে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। শ্রুতির ব্যাখ্যা-স্বরূপ মহাভারতগ্রন্থের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অংশে দেবযানও পিতৃযাণের যে বর্ণনা আছে, তাহা দেখিয়াও আপাততঃ মনে হয়—পিতৃলোকে (চন্দ্রলোকে) যাওয়ার রাস্তাটিই পিতৃযাণ নামে অভিহিত হইয়াছে, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথটি নহে।

পিতৃযাণের স্বরূপসম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥" ৮।২৫

এই শ্লোকে চন্দ্রলোক-গমনের রাস্তাটিরই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের রাস্তার নহে। দেবযানের বর্ণনাও গীতায় ৮।২৪ শ্লোকে রহিয়াছে, এবং দেবযানের যাত্রীরা যে পুনর্জ্জন্মরহিত এবং পিতৃযাণের যাত্রীরা পুনর্জ্জন্মের অধীন

তাহাও অষ্টম অধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোকে বলা হইয়াছে। ঐ সকল উক্তি ছান্দোগ্যোপনিষৎস্থিত উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিরই অনুরূপ ; সুতরাং এই প্রসঙ্গে গীতার শ্লোকগুলি আর উদ্ধৃত করিলাম না।

উল্লিখিত উক্তিসমূহ দেখিয়া স্বভাবতঃই সংশয় জন্মে—পিতৃলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথটি 'পিতৃযাণ' পদবাচ্য কি না? শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ পাঠ করিলে কিন্তু এই সংশয় আর থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে পিতৃযাণের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে জানা যায়—কেবল চন্দ্রলোকগমনের রাস্তাটিই নহে, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথটিও পিতৃযাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মার চন্দ্রলোক-ভ্রমণান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যে সকল বিভিন্ন স্থানে সে অবস্থান করে, তাহাদের সমষ্টিই পিতৃযাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায়—

"দ্রব্যসূক্ষ্মবিপাকশ্চ ধূমো রাত্রিরপক্ষয়ঃ।
অয়নং দক্ষিণং সোমো দর্শ-ঔষধি-বীরুধঃ।
অন্নং রেতঃ ইতি ক্ষ্মেশ! পিতৃযাণং পুনর্ভবঃ॥" ৭।১৫।৪০

ভাগবতের উল্লিখিত উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শুধু জীবাত্মাই নহে, সমগ্র পাঞ্চভৌতিক দেহের সূক্ষ্ম অংশও উল্লিখিত প্রকারে ধূম প্রভৃতির অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। মূলের 'দ্রব্যসূক্ষ্মবিপাকশ্চ' কথাটিতে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। এই সূক্ষ্ম দেহটিই সাঙ্খ্যশাস্ত্রে 'লিঙ্গদেহ' নামে অভিহিত হইয়াছে (সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্)। মৎপ্রণীত 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে শব্দের সূক্ষ্ম অবস্থার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিঙ্গদেহের স্বরূপ সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছি।

দেবযান ও পিতৃযাণের অবস্থিতিস্থল

দেবযান ও পিতৃযাণমার্গ কোথায় অবস্থিত, তাহাও বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—নাগবীথীর উত্তরে এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণে আকাশের যে বিস্তৃত অংশ রহিয়াছে, উহাই আকাশস্থ দেবযান নামে কথিত হয়। উত্তরায়ণকালে সূর্য্যদেব এই অংশ দিয়াই আকাশমার্গে বিচরণ করেন।

"নাগবীথ্যুত্তরং যচ্চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণম্।
উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানশ্চ স স্মৃতঃ॥" ২।৮।৮৫

উল্লিখিত প্রকারে আকাশস্থ দেবযানের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ পুনরায়

জানাইয়াছেন যে, জিতেন্দ্রিয়, সিদ্ধ, নিষ্পাপ ব্রহ্মচারীরা সন্তান লাভ না করিয়াও মৃত্যুকে জয় করেন। এইরূপ ৮৮০০০ ঊর্দ্ধরেতাঃ মুনি স্মরণাতীত কাল হইতে দেবযানমার্গে অবস্থিত আছেন, এবং মহাপ্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা এই স্থানেই থাকিবেন।

"তত্র তে বশিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ।
সন্ততিং যে জুগুপ্সন্তি তস্মান্মৃত্যুর্জ্জিতশ্চ তৈঃ॥
অষ্টাশীতি-সহস্রাণাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
উদক্পন্থানমর্য্যম্নঃ স্থিতা হ্যাভূতসংপ্লবম্॥"

—বিষ্ণুপুরাণ ২।৮।৮৬—৮৭

শাস্ত্র বলেন—যে সকল পুণ্যবান লোক দক্ষিণায়নকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহারা পিতৃযাণ নামক মার্গ অবলম্বন করতঃ চন্দ্রলোকে গমন করেন। এই পিতৃযাণের স্থান বিষ্ণুপুরাণে নিম্নলিখিত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা—আকাশের যে অংশ অগস্ত্যের উত্তরে এবং অজবীথীর দক্ষিণে অবস্থিত, তাহারই নাম পিতৃযাণ। এই অংশ দিয়া সূর্য্যদেব কোন কালেই গমন করেন না।

"উত্তরং যদগস্ত্যস্য হ্যজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্।
পিতৃযাণঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানরপথাদ্ বহিঃ॥"

—বিষ্ণুপুরাণ ২।৮।৮০

বিষ্ণুপুরাণ আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, যে সকল ঋষি অগ্নিহোত্রপরায়ণ, যাঁহারা নিয়ত বেদমন্ত্র পাঠ করেন এবং সুযোগ পাইলেই বেদোক্ত যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা আকাশস্থিত উল্লিখিত 'পিতৃযাণ' নামক অংশে অবস্থান করেন। ইঁহারা 'পিতৃগণ' নামে অভিহিত হন এবং বিশ্বসৃষ্টি করিয়া থাকেন। এক এক সময়ে যখন পৃথিবীধ্বংসাদি কারণে বেদ বিলুপ্ত হন, তখন ইঁহারাই পুনরায় নূতন জগৎ সৃষ্টি করতঃ বেদকে পুনরায় উদ্ধারপূর্ব্বক নবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের উক্তি যথা—

"তত্রাসতে মহাত্মান ঋষয়ো যেঽগ্নিহোত্রিণঃ।
ভূতারম্ভকৃতং ব্রহ্ম শংসন্ত ঋত্বিগুদ্যতাঃ॥
প্রারভন্তে তু যে লোকাংস্তেষাং পন্থাঃ স দক্ষিণঃ।
চলিতস্তে পুনর্ব্রহ্ম স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে॥" ২।৮।৮১—৮২

উল্লিখিত দেবযান ও পিতৃযাণ নামক মার্গদ্বয় অবলম্বন করিয়া পরলোকগামী

লোকের আত্মা দুইটি বিভিন্ন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবান্ উক্ত দ্বিবিধ গতিকে যথাক্রমে শুক্লগতি ও কৃষ্ণগতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। অর্জ্জুনের কাছে শ্রীভগবান্ স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়াছেন যে, যাঁহারা উল্লিখিত শুক্লগতি লাভ করেন, তাঁহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণগতি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গীতার ভাষায়—

"শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥" ৮ | ২৬

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। ২।৮।৮০ শ্লোকে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—পিতৃযাণ নামক পথটি অজবীথীর দক্ষিণে এবং বৈশ্বানর-পথের বাহিরে (পিতৃযাণঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানরপথাদ্ বহিঃ)। স্বভাবতঃই মনে হয়—সূর্য্য অর্থেই বৈশ্বানর শব্দটি এখানে গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ দক্ষিণায়নকালে সূর্য্য যে পথে গমনাগমন করেন, পিতৃযাণ নামক পথটি তাহা হইতে কিছুটা দূরবর্ত্তী। অথচ ২।৮।৮৪ শ্লোকে বিষ্ণুপুরাণ বলিলেন—পিতৃযাণস্থ জীবাত্মগণ চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যের দক্ষিণমার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন (সবিতুর্দক্ষিণং মার্গং স্থিতা হ্যাচন্দ্র-তারকম্)। আপাতদৃষ্টিতে উল্লিখিত উক্তি দুইটি পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়; সুতরাং ইহাদের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা উত্তমরূপে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

দেবযানের স্থান নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ যে 'নাগবীথী' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ অনেকেরই বোধগম্য হইবে না; সুতরাং এই সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। বিষ্ণুপুরাণের টীকায় (২।৮।৭৯ শ্লোকের) শ্রীধরস্বামী এই প্রসঙ্গে একটি শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া জানাইয়াছেন যে, আকাশস্থিত অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকা নামক নক্ষত্রত্রয়ের অবস্থিতিস্থলই নাগবীথী নামে কথিত হয় (অশ্বিনী-কৃত্তিকা-যাম্যা নাগবীথীতি শব্দিতা)। এই রাস্তাটি সাপের গমনপথের ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে বলিয়াই ইহার এই নাম [নাগস্যেব বীথী (পন্থাঃ) =নাগবীথী]।

অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকা নক্ষত্র আকাশের উত্তরদিকে পূর্ব্বাংশে অবস্থান করেন। রাত্রিকালে আকাশের যে অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার উত্তরাংশে সমগ্র অণ্ডকটাহের প্রায় এক নবমাংশ লইয়া এই নাগবীথী অবস্থিত। বিশ্বকোষ অভিধান বলেন—'দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্যম মার্গের প্রত্যেক মার্গে তিনটি করিয়া বীথী হয়।'

এইভাবে মোট নয়টি বীথী আছে। নাগবীথী তাহাদেরই অন্যতম। সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রায় সকলেরই সুবিদিত। সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণদিকে এই নাগবীথী বিদ্যমান। উত্তরায়ণকালে সূর্য্যদেব আকাশের যে অংশ দিয়া গমন করেন, তাহার উত্তরদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং দক্ষিণদিকে এই নাগবীথী অবস্থিত। সুতরাং সহজ কথায় বলা যাইতে পারে যে, 'দেবযানমার্গ' বলিতে আকাশের সেই অংশটুকুকেই বুঝায়, যাহা অবলম্বন করিয়া সূর্য্যদেব উত্তরায়ণকালে আকাশমার্গে বিচরণ করেন। তবে শুধু সূর্য্যের গমনপথটিই 'দেবযান' নামে অভিহিত হয় না, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অংশও দেবযান নামে কথিত হইয়া থাকে। এই মার্গ অবলম্বন করিয়া পুণ্যবান্ লোকদের আত্মা প্রথমে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন, এবং অতঃপর ক্রমে সপ্তর্ষিমণ্ডল পরিভ্রমণান্তে ধ্রুবলোক প্রভৃতিতে গিয়া স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন। সূর্য্যের গতিপথ বলিতে আকাশস্থ সেই পথটিকেই বুঝিতে হইবে—যাহা অবলম্বন করিয়া আপাতদৃষ্টিতে সূর্য্য চলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ পৃথিবীই যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং সূর্য্য সর্ব্বদা আকাশে নিজ গতিপথে আবর্ত্তিত হইয়া পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগুলিতে নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়া তাহাদের সহিত দ্রুতবেগে নিজ কক্ষপথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, এই বিজ্ঞানসম্মত সত্য শাস্ত্রকারগণের সুবিদিত ছিল। সূর্য্যের উদয় ও অস্ত বলিতে কি বুঝায়—ইহা বুঝাইবার জন্য তাই বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

"নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ॥" ২ | ৮ | ১৫

[সূর্য্য সকল সময়েই আকাশে অবস্থিত আছেন ; সুতরাং বস্তুতঃ তাঁহার উদয় বা অস্তগমন হয় না। মানুষ যে সময়ে সূর্য্যকে দেখিতে পায়, তখনই বলে 'সূর্য্যের উদয় হইয়াছে' ; আর যখন তাহারা সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তখনই বলে 'সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন'।]

পিতৃযাণমার্গের বর্ণনাকালে বিষ্ণুপুরাণ অগস্ত্য, অজবীথী এবং বৈশ্বানরপথ এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাদের পরিচয় সম্বন্ধেও দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। অগস্ত্য একটি নক্ষত্রের নাম। এই নক্ষত্রটি দক্ষিণদিকে উদিত হয় বলিয়া দক্ষিণদিকের এক নাম অগস্ত্যদিক্। অতি প্রাচীনকালে মহামুনি অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম-পূর্ব্বক আর্য্যসভ্যতা প্রচারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-ভারতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি আর উত্তর-ভারতে ফিরিয়া আসেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই দক্ষিণদিক্‌স্থিত উল্লিখিত নক্ষত্রটিকে 'অগস্ত্য' নামে

অভিহিত করা হইয়াছে। মহাকবি মাঘও তাঁহার 'শিশুপালবধ' মহাকাব্যে (৩।১) দক্ষিণদিক্‌কে অগস্ত্যদিক্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। বায়ুপুরাণ বলেন— 'লোকালোক' পর্ব্বতের চারিদিকে যে সকল দিক্‌পাল অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের উপর দিয়া অগস্ত্যনক্ষত্র অতিবেগে বিচরণ করিয়া থাকেন। নাগবীথীর দক্ষিণে, লোকালোক-পর্ব্বতের উত্তরে এবং বৈশ্বানরপথের বহির্ভাগে এই লোকসন্তারক অগস্ত্য অবস্থিত। ইঁহার গতিবিশেষদ্বারাও দিবারাত্রির ক্ষয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বায়ুপুরাণের ভাষায়—

"লোকালোকে স্থিতা যে চ লোকপালাশ্চতুর্দ্দিশম্।
অগস্ত্যশ্চরতে তেষামুপরিষ্টাজ্জবেন তু॥
ভজন্নসাবহোরাত্রমেবং গতিবিশেষণৈঃ।
দক্ষিণে নাগবীথ্যায়া লোকালোকস্য চোত্তরম্।
লোকসন্তারকো হ্যেষ বৈশ্বানরপথাদ্ বহিঃ॥" ৫০। ১৫৪—১৫৬

অজবীথী বলিতে ছায়াপথকে বুঝায়। এই ছায়াপথ যে আকাশের মধ্যভাগে উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান, ইহা সকলেই জানেন। ইহাকে 'যমনালা'ও বলা হয়। অজা (জন্মরহিতা, অর্থাৎ নিত্যা) যে বীথী (রাস্তা) তাহাই অজবীথী—এই অর্থেই সম্ভবতঃ 'অজবীথী' নামটি রাখা হইয়াছে। 'বাচস্পত্য' অভিধান বলেন—"অজেন ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা বীথী পদম্, ইতি অজবীথী"। ছায়াপথ উত্তরদক্ষিণে সোজাসুজি লম্বমান নহে। তাহার একপ্রান্ত পূর্ব্বদিকে, অপরপ্রান্ত পশ্চিমদিকে হেলিয়া রহিয়াছে। আকাশের যে অংশ ছায়াপথের দক্ষিণাংশ ও অগস্ত্য নক্ষত্রের উত্তরাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহারই নাম পিতৃযাণ। দক্ষিণায়ন-কালে সূর্য্যদেব যে পথ অবলম্বন করিয়া আকাশে বিচরণ করেন, পিতৃযাণ পথটি তাহার দক্ষিণদিকে অবস্থিত—তাহাই 'বৈশ্বানরপথাদ্ বহিঃ' কথাটির তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, 'দেবযান' মার্গ যত বিস্তৃত, পিতৃযাণ মার্গ তত বিস্তৃত নহে। ইহা সূর্য্য হইতে দক্ষিণদিকে বেশ কিছু দূরে অবস্থিত বলিয়া সূর্য্যের আকর্ষণ এখানে তেমন কার্য্যকরী হয় না। চন্দ্র, ছায়াপথ ও অগস্ত্য-নক্ষত্রের আকর্ষণ পিতৃযাণাবলম্বী জীবাত্মগণকে সূর্য্যের বিপরীতদিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে বলিয়াই এই পথের পথিকদের পক্ষে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। এই কারণেই মহাত্মা ভীষ্ম পিতৃযাণের প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উত্তরায়ণের আগমনকাল পর্য্যন্ত জীবনধারণ করিয়াছিলেন।

দেবযান ও পিতৃযাণের পথিক হওয়ার যোগ্যতা

সকলেই জানেন, পরম ধার্ম্মিক কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দক্ষিণায়নকালে কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে ভীষণভাবে আহত হইয়া পড়েন। মহাবীর অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তীক্ষাগ্রবাণ তাঁহার সর্ব্বশরীরে এমনভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল যে রথ হইতে পতিত হওয়ার পরও তাঁহার দেহ ভূমি স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভীষ্ম পিতার বরে ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিয়াছিলেন। এইভাবে শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া যখন তিনি ক্ষতস্থানগুলিতে দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন তখনও তিনি একমাত্র দক্ষিণায়ন-মধ্যে মৃত্যুবরণ করিবেন না বলিয়া ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতঃ আরও প্রায় ৩ মাস জীবিত রহিয়াছিলেন। উত্তরায়ণ আরম্ভ হওয়ার পর তবেই তিনি দেহত্যাগ করতঃ দেবযানমার্গ অবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

ভীষ্ম ছিলেন আজীবন ব্রহ্মচারী। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি—সিদ্ধ ঋষি এবং জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারিগণ দেবযানমার্গ অবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে দেবযানমার্গ অবলম্বন করা অসম্ভব বা সুকঠিন বলিয়াই মহামতি ভীষ্ম দীর্ঘ ৩ মাস কাল শরাঘাতজনিত ক্ষতের ক্লেশ স্বেচ্ছায় সহ্য করিয়াছিলেন।

সকল মানুষই ভগবানের সৃষ্ট; সুতরাং বিনা কারণে তাঁহাদের বিভিন্নপ্রকার গতি হইতে পারে না। কি কি কারণে মানুষ শুক্লগতি বা দেবযান নামক মার্গ লাভের অধিকারী হন, তাহা বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের যে শ্রুতিটি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানী লোকেরা এবং যে সকল তপস্বী মুনিব্রত ধারণপূর্ব্বক অরণ্যে গিয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারাই দেবযান-নামক পথে গমন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারেন নাই, এবং মুনিব্রতগ্রহণপূর্ব্বক তপস্যাও করেন নাই, তাঁহারা যদি জনহিতার্থে দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, রাস্তা-নির্ম্মাণ, জলাশয়-খনন, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা এবং অনুরূপ অন্যান্য সৎকার্য্য করেন, তাহা হইলে মৃত্যুর পর পিতৃযাণ নামক রাস্তা অবলম্বন করিয়া পিতৃলোকে গমন করিতে পারেন। দেবযান-মার্গে প্রস্থিত আত্মা যেমন পুনর্জ্জন্ম গ্রহণে বাধ্য হন না, পিতৃযাণ-পথে প্রস্থিত আত্মা সেইরকম নহেন। শেষোক্ত পথের পথিকদিগকে পুণ্যার্জ্জিত কাল সুখময় পিতৃলোকে বাস করিবার পর পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—যে সকল মানুষ কদাপি লোভের বশীভূত হন না, ইচ্ছা ও দ্বেষকে মনে স্থান দেন না, সর্ব্বতোভাবে মৈথুন বর্জ্জন করেন, অন্য প্রাণিদিগকে এতাদৃশ কার্য্যে সাহায্য বা প্ররোচনা দান করেন না, এবং কটু বা অশ্লীলবাক্য উচ্চারণে সর্ব্বদা বিরত থাকেন, তাঁহারা উল্লিখিত কামনা-পরিত্যাগাদি গুণের ফলে অমৃতত্ব (জন্মমৃত্যুরহিতত্ব) লাভে সমর্থ হন। যতদিন পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক প্রলয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে বিধ্বস্ত না করে, ততদিন পর্য্যন্ত ইঁহারা জন্মমৃত্যু-রহিত হইয়া দেবযান-মার্গের চরম লক্ষ্য সুখময় পুণ্যলোক লাভ করতঃ পরম আনন্দে তথায় বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরাণের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, দেবযানমার্গগামী লোকেরাও প্রাকৃতিক প্রলয়ের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই কথাগুলি বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে নিম্নলিখিত ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। যথা—

"তেঽসংপ্রয়োগাল্লোভস্য মৈথুনস্য চ বর্জ্জনাৎ।
ইচ্ছাদ্বেষাপ্রবৃত্ত্যা চ ভূতারম্ভ-বিবর্জ্জনাৎ॥
পুনশ্চাকামসংযোগাচ্ছব্দাদের্দ্দোষদর্শনাৎ।
ইত্যেভিঃ কারণৈঃ শুদ্ধাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে॥
আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাব্যতে।
ত্রৈলোক্যস্থিতিকালোঽয়মপুনর্ম্মার উচ্যতে॥"

২।৮।৮৮—৯০

কৃষ্ণগতি বা পিতৃযাণমার্গ অবলম্বনের হেতু সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ নিম্নলিখিত কথা-গুলি বলিয়াছেন। —যাঁহারা গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক সন্তানলাভে সমর্থ হন, শাস্ত্রবিহিত তপস্যা ও সদাচার ইত্যাদি যথাবিধি পালন করেন এবং যাঁহারা যথা-বিধি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাদৃশ লোকেরাই পিতৃযাণমার্গে গমন করিয়া থাকেন। ইঁহারা অতি প্রাচীনকালে যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষরূপে জন্মিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে সেইসকল লোকের সন্তানরূপেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যতদিন ইঁহারা উল্লিখিত গুণগুলির অধিকারী থাকিবেন, ততদিন এইভাবেই পিতৃযাণমার্গস্থ স্বর্গ বা পিতৃলোক লাভ এবং পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতঃ ইঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ এইরূপ জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবেন, ততদিন ইঁহারা ব্রতপরায়ণ হইয়া সূর্য্যের দক্ষিণ-মার্গরূপ পিতৃযাণে উল্লিখিতভাবে বাস করিতে থাকিবেন। বিষ্ণুপুরাণের ভাষায়—

"সন্তত্যা তপসা চৈব মর্য্যাদাভিঃ শ্রুতেন চ।
জায়মানাস্তু পূর্ব্বে চ পশ্চিমানাং গৃহেষু বৈ॥
পশ্চিমাশ্চৈব পূর্ব্বেষাং জায়তে নিধনেষ্বিহ।
এবমাবর্ত্তমানাস্তে তিষ্ঠন্তি নিয়তব্রতাঃ।
সবিতুর্দ্দক্ষিণং মার্গং শ্রিতা হ্যাচন্দ্রতারকম্॥"

২ | ৮ | ৮৩—৮৪

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥" ৮ | ২৪

অর্থাৎ দেবযান বলিতে বুঝায়—অগ্নি, তেজঃ, দিবস, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণের ৬ মাস। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর এই পথে গমন করিয়া ব্রহ্মে বিলীন হন।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা যদি তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবে দেবযানমার্গ লাভের অধিকারী হন, তাহা হইলে কুরুপিতামহ ভীষ্মের মৃত্যুর জন্য উত্তরায়ণ-সমাগম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হইল কেন? দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও তো নিজ পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবযানমার্গ অবলম্বন করিতে পারিতেন? এই সংশয়ের উত্তরে দুইটি কথা বলা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কালের প্রভাব অনেক সময় ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকেও ব্যাহত করে দেখিয়া ভীষ্ম স্বেচ্ছায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন। একটা দৃষ্টান্তদ্বারা কথাটাকে পরিষ্কার করিতেছি। মনে করুন, আপনি কলিকাতা হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে দিল্লী যাওয়ার জন্য একখানি রেলের টিকেট অগ্রিম ক্রয় করিয়া রাখিলেন। ইহাদ্বারা ঐদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিল্লীর ট্রেনে যাত্রা করিবার অধিকার আপনার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু সেই তারিখে যদি রেল-কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিয়া বসেন এবং কলিকাতা হইতে কোন ট্রেনই ছাড়া সম্ভব না হয়, তবে কি আপনার সেই ন্যায়সঙ্গত অধিকার কাজে লাগিবে? ভাবিয়া দেখুন—ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকা সত্ত্বেও সেইদিন আপনার দিল্লী যাওয়া হইবে না। এই কারণে বুদ্ধিমান লোকেরা ঐরূপ ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা দেখিলে সাধারণতঃ তাদৃশ সময়ে কোন অগ্রিম টিকেট ক্রয় করেন না। মহামতি ভীষ্মও সম্ভবতঃ এইরূপ কারণেই অনিশ্চিত অবস্থায় চলিবার ঝুঁকি না লইয়া নিশ্চিত অবস্থা লাভের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণায়নকালে যাঁহাদের মৃত্যু ঘটে তাঁহারা স্বভাবগুণে দেবযানের অধিকারী হইলেও কালপ্রভাববশতঃ দেবযানমার্গে প্রবেশের জন্য তাঁহাদিগকে প্রবল বিঘ্নসমূহ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এইরূপ বিঘ্ন অতিক্রম করা সকলের পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে; তাই সূক্ষ্মদর্শী ভীষ্ম বিঘ্নরহিত পথে দেবযানের পথিক হইবার জন্য উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

কিভাবে জীব দেবযান ও পিতৃযাণে প্রবেশ করে

হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুসারে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মানুষের শবগুলিকে অগ্নিতে ভস্মসাৎ করা হয়। যতক্ষণ পাঞ্চভৌতিক দেহটি বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ এই দেহের মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া দেহনির্গত জীবাত্মা এই দেহটীরই চারিপার্শ্বে ঘুরাফেরা করিতে থাকে। এইরূপ অবস্থা জীবাত্মার উর্দ্ধগতির প্রতিবন্ধক। দেহটি ভস্মীভূত হইয়া গেলে তখন আর দেহের আকর্ষণ না থাকায় জীবাত্মা চিতাগ্নি অবলম্বনপূর্ব্বক তেজোময় রূপ ধারণ করেন। চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে এই আত্মা আলোর আকার ধারণপূর্ব্বক দিবাভাগে সূর্য্যালোক এবং রাত্রিতে জোৎস্নার মধ্যে তত্তদ্রূপে বিচরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকেন। একদিকে স্বকর্ম্মার্জ্জিত পুণ্য জীবাত্মাকে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করে, আবার অন্যদিকে ইহজগতের মমতা তাঁহাকে পৃথিবীর দিকে টানিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই জীবাত্মার চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়, এবং তিনি কখনও উপরে উঠিয়া কখনও বা নীচে নামিয়া অনবরত চলাফেরা করিতে থাকেন। এইরূপ মুক্তি-প্রতিবন্ধক অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য তখন শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াদ্বারা উক্ত জীবাত্মার অন্তরে সত্ত্বগুণের আধিক্য সম্পাদন করিতে হয়। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে শ্রাদ্ধের বিধান রহিয়াছে।

যে সময়ে জীবাত্মা দিবসে সূর্য্যালোকরূপে এবং রাত্রিতে জ্যোৎস্নারূপে বিচরণ করতঃ উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি সূর্য্যের আকর্ষণে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। এইভাবে পৃথিবী হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়া জীবাত্মা ক্রমে চন্দ্রের আকর্ষণও অতিক্রম করেন, এবং শুধু সূর্য্যের দিকে ধাবিত হইতে থাকেন। ক্রমে তিনি সূর্য্যমণ্ডলে পৌঁছিয়া সূর্য্যলোকের অধিবাসী হন এবং তখন মানুষের এক বৎসরে তাঁহার এক অহোরাত্র হইতে থাকে। ইহাই জীবাত্মার সম্বৎসরত্ব-প্রাপ্তি। এই দেবযানমার্গ অবলম্বন করিয়া যে সকল জীবাত্মা গমন

করেন, তাঁহারা পৃথিবী হইতে উত্তরায়ণ-মার্গ (আকাশের উত্তরভাগ) অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ সূর্য্যের দিকে ধাবিত হইয়া থাকেন। উত্তরায়ণের ৬ মাস সূর্য্য দেবযানমার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন বলিয়া এই সময়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা সূর্য্যের স্বাভাবিক আকর্ষণে স্বভাবতঃ দেবযানের দিকেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত জীবাত্মাকে সাধারণতঃ তিন দিক্ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য এবং ছায়াপথ আকর্ষণ করিতে থাকে। উত্তরায়ণমার্গ বা দেবযানস্থিত আত্মা সাক্ষাদ্ভাবে সূর্য্যের আকর্ষণ লাভ করায় চন্দ্র বা ছায়াপথের আকর্ষণ তাহাকে টানিয়া নিতে পারে না। এইরূপ জীবাত্মা স্বর্গদ্বারস্বরূপ সৌরমণ্ডলেই গিয়া তেজোময় দেহ ধারণ করেন। অবশ্য অতঃপর সপ্তর্ষিলোক এবং ধ্রুবলোকের দিকেও তাঁহার পুণ্যানুযায়ী গতি হয়। যন্ত্রণাদায়ক যমনালা বা ছায়াপথ এবং পুনরুৎপত্তিদায়ক চন্দ্র তাহাকে আকর্ষণ করিতে না পারায় ঈদৃশ আত্মা পরমানন্দময় স্বর্গলোকেই বিরাজ করিতে থাকেন। এই কারণেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও উত্তরায়ণকালের আগমন পর্য্যন্ত শরশয্যায় শায়িত থাকিয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন।

সূর্য্যকে স্বর্গদ্বাররূপে বর্ণনা করিয়া শাস্ত্র জানাইয়াছেন যে দেবযানমার্গাশ্রয়ী জীবাত্মার গতি সূর্য্য পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ নহে। পুণ্যানুযায়ী তিনি মহর্লোক, জনলোক, ঋষিলোক, ব্রহ্মলোক, ধ্রুবলোক প্রভৃতিতেও গমন করিয়া থাকেন। তবে যে লোকেই যান না কেন, সূর্য্যলোক অবলম্বন করিয়াই তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হয়। যে সকল মহাত্মা পরিব্রাজকবৃত্তি অবলম্বন বা নিয়তযোগাভ্যাস করেন এবং যাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধে সম্মুখসমরে নিহত হন, তাঁহারাও সূর্য্যমণ্ডলের পথে বিবিধ স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড়্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখহতঃ ॥"

যে সকল লোক জীবনে বহু পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, অথচ সংসারের মায়া সম্পূর্ণরূপে কাটাইতে পারেন নাই, তাঁহাদের আত্মা দেহত্যাগের পর দেহের চারিপাশে অতি নিকটে থাকিয়া ঘুরাফিরা করিতে থাকে। মৃতদেহ ভস্মীভূত হওয়ার সময় এই সকল লোকের আত্মাও চিতানলে প্রবেশ করে; কিন্তু বিষয়-বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করার ফলে অগ্নিসারূপ্যলাভে অসমর্থ হইয়া ধূমের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে। ক্রমে ধূমের আকার ধারণ পূর্ব্বক এই শ্রেণীর আত্মা পৃথিবী-পার্শ্বস্থ আকাশে বিচরণ করিতে থাকে। এইরূপ আত্মা সূর্য্যতাপ সহ্য করিতে

পারে না বলিয়া দিবাভাগে বৃক্ষাদির ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং রাত্রিকালে অন্ধকারের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। শুক্লপক্ষের জোৎস্না ইহারা সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং শুক্লপক্ষের রাত্রির অন্ধকার অংশে এবং কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারেই ইহারা ঘুরাফিরা করিতে থাকে। ইহারা সকল সময় সূর্য্যালোকের সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়া চলে বলিয়া সূর্য্য ইহাদিগকে আকর্ষণ করেন না। রাত্রিকালেই বেশী চলাফেরা করায় এবং সূর্য্য হইতে দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলায় ইহারা স্বভাবতঃ আকাশের দক্ষিণভাগ ধরিয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। দক্ষিণায়নের ৬ মাস কাল সূর্য্য আকাশের যে অংশে থাকেন, সেই অংশ অবলম্বনেই হয় ইহাদের ঊর্দ্ধগতি। সূর্য্যের আকর্ষণের বিষয়ীভূত না হওয়ায় ইহারা সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে সূর্য্যের দিকে ধাবিত হয় না; এবং ফলে দেবযানমার্গগামী জীবাত্মাদের মত মানুষের এক বৎসরে ইহাদের একদিন হয় না। এই কারণেই শাস্ত্র বলেন--পিতৃযাণগামী আত্মারা সম্বৎসরে প্রবেশ করেন না। ক্রমে ইহারা চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণশক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণকেই 'পিতৃলোক' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। চন্দ্রের আকর্ষণে উল্লিখিত শ্রেণীর জীবাত্মগণ মহাকাশের মধ্য দিয়া চন্দ্রের দিকে ধাবিত হন এবং ক্রমে চন্দ্র-লোকে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় বসবাস করিতে থাকেন। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জানেন—মানুষের ১৫ দিন চন্দ্রের অর্দ্ধেক অংশ অন্ধকার এবং বাকী অর্দ্ধেক অংশ আলোকিত থাকে; আবার পরবর্ত্তী ১৫ দিন উল্লিখিত অংশ দুইটি ঠিক বিপরীত অবস্থা ধারণ করে। এই কারণেই মানুষের ১৫ দিনে চন্দ্রলোকের একদিন এবং মানুষের ১৫ দিনে তাহার এক রাত্রি হয়। একই কারণে মানুষের ১৫ দিনে পিতৃলোকের একদিন এবং মানুষের ১৫ দিনে তাহার এক রাত্রি হয় বলিয়া শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে উক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন--যতদিন আকাশে চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততদিন দেবলোক এবং পিতৃলোকেরও অস্তিত্ব থাকিবে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের ধ্বংস হওয়ার সময় সূর্য্যলোকবাসী দেবত্বপ্রাপ্ত জীবগণের এবং চন্দ্রলোকবাসী পিতৃত্বপ্রাপ্ত জীবগণেরও ধ্বংস ঘটিবে। মানুষের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র হয়, এইরূপ বলিয়া এবং দেবযানগামী জীবাত্মগণ সম্বৎসরে প্রবেশ করেন, এইরূপ মন্তব্য করিয়া শাস্ত্র জানাইয়াছেন যে, দেবযানাবলম্বী জীবাত্মগণ দেবত্বলাভ করতঃ উন্নততর গতিলাভের পূর্ব্বপর্য্যন্ত সূর্য্যমণ্ডলে বাস করিয়া থাকেন। পিতৃযাণগামী জীবাত্মগণ যে পিতৃত্বপ্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রলোকে বাস করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

চন্দ্রই পিতৃলোক কি না?

বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে পিতৃলোকের যে সকল বর্ণনা দেখা যায়, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্রকেই আর্য্য ঋষিরা পিতৃলোক নামে অভিহিত করিয়াছেন। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব সম্বন্ধে কোন কোন পুরাণে ভিন্ন প্রকার উক্তি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন—যে চন্দ্রকে পিতৃলোক নামে অভিহিত করা হইয়াছে তাহা পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র নহে; অন্য কোন চন্দ্র। সম্প্রতি বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পৃথিবী হইতে কোন কোন বৈজ্ঞানিক রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রে গিয়া সেখানকার মাটিও লইয়া আসিয়াছেন। চন্দ্রে কোন জীবিত প্রাণী নাই বলিয়াই বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। চন্দ্র হইতে যে মৃত্তিকা আনয়ন করা হইয়াছে, তাহার রং কাল। ভারতীয় এবং অন্যান্য দেশের কবিগণ চন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল চিত্তাকর্ষক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে চন্দ্রকে সুন্দর এবং কোমল আলোকের আধার প্রভৃতি বিশেষণেই বিশেষিত করা হইয়াছে। এই কারণে কিছুসংখ্যক লোক সম্প্রতি মনে করেন যে, চন্দ্র সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকদের, বিশেষতঃ ভারতীয় জ্ঞানীদিগের কোনরূপ যথার্থজ্ঞান পূর্ব্বে ছিল না। কলিকাতার কোন কোন দৈনিক সংবাদপত্রে এই বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগকে বিদ্রূপ করিয়াও কেহ কেহ নানারূপ মন্তব্য করিয়াছেন। অতএব, চন্দ্রই যথার্থ পিতৃলোক কি না, এই সম্বন্ধে কিছু বাস্তব আলোচনা আবশ্যক।

শাস্ত্রকারদিগকে কটাক্ষ করিয়া যাঁহারা সংবাদপত্রসমূহে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রগ্রন্থগুলি দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কবির কল্পনা এবং তত্ত্বকথা এক বস্তু নহে। সাহিত্যশাস্ত্রে ছোট বস্তুকে বড় করিয়া দেখাইলে, তাহা যদি চিত্তাকর্ষক হয়, তবে এইরূপ অতিরঞ্জন অতিশয়োক্তি অলঙ্কার নামে অভিহিত এবং প্রশংসিত হইয়া থাকে। কোন সুন্দর বস্তুকে অধিকতর সুন্দররূপে প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কবিরা নানাপ্রকার রূপক ও উপমানের সাহায্য গ্রহণ করেন। মুখপদ্ম বা পদ্মের মত সুন্দর মুখ বলিলে মুখটি যে অধিকতর সুন্দর ইহাই বুঝা যায়। এই রূপক বা উপমানটি দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন—কবি মুখটির মত পদ্মটিকেও রক্ত, মাংস ও নেত্রাদিবিশিষ্ট মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির উল্লিখিত প্রকার অজ্ঞতা হাস্যোদ্দীপকই হইবে। কবিরা রাত্রিকালে চন্দ্রকে যেমন দেখেন, তাহা চিন্তা করিয়াই মুখচন্দ্র প্রভৃতি রূপক বা চন্দ্রের মত সুন্দর মুখ প্রভৃতি উপমা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের

অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে; সৌন্দর্য্যবোধেরই প্রমাপক। কবিরা উল্লিখিত-প্রকার বর্ণনা করিবার কালে পদ্ম বা চন্দ্রের স্বরূপ প্রকাশ করেন না; মুখের সৌন্দর্যাই প্রকাশ করিয়া থাকেন।

চন্দ্র-সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের জ্ঞান কি প্রকার ছিল, তাহা জানিতে হইলে জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে হইবে। এই সকল জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গ্রন্থেই চন্দ্র, সূর্য্য ও বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। যাঁহারা বলেন—চন্দ্রের মাটি সোনার মত বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ মনে করিতেন, তাঁহাদের ভ্রম অপনোদনের জন্য বিখ্যাত জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গ্রন্থ গোলাধ্যায় হইতে চন্দ্রের স্বরূপ-বর্ণনাত্মক একটি শ্লোক প্রদর্শন করিতেছি। যথা—

"তরণি-কিরণসঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ডো
দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদিশি বালা-কুন্তল-শ্যামলশ্রী-
র্ঘট ইব নিজমূর্ত্তিশ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ ॥"—গোলাধ্যায়

[অমৃতকিরণবর্ষী গোলাকার চন্দ্র তাহার দেহের যে অংশে যখন সূর্য্যকিরণ লাভ করে, তখন সেই অংশেই উক্ত সূর্য্যকিরণেরদ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া সেই সূর্য্যকিরণকেই কোমলরূপে প্রতিফলিত করিয়া থাকে। চন্দ্রের দেহের যে অংশে সূর্য্যকিরণ পড়ে না, তাহার রঙ বালিকার কেশের মত কাল। প্রদীপের সম্মুখস্থিত ঘটের সম্মুখ-ভাগ যেমন আলোকিত হয় এবং পশ্চাদ্ভাগে তাহারই ছায়া পতিত হইয়া থাকে, চন্দ্রের সূর্য্যাভিমুখী অংশ এবং তাহার বিপরীত অংশও ঠিক তেমনি।] পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িলে যে চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহাও জ্যোতিঃশাস্ত্রে স্পষ্টভাষায় বলা হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু শাস্ত্রকারেরা চন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে যে যথার্থসংবাদই রাখিতেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

চন্দ্রে কোন পার্থিব-দেহধারী প্রাণী থাকুন বা না থাকুন, তাহাদ্বারা তথায় পিতৃ-লোকের স্থিতি বা অস্থিতি প্রমাণিত হয় না। পিতৃগণ সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়াই অবস্থান করেন। তাঁহারা যখন এই পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ান, তখনও কোন পার্থিব-দেহধারী প্রাণীই তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। তাঁহারা যদি অলৌকিক শক্তিবলে ছায়ামূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কাহাকেও দর্শন দান করেন, কেবলমাত্র তাহা হইলেই সেই ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দেখিতে পারে; অন্যথা নহে। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সাধনাশক্তিবলে দিব্যদৃষ্টি লাভ করতঃ চন্দ্রলোকে পিতৃগণের অবস্থিতি এবং পৃথিবী

হইতে তথায় তাঁহাদের গমনাগমনের পথ প্রত্যক্ষ করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ; সুতরাং ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

শুধু চন্দ্রলোকে অবস্থানকালেই নহে ; দেহত্যাগের পর হইতে সকল সময়েই জীবাত্মগণ পুনরায় পার্থিব দেহ ধারণ না করা পর্য্যন্ত পার্থিবদেহধারীদের নিকট অদৃশ্য থাকেন। এই সময়ে তাঁহাদের পার্থিব দেহ না থাকায় কোনরূপ পার্থিব খাদ্যেরও প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে বটে ; কিন্তু স্বেচ্ছায় তাহা নিবারণ করিবার শক্তি তখন তাঁহাদের থাকে না। এই কারণেই শ্রাদ্ধ ও তর্পণের মাধ্যমে পিতৃগণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ দিয়াছেন। পিতৃযাণাবলম্বী জীবাত্মগণ প্রথমেই যখন ধূমের আকৃতি ধারণ করেন, তখন হইতেই তাঁহাদের অদৃশ্য অবস্থার আরম্ভ। পিতৃলোক হইতে ফিরিবার কালেও তাঁহারা বৃষ্টির সহিত সূক্ষ্ম আকারেই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতির দেহে প্রবেশের সময়েও কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। ফল, ধান্য, ব্রীহি, শাকসব্জী বা তৃণাদির মধ্যে যখন তাঁহারা অবস্থান করেন, তখনও পার্থিব-দেহধারিগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। অন্নব্যঞ্জনাদির সহিত যখন তাঁহারা মনুষ্যদেহে প্রবেশ করেন, তখনও সকলের নিকট অদৃশ্যই থাকেন। মনুষ্যাদির দেহের ভিতর যখন ভ্রূণরূপ ধারণ করেন, তখন হইতেই পার্থিব দেহ ধারণ করার ফলে তাঁহারা চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। অতএব চন্দ্রলোকে অবস্থান-কালে সূক্ষ্ম-দেহধারী পিতৃগণকে কোন চর্ম্মচক্ষুঃবিশিষ্ট মানুষ দেখিতে পায় না বলিয়াই তথায় তাঁহারা থাকেন না, এইরূপ বলা যাইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রই একমাত্র পিতৃলোক নহেন ; অন্যান্য গ্রহে এবং তাহাদের উপগ্রহগুলিতেও পিতৃগণ গিয়া অবস্থান করিতে পারেন, এবং করিয়াও থাকেন। তবে পৃথিবীজাত প্রাণীদের আত্মা এই পৃথিবীর মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া ইহার নিকটবর্ত্তী চন্দ্রেই সাধারণতঃ অবস্থান করিয়া থাকেন, এবং নির্দ্দিষ্টকাল তথায় অবস্থানের পর কর্ম্মক্ষয়ের জন্য পুনরায় পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেন।

যে সকল মহাপাপীর উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই, কেবলমাত্র তাহারাই অজবীথীস্থিত নক্ষত্রগণের আকর্ষণে অজবীথীরূপ যমনালায় নিক্ষিপ্ত হইয়া অনন্তকাল অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জন্মান্তরবাদের প্রাচীনতা

ভারতে প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসমূহে সর্ব্বত্র জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি রহিয়াছে। বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যে ভাবে জন্মমৃত্যুর পৌনঃপুনিকতার কথা বলা হইয়াছে, পরবর্ত্তীকালে প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মেও ঠিক তেমনি জন্মমৃত্যুর পৌনঃপুনিকতার স্বীকৃতিই দেখা যায়। প্রাচীনতম বেদগ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতে যতগুলি ধর্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কোথাও সাক্ষাদ্‌ভাবে, কোথাও বা পরোক্ষভাবে জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি রহিয়াছে।

সাধারণতঃ ঋগ্বেদকেই প্রাচীনতম বেদ বলিয়া স্বীকার করা হয় বটে ; কিন্তু এই অভিমতটি ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ বেদগুলির মধ্যে অথর্ব্ববেদই যে প্রাচীনতম, অথর্ব্ববেদের ভাষা, বিভিন্ন বেদে অথর্ব্ববেদ-প্রবক্তা অথর্ব্বা ও অঙ্গিরস্ মুনিদের উল্লেখ, ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে অথর্ব্বা ঋষির বর্ণনা, ঋগ্বেদের মন্ত্রে অথর্ব্বা ও আঙ্গিরসদিগকে প্রথম যজ্ঞাগ্নির প্রবর্ত্তনকারীরূপে উল্লেখ, অথর্ব্বা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং অন্যান্য নানা হেতু হইতে তাহা নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায়। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎপ্রণীত 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে করিয়াছি। এই প্রাচীনতম অথর্ব্ববেদের বিভিন্ন মন্ত্র হইতে জানা যায়, সেই যুগেও জন্মান্তর-সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ভারতীয় ঋষিগণের মধ্যে বিরাজিত ছিল। অথর্ব্ববেদের অষ্টাদশকাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে (অনুবাক ৪, মন্ত্র ৭৮—৮০) নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি দেখা যায়—

> "স্বধা পিতৃভ্যঃ পৃথিবীষদ্ভ্যঃ।
> স্বধা পিতৃভ্যোঽন্তরিক্ষসদ্ভ্যঃ।
> স্বধা পিতৃভ্যো দিবিষদ্ভ্যঃ।"

মৃত্যুর পর কেহ কেহ এই পৃথিবীতেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ; কেহ অন্তরিক্ষ-লোকে গ্রহতারাদিরূপে, কেহ বা স্বর্গলোকে দেবতাদিরূপে জন্মিয়া থাকে—এইরূপ বিশ্বাসই উল্লিখিত মন্ত্র তিনটিতে নিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত এই অষ্টাদশ কাণ্ডেরই অন্য দুইটি মন্ত্রে আরও স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত বিশ্বাসের অস্তিত্ব দেখা যায়।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে পরিষ্কার ভাষায় বলা হইয়াছে—মহর্ষি বামদেব পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন জন্মে মনু, সূর্য্য, কক্ষীবান্ ঋষি, কুৎস ঋষি এবং উশনারূপে দেহধারণ করিয়াছিলেন। উক্ত মন্ত্র যথা—

"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জ্জুনেয়ং নৃষ্টেঽহং কবিরুশনা পশ্যতা বা॥"
—ঋগ্বেদসংহিতা ৪।২৬।১॥

উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় মহামতি সায়ণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, জাতিস্মর ঋষি বামদেব মাতৃগর্ভে থাকিয়াই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মসমূহের কথা উল্লিখিত প্রকারে বলিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের ১০।১৫।২ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"যে সকল পিতৃপুরুষ পূর্ব্বে অথবা পরে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা পৃথিবীতে আছেন, অথবা যাঁহারা ভাগ্যবান্ লোকদের মধ্যে আছেন, তাঁহাদের সকলকে অদ্য এই নমস্কার করিলাম।" উক্ত মন্ত্রটি যথা—

"ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য
যে পূর্ব্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা
যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু॥"

এই মন্ত্রে স্পষ্টই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, মৃত্যুর পর মানুষ কর্ম্মানুযায়ী গতিলাভ করে। কেহ পুণ্যবলে দেবত্বপ্রাপ্ত হয়, কেহ মনুষ্য-লোকেই পুনরায় জন্মে, এবং কেহ বা রাক্ষস, পিশাচ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

ঋগ্বেদের ১০।১৬।৩ মন্ত্রটি মৃত ব্যক্তির দাহকার্য্যের সময় উচ্চারণ করা হইত। ইহাতে মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহার চক্ষুঃ যেন সূর্য্যালোকে গমন করে এবং তাঁহার আত্মা যেন আপাততঃ বায়ুমণ্ডল আশ্রয় করিয়া থাকে। অতঃপর শ্রাদ্ধাদি-কার্য্যের পর যেন তিনি সূক্ষ্মদেহে নিজ কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গাদিলোকে গমন করেন, অথবা পুনরায় পৃথিবীতে জন্মেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অথবা তাঁহার জীবদ্দশায় কৃত কর্ম্মদ্বারা আকৃষ্ট হইলে জলচর প্রাণীরূপে অথবা উদ্ভিদ্‌রূপেও জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। এই মন্ত্রটিতেও জন্মান্তরবাদের পরিষ্কার স্বীকৃতিই দেখা যায়। পাঠকগণের অবগতির জন্য সম্পূর্ণ মন্ত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা
দ্যাঞ্চ গচ্ছ পৃথিবীঞ্চ ধর্ম্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিত-
মোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ॥" (১০।১৬।৩)

যজুর্ব্বেদের শতপথব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে— যাঁহারা শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বেদোক্ত বিধানে যজ্ঞাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর উন্নততর সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করতঃ ক্রমে ক্রমে অমরত্বের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, আর যাঁহারা শাস্ত্রার্থ জানেন না এবং বেদোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়াও করেন না, তাঁহারা মৃত্যুর পর পুনরায় সাধারণ লোকের গৃহেই জন্মলাভ করতঃ ক্লেশভোগ করিয়া থাকেন।

"তে য এবমেতদ্ বিদুঃ। যে বৈতৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতে, মৃত্বা পুনঃ সম্ভবন্তি, ত এতস্যৈবান্নং পুনঃ পুনর্ভবন্তি।" (১০।৪।৩।১০)

উক্ত শতপথব্রাহ্মণেই অন্য এক স্থানে বলা হইয়াছে—মানুষ তিনবার জন্মিয়া থাকে। একবার জন্মে মাতাপিতা হইতে, দ্বিতীয়বার জন্মে উপনয়নকালে, এবং তৃতীয়বার জন্মে মৃত্যুর পর। শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষায়—

"ত্রির্হ বৈ পুরুষো জায়তে। এতন্নেব মাতুশ্চাধি পিতুশ্চাগ্রে জায়তেঽথ যং যজ্ঞ উপনয়তি স যদ্ যজতে তদ্ দ্বিতীয়ং জায়তেঽথ তত্র ম্রিয়তে যত্রৈতমগ্নাবভ্যাদধতি স যত্ততঃ সম্ভবতি তৎ তৃতীয়ং জায়তে। তস্মাৎ ত্রিঃ পুরুষো জায়ত ইত্যাহুঃ।"
(১১।২।১।১)

যজুর্ব্বেদ ক্রিয়াবহুল। ইহার শ্রাদ্ধকাণ্ডে যে সকল মন্ত্র ও বিধি নিবদ্ধ আছে, তাহাদের মধ্যেও জন্মান্তরবাদের বহু ইঙ্গিত ও উল্লেখ দেখা যায়। শুক্লযজুর্ব্বেদের একটি মন্ত্র হইতে জানা যায়—উহা পাঠ করিয়া যদি গৃহিণী শ্রাদ্ধান্তে মধ্যবর্ত্তী পিণ্ডটি ভক্ষণ করেন, তবে পিতৃপুরুষদের মধ্য হইতে কোন একজন উক্ত গৃহিণীর গর্ভে পুত্রসন্তানরূপে প্রবেশ করেন এবং ফলে যথাকালে উক্ত গৃহিণী পুত্রবতী হন। মন্ত্রটি যথা—

"আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজম্
যথেহ পুরুষোঽসৎ।"—বাজসনেয়ীসংহিতা, অধ্যায় ২, কণ্ডিকা ৩৩

শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হইয়াছে— তৃণজলৌকা (চিনে

জোঁক) যেমন দেহাগ্রভাগ দ্বারা নূতন একগাছি তৃণ আশ্রয় করতঃ পশ্চাতের তৃণটি পরিত্যাগ করে, মনুষ্যাদির দেহস্থিত জীবাত্মাও তেমনি নূতন দেহ আশ্রয়পূর্ব্বক পুরাতন জীর্ণ দেহটি পরিত্যাগ কবিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাষায়—

"তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বান্যমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি।" (৪।৪।৩)

মৃত্যুর পর দেহান্তরধারণ যে সাধারণতঃ অবশ্যম্ভাবী, তাহারই ইঙ্গিত এখানে করা হইয়াছে।

সামবেদের উপনিষদ্‌ভাগ ছান্দোগ্যোপনিসদ্ নামে বিখ্যাত। এই উপনিষদে বলা হইয়াছে—যাহারা সৎকর্ম্ম করে, তাহারা পরবর্ত্তী জন্মে উত্তম জাতিতে, উত্তম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী কখনও ব্রাহ্মণযোনিতে, কখনও ক্ষত্রিয়যোনিতে, কখনও বা বৈশ্যযোনিতে জন্মিয়া থাকেন। আর যাহারা কুকর্ম্ম করে, তাহাদিগকে পরবর্ত্তী জন্মে নিকৃষ্টযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। শেষোক্ত লোকেবা কখনও কুকুররূপে, কখনও শূকররূপে, কখনও বা চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করে।

"তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।" (৫।১০।৭)

এই ছান্দোগ্যোপনিষদেই বলা হইয়াছে—যে সকল লোক জনহিতার্থে দেবালয়, হাসপাতাল, জলাশয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বা রাস্তানির্ম্মাণ ইত্যাদি সৎকর্ম্মসম্পাদন করেন, মৃত্যুর পর তাঁহারা চন্দ্রলোকে উপনীত হন এবং নির্দ্দিষ্টকাল তথায় বাস করিবার পর পুনরায় পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রলোক হইতে কিভাবে তাঁহারা পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হন, তাহার মনোজ্ঞ বর্ণনা ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে (১০ম খণ্ডে) রহিয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা যে পথে চন্দ্রলোকে গিয়াছিলেন, কর্ম্মক্ষয়ের পর পুনরায় সেই পথেই পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করেন। প্রথমে তাঁহারা আকাশে অবতীর্ণ হন। তথা হইতে পৃথিবী-পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেন এবং আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ধূমের আকার ধারণ করেন। ধূমাকৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারা সাদা মেঘের আকার ধারণ করতঃ ক্রমে কৃষ্ণমেঘে রূপান্তরিত হইয়া বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে

পতিত হন। অতঃপর ব্রীহি, যব, তিল, ডাল, সব্জী প্রভৃতিরূপে পৃথিবীদেহে জন্মগ্রহণ করেন। মানুষেরা ঐগুলি ভক্ষণ করে এবং ফলে উল্লিখিত প্রেতাত্মারা মনুষ্যদেহে শুক্রের আকার প্রাপ্ত হন। অতঃপর তাঁহারা শুক্ররূপে মাতৃগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক যথাকালে মনুষ্যশিশুরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষায়—

"তস্মিন্ যাবৎ-সম্পাতমুষিত্বা অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে। যথেদমাকাশ-মাকাশাদ্ বায়ুম্। বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাভ্রংভবতি। অভ্রংভূত্বা মেঘো ভবতি। মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে। অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ ভূয় এব ভবতি"- ছান্দোগ্য ৫।১০।৫—৬॥

হিন্দুদের কাছে বেদই সর্ব্বোচ্চ প্রমাণ। বেদের পরেই স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। স্মৃতির পরেই পুরাণ ও ইতিহাস গ্রন্থগুলি প্রমাণরূপে বিবেচিত হয়। স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য নিবদ্ধ আছে, তাহা পরে বলিব।

দর্শনশাস্ত্রসমূহেও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনের ৩।১৮ সূত্রে বলিয়াছেন —"সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি-জ্ঞানম্।" অর্থাৎ সংস্কারের সাক্ষাৎকার ঘটিলেই মানুষ তাহার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে। পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম থাকিলেই পরজন্মে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি থাকা সম্ভব। অন্যান্য সূত্রেও পতঞ্জলি জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতিসূচক কথা বলিয়াছেন।

পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষের সাধুমহাত্মগণকর্ত্তৃক যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতেও জন্মান্তর সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। জন্মান্তরবাদের প্রাচীনতা প্রদর্শনের জন্য ঐগুলি আবশ্যক না থাকায় তাহা আর আলোচনা করিব না।

বর্ত্তমান যুগের খ্রীষ্টানেরা যদিও জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে চান না, তথাপি তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে ইহার স্বীকৃতি রহিয়াছে। বাইবেলের ম্যাথু গ্রন্থ হইতে জানা যায়—যীশুখ্রীষ্ট একদা সমুদ্রোপকূলে সমবেত তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমার সম্বন্ধে লোকে কি বলে?" উত্তরে তাঁহার শিষ্যেরা বলিয়াছিল "কেহ কেহ বলে—আপনি ও ধর্ম্মযাজক জন অভিন্ন। অন্যেরা বলে —আপনি পূর্ব্বজন্মে এলিয়াস্ ছিলেন। কিছু লোক বলে—আপনি পূর্ব্বজন্মে জেরেমিয়াস্ বা অন্য কোন ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন।"

"When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying 'Whom do man say that I the son of man am? And they said : Some say thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets."—Matthew 16 | 13—14.

যীশুখ্রীষ্ট কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে অন্য ধর্ম্মপ্রচারকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাইবেলের অন্যান্য স্থানেও জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি আছে।

বর্ত্তমানযুগের মুসলমানেরা যদিও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন না, তথাপি তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের অন্ততঃ একটি স্থানে জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি দেখা যায়। উক্ত স্থানে বলা হইয়াছে—"আল্লা প্রাণীদিগকে সৃষ্টি করিয়া পুনঃ পুনঃ জীবলোকে প্রেরণ করেন।"

"God generates beings and sends them back over and over again till they return to Him"—Al Quran XXX.XI.

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী বিগত শতাব্দীতে ৺কাশীধামে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর জ্ঞানে পূজিত হইতেন। কথিত কাছে—এই মহাপুরুষ ২৮০ বৎসর জীবনধারণ করেন এবং ১৫০ বৎসরকাল একমাত্র কাশীধামেই বাস করেন। ইনি বহু অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই মহাত্মার জীবনী পাঠে জানা যায়—ইনি যে কেবল নিজের বিভিন্ন পূর্ব্বজন্মের কথাই বলিতে পারিতেন এমন নহে, ইঁহার বহু শিষ্যকেও তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় বিবরণ নির্ভুলভাবে বলিয়া দিতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য স্বামী ৺অভেদানন্দ তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত গুরুভ্রাতা স্বামী ৺বিবেকানন্দের পর আমেরিকা গিয়া বেদান্তধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক খ্যাতিলাভ করেন। ইঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থেও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে বহু তথ্য নিবদ্ধ আছে। 'পুনর্জ্জন্মবাদ' (পৃষ্ঠা—৬৩) গ্রন্থে স্বামী ৺অভেদানন্দ লিখিয়াছেন—

"একটি ৬ বৎসরের বালিকাকে আমি দেখিয়াছি। সে অতি সুন্দররূপে ও আশ্চর্য্যভাবে পিয়ানো যন্ত্র বাজাইত এবং যে কোন গৎ একবার মাত্র শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহা হুবহু বাজাইতে পারিত। আমার মনে হয়, সে পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই পিয়ানো ভাল করিয়া বাজাইতে পারিত।"

প্রায় প্রতি বৎসরই সংবাদপত্রে এমন ২।১টি সংবাদ প্রকাশিত হয়, যাহা হইতে ভারতে বা অন্য কোন দেশে একটি বালক বা বালিকার পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধীয় অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এইরূপ শত শত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণে পূর্ণ বহু গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক যুগের প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বকালেই মানুষের মধ্যে জন্মান্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বাস বিদ্যমান আছে এবং এইরূপ বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিবার মত প্রমাণও মানুষ যুগে যুগে পাইয়া আসিতেছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পুরাণে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ

সুবিশাল পুরাণশাস্ত্র অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণে বিভক্ত। উপপুরাণগুলিকে বস্তুতঃ মহাপুরাণসমূহের পরিশিষ্টভাগ বলা যাইতে পারে। মহাপুরাণগুলিতে যাহা আছে, উপপুরাণসমূহেও প্রায় সেইসব কথাই লিখিত দেখা যায়। বিভিন্ন স্মৃতি-সংগ্রহকার মহাপুরাণগুলির প্রামাণ্যের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। আমরাও মনে করি—মহাপুরাণের উক্তিদ্বারা যাহা প্রমাণিত হইবে, তাহার প্রমাণের জন্য আর উপপুরাণের উক্তির উল্লেখ করা অনাবশ্যক। মহাপুরাণ যে সংখ্যায় ১৮ খানা, ইহা বিভিন্ন পুরাণে এবং মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থেও স্বীকৃত হইয়াছে। মহাপুরাণের নামগুলিও প্রায় সর্ব্বত্র একই প্রকার দেখা যায়। ইহাদের নামোল্লেখে কেবলমাত্র ক্রমের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। পুরাণগুলি স্মরণাতীত কাল হইতে বিদ্যমান আছে; এই কারণেই ইহাদের নাম 'পুরাণ' বা প্রাচীন গ্রন্থ। কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন বিশেষ সময়ে কোন পুরাণ রচনা করিয়াছেন বলিয়া ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণ বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বিশ্বাস করেন—সৃষ্টির আদিতে বেদগ্রন্থের ন্যায় পুরাণগুলিও স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। প্রতি দ্বাপরযুগে একবার করিয়া একজন 'বেদব্যাস' বেদ ও পুরাণশাস্ত্রগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া শিষ্যগণ-মাধ্যমে প্রচার করেন—ইহাই আর্য্যভারতের বিশ্বাস। পুরাণশাস্ত্রের উৎপত্তি, শ্রেণীবিভাগ ও প্রচার সম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে উল্লিখিতপ্রকার উক্তিই রহিয়াছে। এই কারণেই পুরাণগুলির পৌর্ব্বাপর্য্যের উপর গুরুত্ব না দিয়া তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে নিম্নলিখিতক্রমে লিপিবদ্ধ আছে; যথা—(১) ব্রহ্ম (২) পদ্ম (৩) বিষ্ণু (৪) শিব (৫) লিঙ্গ (৬) গরুড় (৭) নারদীয় (৮) ভাগবত (৯) অগ্নি (১০) স্কন্দ (১১) ভবিষ্য (১২) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত (১৩) মার্কণ্ডেয় (১৪) বামন (১৫) বরাহ (১৬) মৎস্য (১৭) কূর্ম্ম এবং (১৮) ব্রহ্মাণ্ড। এই সম্বন্ধে ভাগবতের শ্লোক যথা :—

"ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্॥

ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্”

(১২ | ৭ | ২৩—২৪)

ভাগবতোক্ত উল্লিখিত ক্রম অনুসারেই পুরাণগুলির আলোচনা করিব। বিভিন্ন পুরাণে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে অসংখ্য তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি অতিবিশাল পুরাণগুলিতে জন্মান্তর-সংক্রান্ত তথ্যগুলিও অসংখ্য। উল্লিখিত প্রত্যেকটি তথ্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রদর্শন করা সম্ভব নহে, এবং তাহার প্রয়োজনও আছে বলিয়া মনে করি না। প্রত্যেক পুরাণেই যে জন্মান্তরবাদের সমর্থন রহিয়াছে তাহার প্রমাণস্বরূপ কিছু কিছু তথ্য উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করি। ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে ব্রহ্মপুরাণের নামটিই সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত হওয়ায় ব্রহ্মপুরাণ হইতেই আলোচনা আরম্ভ করিলাম।

(১) ব্রহ্মপুরাণ

দক্ষকন্যা সতীর যোগবলে দেহত্যাগ এবং উমারূপে পুনর্জ্জন্মগ্রহণের ঘটনাটি বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণেও ইহার বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল। দক্ষ-প্রজাপতি এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং বিভিন্ন দেবতাদের সহিত তাহার কন্যা ও জামাতাদিগকেও এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। শিবপত্নী সতী ছিলেন দক্ষের জ্যেষ্ঠ কন্যা। শিব দক্ষকে প্রণাম করিতেন না বলিয়া দক্ষ শিবের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই অসন্তোষের ফলেই তিনি যজ্ঞে শিব ও সতীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। দেবর্ষি নারদের মুখে পিতার বিপুল যজ্ঞারম্ভের সংবাদ পাইয়া সতী অনাহূতভাবেই পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহার স্বামীর অপমান হইতেছে দেখিয়া পতিপ্রাণা সতী কঠোর ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করেন। দক্ষ ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হন এবং সতীকেও অপ্রিয় বাক্য শুনাইয়া দেন। পতি-নিন্দায় অধীরা সতী বলিলেন—“পিতঃ! আমি বাক্য, মন বা কর্ম্মদ্বারা কোনরূপ অন্যায় আচরণ করি নাই; তথাপি আপনি আমাকে তিরস্কার করিলেন। আপনি আমার জন্মদাতা পিতা; সুতরাং আপনাকে কটুকথা বলিতে পারিব না। আপনি আমার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করিলেন, তাহার প্রতিবাদে আমি আপনা হইতে উৎপন্ন এই দেহ এখনই পরিত্যাগ করিব”, ব্রহ্মপুরাণের ভাষায় সতীর উক্তি : যথা—

"বাঙ্মনঃকর্ম্মভির্যস্মাদদুষ্টাং মাং বিগর্হসি।

তস্মাৎ ত্যজাম্যহং দেহমিমং তাত তবাত্মজম্॥" (৩৪।২১)

দেহত্যাগের উদ্দেশ্যে যোগাসনে উপবেশন করিবার পূর্ব্বেই সতী বলিলেন—"এই দেহ ত্যাগ করিতেছি বটে; তবে শীঘ্রই আমি আবার নূতন দেহ লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিব এবং নূতন জন্মেও আমার ধর্ম্মবুদ্ধি বা এই জন্মের স্মৃতি বিনষ্ট হইবে না। নূতন জন্মেও আমি মহাদেবকেই পতিরূপে লাভ করিব"। ব্রহ্মপুরাণের ভাষায়—

"যেনাহমপদেহা বৈ পুনর্দ্দেহেন ভাস্বতা।

তত্রাপ্যহমসম্মূঢ়া সম্ভূতা ধার্ম্মিকী পুনঃ॥

গচ্ছেয়ং ধর্ম্মপত্নীত্বং ত্র্যম্বকস্যৈব ধীমতঃ। (৩৪।২৩)

উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া সতী যোগাসনে উপবেশনপূর্ব্বক যোগবলে দেহত্যাগ করেন এবং পরে 'বৈবস্বত' মন্বন্তরে শৈলরাজ ও মেনকা হইতে জন্মগ্রহণ করতঃ 'উমা' নামে খ্যাত হন। এই সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণের উক্তি ঃ যথা—

"অথ দেবী সতী জজ্ঞে প্রাপ্তে বৈবস্বতেঽন্তরে।

মেনায়াং তামুমাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্॥" (৩৪।৪১)

ব্রহ্মপুরাণ হইতে জানা যায়—দক্ষকন্যা সতী দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতাকেও অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং জগৎপূজ্যা বিশ্বমাতা সতীর শাপে তাঁহার জন্মদাতা শিবনিন্দুক দক্ষপ্রজাপতি মৃত্যুর পর 'প্রাচীনবর্হি'র পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন জন্মে তাঁহার জননীর নাম ছিল 'মারিষা'। প্রচেতাগণের পুত্র বলিয়া এই নূতন জন্মে তিনি 'প্রাচেতস' নামে খ্যাত হন। পাঠক-গণের অবগতির জন্য এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মপুরাণের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"এবং প্রাচেতসো দক্ষো জজ্ঞে বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে।

প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসাম্।

দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং পুনর্নৃপ!॥" (৩৪।৪৫—৪৬)

ব্রহ্মপুরাণ যে জন্মান্তরবাদের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন, উল্লিখিত বিবরণগুলি হইতে তাহা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়।

(২) পদ্মপুরাণ

পদ্মপুরাণ যেমন আয়তনে অতি বৃহৎ তেমনি ইহাতে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধেও বহু ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই মহাপুরাণ কয়েকটি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত;

তন্মধ্যে ভূমিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায়ে হিরণ্যকশিপু নামক দানবের পূর্ব্বজন্মের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পশ্চিমভারতে সমুদ্রতীরের অনতিদূরে বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি খুব ধার্ম্মিক ছিলেন। কালে সোমশর্ম্মা নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সোমশর্ম্মা পিতার চরিত্রের অনুকরণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ও ধার্ম্মিক হন, এবং শেষ বয়সে পবিত্র শালগ্রাম-তীর্থে তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত থাকা কালে কালগ্রাসে পতিত হন। এই সময়ে কিছু দৈত্য ও দানব ঐ স্থানে উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের কথা ভাবিতে ভাবিতেই সোমশর্ম্মার দেহত্যাগ ঘটে। মানুষ মৃত্যুকালে যেরূপ চিন্তা করে, পরজন্মে সেইরূপ যোনিতেই উৎপন্ন হয়; ইহাই বিধাতার নিয়ম। সোমশর্ম্মা যদিও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তথাপি মৃত্যুকালে দৈত্যদিগকে চিন্তা করিবার ফলে মৃত্যুর পর দানব-কুলে জন্মগ্রহণ করতঃ হিরণ্যকশিপু নামে খ্যাতিলাভ করেন। বিষ্ণুশর্ম্মার পুত্রেরা সকলেই জাতিস্মর ছিল, এবং তাহাদের মাতাপিতা যে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি জন্মেও তাহাদের মাতাপিতা ছিলেন, এই সংবাদটিও তাহারা বিষ্ণুশর্ম্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। বিষ্ণুশর্ম্মার প্রতি তাঁহার পুত্রদের উক্তি ঃ যথা—

"ভবান্ পিতা ইয়ং মাতা জন্ম-জন্মান্তরে পিতঃ।
বয়ং সুতা ভবামস্তে সর্ব্বে পুণ্যকৃতস্তথা॥"—ভূমিখণ্ড ৩।৪৫

ভূমিখণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে পাপীদের নরকভোগ ও জন্মান্তরগ্রহণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। গুরুতর পাপে অপরাধী ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর নরকভোগান্তে কৃমি, কীট প্রভৃতি যোনিতে বহু জন্ম অতিবাহিত করিবার পর কুকুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ১০০ জন্ম কুকুররূপে জন্মিবার পর এইরূপ পাপী ব্যাঘ্র, গর্দ্দভ, মার্জ্জার, শূকর, সর্প প্রভৃতি বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করতঃ অবশেষে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণে সমর্থ হয়। পদ্মপুরাণের ভাষায়—

"পুনর্জ্জন্ম প্রবক্ষ্যামি যাসু যোনিষু জায়তে।
শুনাং যোনিশতং প্রাপ্য ভুঙ্‌ক্তে বৈ পাতকং পুনঃ॥
ব্যাঘ্রো ভবতি দুষ্টাত্মা রাসভীং যাতি বৈ পুনঃ।
মার্জ্জার-শূকরীং যোনিং সর্পযোনিস্তথৈব চ॥
নানাভেদাসু সর্ব্বাসু তির্য্যক্ষু চ পুনঃ পুনঃ।
পাপপক্ষিষু সংযাতি, অন্যাসু মহতীষু চ॥
চাণ্ডালভিল্লযোনিঞ্চ পুলিন্দীং যাতি বৈ তথা॥"—ভূমিখণ্ড ১৬।১৬—১৯

অষ্টাদশ অধ্যায়ে সোমশর্ম্মার পূর্ব্বজন্মবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট হইতে সোমশর্ম্মা জানিতে পারেন যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে শূদ্র ছিলেন। তখন কিরূপ পুণ্যকার্যের ফলে তিনি এই জন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা জানিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হয়। সোমশর্ম্মাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বশিষ্ঠ জানান যে, ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণের সান্নিধ্য এবং ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহ—এই দুইটি কারণেই পূর্ব্বজন্মের শূদ্র বর্ত্তমান জন্মে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছেন, কিন্তু শূদ্রজাতিতে থাকাকালীন দানরূপ পুণ্য না করায় তিনি বর্ত্তমান জন্মে দারিদ্র্য-পীড়ায় জর্জ্জরিত হইতেছেন। এই সম্বন্ধে সোমশর্ম্মার প্রতি বশিষ্ঠের উক্তি ঃ যথা—

"সঙ্গত্যা ব্রাহ্মণস্যৈব বিষ্ণোশ্চৈব প্রসাদতঃ।
ভবান্ ব্রাহ্মণতাং প্রাপ্তঃ সত্যধর্ম্ম-সমন্বিতঃ ॥" (১৮।২৬)
"পূর্ব্বজন্মনি তে বিপ্র ! হ্যর্থমেব প্রপঞ্চিতম্।
ন দত্তং ব্রাহ্মণেভ্যো হি দীনেষন্যেষু বৈ তথা ॥
তস্য পাপস্য ভাবেন দারিদ্র্যং ত্বামুপাবিশৎ ॥" (১৮।৩০—৩২)

সোমশর্ম্মার পুত্র সুব্রতও অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ ২২শ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। সুব্রত পূর্ব্বজন্মে ছিলেন বিদিশা-নগরের রাজা। সেই জন্মে তাঁহার নাম ছিল ধর্ম্মাঙ্গদ। ৪৬তম অধ্যায়ে মুমূর্ষু শূকরী তাহার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ বলিয়াছে। ১২৩তম অধ্যায়ে চ্যবনমুনির প্রশ্নের উত্তরে কুঞ্জল তাঁহার পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছেন।

উত্তরখণ্ডের ২০০তম অধ্যায় হইতে জানা যায়—দেবরাজ ইন্দ্র হস্তিনাপুরবাসী ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিগমোদ্বোধক তীর্থে স্নান করিবার ফলে শিবশর্ম্মার অন্তরে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে—এই সংবাদটি ২০১তম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ২১১তম অধ্যায়ে একটি বিষধর সর্পের পূর্ব্বজন্মের বিবরণ আছে। মুকুন্দ নামক ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার অপরাধে রাজার আদেশে চণ্ডক নামক নাপিতের শিরশ্ছেদ হয়। ঘাতকের হস্তেই তাহার মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর পরে সে বিষধর সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মরুদেশের এক বৃক্ষকোটরে বাস করিতে থাকে। পরে পথিকদের যষ্টির আঘাতে তাহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। পদ্মপুরাণের ভাষায় এই সর্পের বর্ণনা যথা—

"স পাপো মারবে দেশে সর্পোঽভূৎ কালবিগ্রহঃ।
ধবকোটরমধ্যস্থো বিষজ্বালাকরানলঃ ॥"—উত্তরখণ্ড ২১১।২৫

এই উত্তরখণ্ডেরই ২২১তম অধ্যায় হইতে জানা যায়—সখীর গৃহে এক পুস্তকে ভারতের মানচিত্রমধ্যে প্রয়াগতীর্থ দেখিয়া রাজা বীরবর্ম্মার মহিষী হেমাঙ্গীর অন্তরে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে।

"তত্র তীর্থমিদং দৃষ্ট্বা প্রয়াগং ব্রহ্মনির্ম্মিতম্।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম সা সস্মার মনস্বিনী॥" (২২১।১০)

তিনি স্বামীর কাছে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ বলেন এবং অবিলম্বে প্রয়াগতীর্থে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর স্বামীর সহিত তিনি প্রয়াগতীর্থে গিয়াছিলেন। হেমাঙ্গী রাজার কাছে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ঐ জন্মে তিনি মোহিনী নাম্নী বেশ্যা ছিলেন। পাপ-কর্ম্মদ্বারা যৌবনকালে এই বেশ্যা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। শেষ বয়সে তাহার অন্তরে ধর্ম্মবুদ্ধি জাগিয়া উঠে এবং তখন সে সমুদয় ধন সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া নিঃস্ব অবস্থায় রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে। বনের ভিতর দিয়া চলিবার সময় সে দস্যুহস্তে নিহত হয়। তাহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলিয়া যখন দস্যুরা প্রস্থান করে, তখন দৈবযোগে এক সন্ন্যাসী তথায় আসিয়া তাহার মুখে এক বিন্দু প্রয়াগতীর্থের জল দেন। এই পুণ্যের ফলেই বর্ত্তমান জন্মে সে রাজমহিষী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। স্বামীর প্রতি হেমাঙ্গীর উক্তি পদ্মপুরাণের ভাষায়: যথা—

"পুরাহং মোহিনী নাম বেশ্যা চ বহুপাপকৃৎ।
যৌবনে বার্দ্ধকে কিঞ্চিদ্ধর্ম্মে জাতা মতির্ম্মম॥
পাপেনোপার্জ্জিতং বিত্তং ধর্ম্মেণ ব্যয়িতং ময়া।
নির্ধনাহং যদা রাজন্নির্গতা নিজপত্তনাৎ।
তদা মাং নির্জ্জনেঽরণ্যে যান্তীং জঘ্নুশ্চ তস্করাঃ॥"

—উত্তরখণ্ড ২২১।১৪—১৬

উত্তরখণ্ডের ২১৫তম অধ্যায়ে জন্মান্তর-সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নপ্রকার। এক সময়ে বহু মুনি হরিদ্বারে সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তারার পুত্র বুধ উক্ত স্থানে আগমন করেন। বুধের আকৃতি ছিল অতি সুন্দর এবং তাঁহাকে যুবকের মত দেখাইতেছিল। বুধ নিকটে আসিলে ব্যাস প্রভৃতি মহামুনিগণ পরম সমাদরে তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন। এক মুনিবালক ইহা দেখিয়া তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা

করে—"এই সুন্দর আগন্তুকটি কে? ব্যাস প্রভৃতি মান্য মুনিগণই বা ইঁহাকে এত যত্ন করিতেছেন কেন?"

পুত্রের প্রশ্ন শুনিয়া পিতা তাহার নিকট বুধের জন্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। বৃহস্পতির পত্নী তারার গর্ভে চন্দ্রের ঔরসে বুধের জন্ম হইয়াছে জানিয়া মুনিপুত্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠে এবং মন্তব্য করে যে, ইনি তো তাহা হইলে স্বৈরিণীর পুত্র; এইরূপ স্বৈরিণীতনয়কে স্মৃতিশাস্ত্রে কুণ্ড নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণের ভাষায়—

"ইত্যাকর্ণ্য পিতুর্বাক্যং জহাসোচ্চৈর্মুনেঃ সুতঃ।
উবাচ চ স্বপিতরং কুণ্ডোঽয়ং স্বৈরিণীসুতঃ॥"—উত্তরখণ্ড ২১৫।৩৩

বালক এত উচ্চৈঃস্বরে কথাগুলি বলিয়াছিল যে, অদূরে অবস্থিত বুধ তাহার প্রত্যেকটি কথা শুনিতে পান এবং অপমান বোধ করেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বুধ তখন বালকটিকে অভিশাপ দেন যে, সেও কুণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বৈরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। পদ্মপুরাণের ভাষায়—

"ইত্যুদীর্য্য বচঃ ক্রোধাদ্ বুধস্তং মুনিবালকম্।
শশাপেতি ত্বমপ্যাশু কুণ্ডো ভব মহীতলে॥" (২১৫।৪৭)

পুত্রের প্রতি বুধের এই অভিশাপবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার পিতা অত্যন্ত বিচলিত হন। তিনি বুধকে প্রণাম করতঃ পুত্রের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করেন। অতঃপর সন্তুষ্ট হইয়া বুধ বলেন—অভিশাপ যখন একবার দেওয়া হইয়াছে, তখন আর ইহার অন্যথা হইবে না; তবে আমি এই বর দিতেছি যে, স্বৈরিণীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই ছেলেটি যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকারী হইয়া ক্রমে নিজ মর্য্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। মুনির প্রতি বুধের উক্তি যথা—

"অয়ং তব মুনে! বালঃ কুণ্ডত্বং প্রাপ্য ভূতলে।
দত্তযজ্ঞোপবীতঃ সন্ লপ্স্যতে হি নিজাস্পদম্॥" (২১৫॥৫৩)

বুধের শাপে উল্লিখিত মুনিপুত্র স্বৈরিণীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল।

উত্তরখণ্ডের ২১৩তম অধ্যায়ে 'মধুবন' তীর্থের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মানুষ বহু জন্ম ধরিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিলে তবেই মৃত্যুকালে এই পুণ্যতীর্থে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ আরও বহু ঘটনা পদ্মপুরাণের বিভিন্ন খণ্ডে লিপিবদ্ধ দেখা যায়।

(৩) বিষ্ণুপুরাণ

বিষ্ণুপুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের ঔরসে অগ্নীধ্র প্রভৃতি ১০ জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে তিনজন জাতিস্মর ছিলেন। ইঁহাদের নাম (১) মেধা (২) অগ্নিবাহু এবং (৩) পুত্র।

"মেধাগ্নিবাহুপুত্রাস্তু ত্রয়ো যোগপরায়ণাঃ।
জাতিস্মরা মহাভাগা ন রাজ্যায় মনো দধুঃ॥ (২।১।৯)

প্রিয়ব্রতের পর অগ্নীধ্র এবং তাঁহার পর অগ্নীধ্রতনয় ঋষভ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ঋষভ অত্যন্ত ধাম্মিক ছিলেন এবং তিনি ভরত প্রভৃতি ১০০ পুত্রের জনক হন। রাজা ভরত পরম ধাম্মিক ছিলেন। দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিবার পর তিনি পুত্র সুমতির হস্তে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া পুণ্যতীর্থ শালগ্রাম-পর্ব্বতে গিয়া যোগাভ্যাসে মন দেন; কিন্তু যোগাভ্যাস সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হওয়ার ফলে পরবর্ত্তী জন্মে পুণ্যাত্মা যোগীদের বংশে জন্মগ্রহণ করতঃ 'ভরত' নামেই পরিচিত হন। ইনিই বিখ্যাত জড় ভরত।

যোগাভ্যাসে নিরত ব্যক্তি যোগসিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিলে যে পরবর্ত্তী জন্মে ধাম্মিক যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণ করেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়াছেন। এই সম্বন্ধে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি যথা—

"প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥" (৬।৪১—৪২)

রাজর্ষি ভরত বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শালগ্রাম-পর্ব্বতে মুনিব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিতেছিলেন, কিন্তু তথাপি জন্মান্তরের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না। একদা ফলমূল আহরণ করিবার জন্য যখন তিনি বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন সহসা নিকটে একটি সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং একটি তৃণভোজনরতা পূর্ণগর্ভা হরিণী ভয়ে অস্থির হইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পর্ব্বতের উপর হইতে নিম্নস্থ ঝর্ণার জলপ্রান্তে পতিত হইল। পতনের আঘাতে হরিণীটির মৃত্যু ঘটিল এবং তাহার শাবকটি নির্গত হইয়া জলস্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া রাজর্ষি ভরতের মন করুণায় আর্দ্র হইল এবং তিনি ঝর্ণার জলে নামিয়া হরিণশিশুটিকে তুলিয়া আনিলেন। এই সদ্যোজাত মাতৃহীন হরিণশিশুটিকে

নিজের আশ্রমে আনিয়া রাজর্ষি ভরত লালন-পালন করিতে লাগিলেন, এবং নিজ পত্নী, পুত্র, রাজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগের পরেও নূতন স্নেহবন্ধনে জড়িত হইয়া পড়িলেন। মৃত্যুকালে এই হরিণ-শিশুটির বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতেই রাজর্ষি ভরত দেহত্যাগ করেন এবং ফলে হরিণশিশুরূপেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। যোগাভ্যাস প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যের ফলে হরিণজন্মেও তিনি জাতিস্মর হন এবং পবিত্র শালগ্রাম-পর্ব্বতে শুষ্ক লতাপাতামাত্র ভক্ষণে জীবনধারণ করিতে থাকেন। যথাকালে হরিণটির মৃত্যু হয় এবং পরবর্ত্তী জন্মে তিনি বিশুদ্ধ যোগাভ্যাসনিপুণ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। এই জন্মেও তাঁহার নাম ছিল ভরত। তিনি মহাপ্রাজ্ঞ হইয়াও জড়ের মত আচরণ করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'জড়ভরত' বলিত। এই জড়ভরতই এক সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু সৌবীররাজের কাছে অধ্যাত্মতত্ত্বের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। জড়ভরতের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত ও অন্যান্য যাবতীয় ঘটনা, সৌবীররাজের সহিত তাঁহার শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে লিপিবদ্ধ আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্।
জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতো জাতিস্মরো মৃগঃ॥
জাতিস্মরত্বাদুদ্বিগ্নঃ সংসারস্য দ্বিজোত্তম!
বিহায় মাতরং ভূয়ঃ শালগ্রামমুপাযযৌ॥
শুষ্কৈস্তৃণৈস্তথা পর্ণৈঃ স কুর্ব্বন্নাত্মপোষণম্।
মৃগত্বহেতুভূতস্য কর্ম্মণো নিষ্কৃতিং যযৌ॥
তত্র চোৎসৃষ্টদেহোঽসৌ জজ্ঞে জাতিস্মরো দ্বিজঃ।
সদাচারবতাং শুদ্ধে যোগিনাং প্রবরে কুলে॥
সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অপশ্যৎ স চ মৈত্রেয়! আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্॥"

(২।১২।৩৩—৩৭)

মৃত্যুকালে মানুষ যাহা চিন্তা করে, পরবর্ত্তী জন্মে সেই ভাবেই যে তাহাকে পুনরায় ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে হয়, ইহা স্বয়ং ভগবান্ গীতাতেও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন; যথা—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" (৮।৬)

জড়ভরতের উপাখ্যান ছাড়াও জন্মান্তরগ্রহণের আরও বহু ঘটনা বিষ্ণুপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। একদা জলমধ্যে তপস্যারত অষ্টাবক্র মুনিকে দেখিয়া রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনাগণ তাঁহার স্তব করিতে থাকে। মহর্ষি অষ্টাবক্র প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বর দিতে চাহিলে তাহারা ভগবান্ পুরুষোত্তমকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা জানায়। অষ্টাবক্রমুনি তাহাদিগকে 'তাহাই হইবে' বলিয়া বর দেন এবং জল হইতে উঠিয়া আসেন। তখন ঋষির দেহে ৮টি অদ্ভুত রকমের বক্রতা দেখিয়া কোন কোন দিব্যাঙ্গনা কৌতুকবশতঃ হাসিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে ঋষি ক্রুদ্ধ হন এবং তাহাদিগকে অভিশাপ দেন যে, তাহারা ভগবান্ বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিবে বটে; কিন্তু উপহাস করা রূপ পাপের ফলে শেষ পর্য্যন্ত দস্যুহস্তে পতিত হইবে। এই সকল দিব্যাঙ্গনাই পৃথিবীতে মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করতঃ কৃষ্ণের ভার্য্যা হন এবং কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর দস্যুপ্রকৃতি আভীরগণকর্তৃক হৃত হইয়া ঋষির অভিশাপের সার্থকতা সম্পাদন করেন। অষ্টাবক্রমুনির অভিশাপবাক্যটি বিষ্ণুপুরাণের ভাষায় যথা—

"যস্মাদ্ বিরূপরূপং মাং জ্ঞাত্বা হাসাবমাননা।
ভবতীভিঃ কৃতা তস্মাদেষ শাপং দদামি বঃ॥
মৎপ্রসাদেন ভর্ত্তারং লব্ধ্বা তং পুরুষোত্তমম্।
মচ্ছাপোপহতাঃ সর্ব্বাঃ দস্যুহস্তং গমিষ্যথ॥" (৫।৩৮।৮১—৮২)

নগ্নদর্শনের কুফল বর্ণনা-প্রসঙ্গে জন্মান্তর গ্রহণের আর একটি বিশেষ ঘটনা বিষ্ণুপুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'নগ্ন' বলিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মলঙ্ঘনকারী পাষণ্ডকে বুঝায়। পূর্ব্বকালে শতধনুঃ নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি ব্রত, উপবাস প্রভৃতি যথাবিধি পালন করিতেন। একদা উপবাস-ব্রত পালন করিবার কালে ঘটনাচক্রে একটি নগ্ন লোক তাঁহার সম্মুখে আসে। উপবাস-ব্রতকালে নগ্নদর্শন অতি মারাত্মক ঘটনা। ইহাতে উপবাস-ব্রতের সুফল নষ্ট হয় এবং ব্রতকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর কুকুর প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। নগ্নদর্শনের ফলে রাজা শতধনুঃকেও এইরূপ দুর্ভোগ ভুগিতে হয়। রাজার পতিব্রতা মহিষী সহমরণে গিয়াছিলেন এবং তিনিই পরবর্ত্তী জন্মগুলিতে কুকুর প্রভৃতি যোনিতে জাত স্বামীকে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া দ্রুত মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা

যায়, রাজা শতধনুঃ মৃত্যুর পর প্রথমে কুকুর-যোনিতে এবং অতঃপর যথাক্রমে শৃগাল, বৃক, গৃধ্র, কাক ও ময়ূর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বশেষে তিনি রাজা জনকের পুত্ররূপে জন্মিয়া কাশীরাজ-মহিষীর গর্ভসম্ভূতা নিজ মহিষীর সহিত পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

(৪) শিবপুরাণ

শিবপুরাণের বিভিন্ন সংহিতায় জন্মান্তরবাদ-সম্বন্ধে বহু তথ্য নিবন্ধ আছে। জ্ঞান-সংহিতায় বলা হইয়াছে যে, দক্ষকন্যা সতী পিতার যজ্ঞে অনাহূতভাবে গিয়া পতিনিন্দা শুনিতে পান এবং ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন। পরে এই দক্ষকন্যাই জন্মান্তরে মেনকার গর্ভে শৈলরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করতঃ পুনরায় শিবকে পতিরূপে লাভ করেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য 'জ্ঞানসংহিতা' হইতে এই বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"ততঃ দক্ষঃ স্বয়ং যজ্ঞং কৃতবান্ দেবসন্নিধৌ।
অনাহূয় তদা রুদ্রং পূর্ব্বঋর্ষিসমন্বিতঃ॥
ততো দেবী সতী নাম্নী পিত্রানাকারিতা যদা।
তদা গতা পুনস্তত্র নাহূতাপি পিতুর্গৃহে॥
প্রাপ্যাবজ্ঞাস্তু সা তত্র দেহত্যাগমথাকরোৎ।
... ...
সা দেবী শৈলরাজস্য পত্নী মেনেতি বিশ্রুতা।
পিতৃণাং মানসী কন্যা তস্যাং জন্ম সমাদধে॥
ততশ্চ পার্ব্বতী নাম প্রসিদ্ধমভবত্তদা।
সা পুনঃ শিবমারাধ্য ভর্ত্তারং শিবমাশ্রিতা॥"—অধ্যায় ৭

জ্যোতির্লিঙ্গের প্রশংসা সম্বন্ধে শিবপুরাণ বলেন—হীনযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি জ্যোতিলিঙ্গ দর্শন করিবার সুযোগ পান, তাহা হইলে মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রভূত ধনের অধিকারী হন এবং সেই জন্মেও সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিলে অতঃপর মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। এইসম্বন্ধে আরও পরিষ্কার ভাষায় শিবপুরাণ বলিয়াছেন যে, ম্লেচ্ছযোনিতে বা অন্ত্যজ-যোনিতে

জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কেহ শিবলিঙ্গ দর্শন করে, তবে পরজন্মে সে ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মলাভে সমর্থ হয়। ক্লীব বা আশ্রম-বহির্ভূত যতিব্রতধারীরাও শিবলিঙ্গ-দর্শনের ফলে জন্মান্তরে ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। শিবপুরাণের ভাষায়—

"হীনযোনৌ যদা জাতো জ্যোতির্লিঙ্গঞ্চ পশ্যতি।
তস্য জন্ম ভবেত্তত্র বিমলে সৎকুলে পুনঃ॥
সৎকুলে জন্ম সম্প্রাপ্য ধনাঢ্যো বেদপারগঃ।
শুভকর্ম্ম তদা কৃত্বা মুক্তিং যাত্যনপায়িনীম্॥
ম্লেচ্ছো বাপ্যন্ত্যজো বাপি ষণ্ডো বাথ মুনীশ্বরাঃ।
দ্বিজো ভূত্বা লভেন্মুক্তিং তস্মাচ্চ দর্শনঞ্চরেৎ॥

—জ্ঞানসংহিতা ৩৮।২৭—২৯

জন্মান্তর-গ্রহণের আর একটি সুন্দর বিবরণ শিবপুরাণের জ্ঞানসংহিতায় লিপিবদ্ধ আছে। অর্ব্বুদ-নামক পর্ব্বতে পূর্ব্বকালে 'আহুক' নামে এক ভীল সস্ত্রীক বাস করিত। একদা এক যোগী রাত্রিকালে তাহার কুটীরে অতিথি হইয়া আসেন। দরিদ্র ভীলের গৃহে তিনজন লোক থাকিবার মত স্থান নাই, অথচ রাত্রিতে ঘরের ভিতর না থাকিলে বাঘের পেটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা; কারণ অর্ব্বুদ-পর্ব্বতের সেই অংশটি হিংস্র নরখাদক ব্যাঘ্রে পূর্ণ ছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ধার্ম্মিক ভীল অতিথিকে ঘরের মধ্যে থাকিতে দিয়া নিজে অস্ত্র-হাতে বাহিরে রহিল। মধ্যরাত্রিতে যখন তাহার চোখে ঘুমের আবেশ আসিল, তখনই একটি ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাকে হত্যা করিল। পরদিন সকালবেলা ভীলের স্ত্রী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হইল। সহমরণের সময় স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—'এই ধর্ম্মপ্রাণ ভীল পরজন্মে নিষধরাজ বীরসেনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজ্যেশ্বর হইবে, আর তাহার পত্নী এই পতিগতপ্রাণা রমণী বিদর্ভদেশের রাজা ভীমের কন্যা হইয়া জন্মিবে। পরজন্মে আহুক নামক ভীলের নাম হইবে নল আর তাহার পত্নীর নাম হইবে দময়ন্তী। পরজন্মেও তাহারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইবে।" জ্ঞান-সংহিতার ৬২তম অধ্যায়ে এই উপাখ্যানটি লিপিবদ্ধ আছে।

শিবপুরাণের সনৎকুমার-সংহিতায় বলা হইয়াছে যে, বারাণসীবাসিনী এক মণ্ডূকী শিবের নির্ম্মাল্য-ভক্ষণজনিত পুণ্যের ফলে পরবর্ত্তী জন্মে 'সুমনাঃ' নামক রাজার কন্যারূপে জন্মিয়া জাতিস্মর হয়।

"চরতে তত্র মণ্ডূকী পঙ্কায়তনমুত্তমম্।
নির্ম্মাল্যং দেবদেবস্য ওঙ্কারেশ্বরসন্নিধৌ ॥
পঙ্কত্বমাগতা এস্মিন্ কালেন কতিনাঙ্গনা।
জাতিস্মরত্বং সম্প্রাপ্তা রাজ্ঞঃ সুমনসো গৃহে ॥" (৪৩ | ২-৩)

আর একটি সুন্দর ঘটনার কথাও সনৎকুমার-সংহিতার ৪৩তম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। প্রতাপমুকুট নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা পুত্রের জন্য একটি বধূ নির্ব্বাচন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে বলিলেন। উত্তরে পুত্র পিতাকে জানাইল যে ইতঃপূর্ব্বে হাজার হাজার বার জন্মগ্রহণ করিয়া সে বিবাহিত জীবনের দুঃখ এবং জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির বেদনা অনুভব করিয়াছে; সুতরাং আর বিবাহিত জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা তাহার নাই। পিতার প্রশ্নের উত্তরে পুত্র বলে যে, শুধু মনুষ্য-যোনিতেই নহে; পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, এমন কি লতা, গুল্ম প্রভৃতি রূপেও সে অনেক জন্ম কাটাইয়াছে। পুত্রের মুখে এইরূপ জন্মান্তরের বিবরণ শুনিয়া রাজা প্রতাপমুকুটের মনেও বৈরাগ্য উপজাত হইল এবং তিনি জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া স্বকীয় পূর্ব্বজন্মসমূহের বৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক পুত্রের সহিত সাধনার পথে অগ্রসর হইলেন।

ধর্ম্মসংহিতা (অধ্যায়—১৬) হইতে আমরা জানিতে পারি যে শিবের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিলে সেই পুণ্যের ফলে মানুষেরা নিজের তো বটেই, পূর্ব্বপুরুষ-গণেরও শত শত জন্মে সঞ্চিত সমুদয় পাপ নষ্ট করিতে সমর্থ হয়। মন্দির-নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সপ্তজন্মে সঞ্চিত যাবতীয় পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্মসংহিতার ৬৩—৬৪তম অধ্যায়দ্বয়ে গর্গের শিষ্য ও কৌশিক মুনির পুত্রগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-কুমারেরা গোহত্যারূপ মহাপাপ করিয়াছিল; কিন্তু হত্যা করিবার পূর্ব্বে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করায় সেই পুণ্যের ফলে তাহারা পরবর্ত্তী বিভিন্ন জন্মে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহারা প্রথম জন্মে ব্যাধরূপে, দ্বিতীয় জন্মে হরিণরূপে, তৃতীয় জন্মে চক্রবাক পক্ষী রূপে এবং চতুর্থ জন্মে হংসরূপে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর পঞ্চম জন্মে ইহাদের একজন রাজপুত্ররূপে এবং আর একজন মন্ত্রিপুত্ররূপে জন্মলাভ করে। অবশিষ্ট ৫ জন পঞ্চম জন্মে পবিত্র কুরুক্ষেত্র-তীর্থে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য হন।

(৫) লিঙ্গপুরাণ

লিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বভাগে শততম অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিভাবে হরগৃহিণী সতী অনাহূতভাবে পিতা দক্ষের যজ্ঞে গিয়াছিলেন এবং কিভাবে তথায় তাঁহার জগৎপূজ্য পতিদেবতার অপমান হইতে দেখিয়া ইহার প্রতিবাদে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার মনোজ্ঞ বর্ণনা উল্লিখিত অধ্যায়টিতে লিপিবদ্ধ আছে। দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সতী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তী জন্মেও তিনি মহাদেবকেই পতিরূপে লাভ করিবেন। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ঠিক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে (১০১তম অধ্যায়ে)। সতী যে পরবর্ত্তী জন্মে হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক 'উমা' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং কঠোর তপস্যার আচরণপূর্ব্বক বিশ্ববন্দ্য মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত ১০১তম অধ্যায়ে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

শুধু সতীর জন্মান্তর-গ্রহণের ঘটনাটিই নহে; পুনর্জ্জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে অন্যান্য বহু তথ্যও লিঙ্গপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্বন্ধে দুইটিমাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। লিঙ্গপুরাণের উত্তরভাগে দানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কথা বলা হইয়াছে। ইহাদের কোন কোনটিতে জন্মান্তরবাদের স্পষ্ট স্বীকৃতি দেখা যায়। গজদানের প্রশংসায় লিঙ্গপুরাণ বলেন—"যে ব্যক্তি শিবভক্তিপ্রদ এই দান করিবে, সে বহুকাল স্বর্গভোগ করিয়া বহুমাতঙ্গপতি রাজা হইবে।" (উত্তরভাগ ৪২।৬)। স্বর্ণ-নির্ম্মিত লোকপাল দান করিলেও মানুষ স্বর্গভোগান্তে সার্ব্বভৌম নৃপতিরূপে জন্ম-লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে লিঙ্গপুরাণের বাক্য যথা—"যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই লোকপাল দান করে, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তি লোকপালদিগের লোকে বহুকাল বাস করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সার্ব্বভৌম রাজা হয়।" (উত্তরভাগ ৪৩।১২)।

(৬) গরুড়পুরাণ

পাপ ও পুণ্যের ফলে নির্দ্দিষ্টকাল যথাক্রমে নরক ও স্বর্গভোগ করিয়া মানুষ কিভাবে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে রহিয়াছে। কিরূপ পাপের ফলে মানুষ কি প্রকার চিহ্ন দেহে লইয়া কিরূপ যোনিতে জন্মান্তর

গ্রহণ করে, এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ গরুড়পুরাণে (পূর্ব্বখণ্ড ১০৪ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সংস্করণ) বর্ণিত হইয়াছে। গরুড়পুরাণে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি দীর্ঘকাল নরকভোগের পর কুকুর, গর্দ্দভ বা উষ্ট্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মদ্যপায়ী ব্যক্তি নরকভোগান্তে ভেক বা পেচক যোনিতে জাত হয়। স্বর্ণচোর নরকভোগের পর কৃমি, কীট প্রভৃতি যোনিতে এবং গুরুপত্নীগামী পাপিষ্ঠ তৃণাদি-স্থাবরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর বহু জন্ম উক্ত যোনিগুলিতে জন্মিবার পর উল্লিখিত পাপাত্মারা পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মনুষ্য-যোনিতে জন্মিয়া ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয় এবং মদ্যপায়ীর দাঁত বিবর্ণ হইয়া থাকে। স্বর্ণচোরেরা কুৎসিত-নখযুক্ত এবং গুরুতল্পগামী ব্যক্তি শিপিবিষ্ট (জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগ চর্ম্মহীন) হইয়া জন্মগ্রহণ করে। খাদ্যচোর উদররোগী এবং বিদ্যাচোর মূক হয়। ধান্যে ভেজাল মিশাইবার পাপে মানুষ নরক-ভোগান্তে অতিরিক্ত অঙ্গ লইয়া জন্মে এবং পরনিন্দাকারী ব্যক্তির নাসিকা জন্মান্তরে দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এইভাবে, অন্যান্য পাপের ফলে মানুষ নরকভোগের পর যে সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাও গরুড়পুরাণের উল্লিখিত অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

প্রেতশিলায় পিণ্ডদানের বর্ণনা-প্রসঙ্গে যে সকল মন্ত্রের উল্লেখ গরুড়পুরাণে (পূর্ব্বখণ্ড ; ৮৫তম অধ্যায় ; বঙ্গবাসী সংস্করণ) রহিয়াছে, তাহাতেও জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"পশুযোনিং গতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
... ...
জাত্যন্তরসহস্রেষু ভ্রমন্তে স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
যে বান্ধবাঽবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা ॥"

গরুড়পুরাণের অন্যান্য স্থানেও জন্মান্তর-সম্বন্ধে আরও বহু কথা বলা হইয়াছে। বাহুল্যবোধে তাহা আর উল্লেখ করিলাম না।

(৭) বৃহন্নারদীয়পুরাণ

মানুষ কিরূপ কর্ম্ম করিলে মৃত্যুর পর কিভাবে নরকভোগ করে এবং নরকভোগান্তে পুনরায় কিরূপ যোনিতে জন্মে, এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ বৃহন্নারদীয়-পুরাণে (বঙ্গবাসী সংস্করণ) চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বর্ণাশ্রমবিরোধী আচরণ করিয়া যে সকল মানব পাষণ্ডতা (নাস্তিকতা) প্রাপ্ত হয়, তাহারা মৃত্যুর পর শত শত কোটীকল্প নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। অতঃপর তিনকল্প কাল বৃক্ষাদি স্থাবরযোনিতে জন্মমৃত্যু লাভ করে। ইহার পর ৬৬০০০ বৎসর বিষ্ঠার ক্রিমিরূপে জন্মমৃত্যু লাভ করতঃ সর্প-যোনিতে জন্মলাভে সমর্থ হয়। এক কল্পকাল সর্পযোনিতে অতিবাহিত করিয়া অতঃপর ইহারা পশুযোনিতে জাত হয়। এক হাজার যুগ পশুযোনিতে জন্মমৃত্যু লাভ করিবার পর ইহারা ম্লেচ্ছরূপে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর দুই জন্ম জারজ-সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পর অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাভে সমর্থ হয়। বৃহন্নারদীয়পুরাণের ভাষায়—

> "প্রায়শ্চিত্তবিহীনানি প্রোক্তান্যেতানি তে প্রভো ?
> অঘানি তেষাং নরকান গচ্ছতো মে নিশাময় ॥
> কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
> পচ্যন্তে নরকেম্বেষু বংশায়ুতসমন্বিতাঃ ॥
> ততঃ কর্ম্মাবসানেন স্থাবরাঃ প্রভবন্তি তে।
> কল্পত্রিতয়পর্য্যন্তং তদন্তে ক্রিময়ো হি তে ॥
> ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ।
> বিষ্ঠাভুজো ভবন্ত্যেতে পুরীষকৃময়স্তথা ॥
> ততস্ত্বাশীবিষাঃ কল্পং তদন্তে পশবো হি তে।
> তথৈব যুগসাহস্রং তদন্তে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥
> ক্রমেণ কর্ম্মশেষেণ গোলোকাঃ প্রভবন্তি তে।
> কুণ্ডাশ্চ জন্মন্যেকস্মিংস্ততো বিপ্রো হ্যকিঞ্চনঃ ॥" (১৪।৭৩—৭৮)

মহাপাতকীরা নরকভোগের পর কিরূপ জন্মলাভ করে, এই সম্বন্ধে নারদীয়-পুরাণ নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন। প্রথমে ইহারা সাত জন্ম গর্দ্দভযোনিতে জন্ম-গ্রহণ করে, অতঃপর দশ জন্ম কুকুররূপে এবং তাহার পর আরও দশ জন্ম বিষ্ঠাভুক্ শূকররূপে জন্মিয়া থাকে। অতঃপর ১০০ বৎসর বিষ্ঠার কীটরূপে জন্মমৃত্যু লাভ

করিবার পর আরও ১০০ বৎসর ইহারা মূষিকযোনিতে অতিবাহিত করে। ইহার পর ১২ জন্ম সর্পরূপে কাটাইবার পর ইহারা বিভিন্ন পশুরূপে আরও সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অতঃপর বৃক্ষাদি স্থাবররূপে ১০০ বৎসর কাটাইয়া পুনরায় ইহারা পশুরূপে জন্মলাভ করে। অতঃপর মনুষ্যযোনিতে প্রবেশ করিয়া ইহারা এক জন্ম বৈশ্যযোনিতে এবং আর একজন্ম ক্ষত্রিয়যোনিতে অতিবাহিত করে। এই সকল যোনিতে জন্মিয়া ইহারা বলবান্ ব্যক্তিগণকর্তৃক নির্য্যাতিত হইতে থাকে এবং অবশেষে অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তানরূপে জন্মলাভে সমর্থ হয়। এই সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয়পুরাণের শ্লোক যথা ঃ—

"তদন্তে পৃথিবীমেত্য সপ্তজন্মসু গর্দ্দভাঃ।
ততঃ শ্বানো বিড়্‌বরাহা ভবেয়ুর্দশ জন্মসু॥
আশতাব্দং বিট্‌কৃময়স্ততস্তে মূষিকা নৃপ!
তাবৎকালং ভবেয়ুশ্চ সর্পাঃ দ্বাদশজন্মসু॥
ততঃ সহস্রজন্মানি মৃগাদ্যাঃ পশবো নৃপ!
শতাব্দং স্থাবরা রাজংস্তদন্তে গোশরীরিণঃ॥
ততশ্চ সপ্ত জন্মানি চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ততঃ ষোড়শ জন্মানি শূদ্রাদ্যা হীনজাতয়ঃ॥
ততস্তু জন্মদ্বিতয়ে বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয় এব চ।
তত্রাপ্যতিবলৈর্নিত্যং বাধ্যমানো হি জীবতি॥
ততশ্চ বিপ্রতাং প্রাপ্য দরিদ্রো ব্যাধিপীড়িতঃ॥" (১৩।৮১-৮৬)

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নানাবিধ ব্রত ও দান প্রভৃতির প্রশংসা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে কোন কোন দান করিলে মানুষের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়, কোনরূপ ব্রতের ফলে সে অযুতজন্মকৃত যাবতীয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, এবং কোন কোন দানের ফলে পুনর্জ্জন্মগ্রহণের দায় হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সাধারণভাবে জন্মান্তরলাভের অপরিহার্য্যতা নানাভাবে বিবৃত হইয়াছে।

(৮) ভাগবতপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে দেবর্ষি নারদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। নারদ নিজেই বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী এক জন্মে তিনি কোন ব্রাহ্মণের দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মায়ের সঙ্গে তিনিও ব্রাহ্মণের সেবা করিতেন এবং

ব্রাহ্মণ গৃহে স্বভাবতঃই ধর্ম্মকথা শুনিবার সুযোগ পাইয়া তিনি দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ হইয়া উঠেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবায়ও তাঁহার আগ্রহ জন্মে এবং এই সকল পুণ্যকার্য্যের ফলে ক্রমেই তাঁহার দেহ ও মন শুদ্ধ হইতে থাকে। ভাগবতের ভাষায় এই সম্বন্ধে নারদের উক্তি ; যথা—

"অহং পুরাতীতভবেঽভবং মুনে !
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্ব্বিবিক্ষতাম্॥ (১।৫।২৩)

অবশেষে একদা রাত্রিকালে গাভীর অন্বেষণে নির্গত হইয়া দাসীটি সর্পদংশনে দেহত্যাগ করে।

"একদা নির্গতাং গেহাদুহন্তীং নিশি গাং পথি।
সর্পোঽদশৎ পদা স্পৃষ্টঃ কৃপণাং কালচোদিতঃ॥ (১।৬।৯)

ব্রাহ্মণের গৃহে ধর্ম্মকথা শুনিয়া এবং সাধুসঙ্গ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই বালকের মনে মুমুক্ষা জন্মিয়াছিল। সম্প্রতি মাতার অকাল মৃত্যুতে তাহার মুমুক্ষা ও বৈরাগ্য তীব্রতর হইয়া উঠিল এবং একদা সকলের অজ্ঞাতসারে বিপ্রগৃহ ত্যাগ করিয়া দাসীপুত্ররূপী নারদ মুক্তির সন্ধানে উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাঞ্জল ভাষায় এই সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

চতুর্থ স্কন্ধে দুর্ব্বৃত্ত বেনরাজার জন্ম সম্বন্ধে যে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও স্পষ্টভাষায়ই জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি আছে। রাজর্ষি অঙ্গ এক সময়ে মহা আড়ম্বরে একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার যজ্ঞের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য দেবতারা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন না। রাজা ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া সদস্যগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্ত্রবিৎ সদস্যগণ রাজাকে জানাইলেন যে, এই জন্মে তিনি কোন অপরাধ করেন নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মে তিনি একটি অপরাধ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে তিনি বর্ত্তমান জন্মে পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, এবং এই কারণেই দেবতারাও তাঁহার যজ্ঞে আসেন নাই। সদস্যগণের পরামর্শ অনুসারে রাজর্ষি অঙ্গ তখন একটি পুত্রেষ্টিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার 'বেন' নামে একটি পুত্র জন্মিল।

"অঙ্গোঽশ্বমেধং রাজর্ষিরাজহার মহাক্রতুম্।
নাজগ্মুর্দেবতাস্তস্মিন্নাহূতা ব্রহ্মবাদিভিঃ॥" (৪।১৩।২২)

প্রভৃতি শ্লোকদ্বারা উল্লিখিত ঘটনাটি শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে। এই বেনই পরে নাস্তিকতারূপ পাপসমূদ্রে নিমগ্ন হইয়া অসুরের মত ব্রহ্মদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং পরিশেষে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে নিহত হন।

মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা কিভাবে দেহান্তর আশ্রয় করে, ইহা বুঝাইবার জন্য চতুর্থ স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ে তৃণ-জলোকার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তৃণজলোকা অর্থাৎ চিনে জোঁক যেমন একটি তৃণ হইতে অন্য তৃণে যাওয়ার সময় প্রথমে তাহার দেহের সম্মুখভাগদ্বারা নূতন তৃণটিকে আঁকড়াইয়া ধরে এবং তাহার পরই পশ্চাতের তৃণগাছিকে ত্যাগ করিয়া আসে, জীবাত্মাও তেমনি প্রথমে বায়বীয় বা অন্য কোনরূপ একটি নূতন দেহ আংশিকভাবে আশ্রয় করিয়া তবেই পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে। ইহারই নাম তৃণ-জলোকান্যায়। ভাগবতের ভাষায়—

"যথা তৃণজলোকেয়ং নাপযাত্যপযাতি চ।
ন ত্যজেন্ম্রিয়মাণোঽপি প্রাগ্‌দেহাভিমতিং জনঃ।
যাবদন্যং ন বিন্দেত ব্যবধানেন কর্ম্মণাম্‌॥" (৪।২৯।৭৭)

পঞ্চম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া রাজর্ষি ভরতের ইতিহাস ও তাঁহার পূর্ব্বজন্মসমূহের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। এই ঘটনাগুলি বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত ঘটনাগুলির অনুরূপ; সুতরাং পৃথগ্‌ভাবে আর বিবৃত করিতেছি না।

ষষ্ঠ স্কন্ধে, মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থিতি ও প্রয়োজনবোধে পুনরায় উপস্থিতি সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার সহস্র পত্নী ছিল; কিন্তু একটিও পুত্র ছিল না। পুত্রলাভের জন্য রাজা মহর্ষি অঙ্গিরার শরণাপন্ন হন এবং মুনির বরে রাজার একটি পুত্র জন্মে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিমাতারা ছেলেটিকে ভাল চক্ষে দেখিত না, এবং একদিন কৌশলে তাহারা খাদ্যে বিষ মিশাইয়া ছেলেটির মৃত্যু ঘটাইল। ছেলের গর্ভধারিণীসহ রাজা চিত্রকেতু পুত্রশোকে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিবার উদ্দেশ্যে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হন এবং রাজাকে জীবাত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন। রাজা-রাণীর প্রার্থনায় দেবর্ষি তখন তাঁহাদের মৃত পুত্রের আত্মাটিকে আহ্বান করেন এবং সে সূক্ষ্মদেহে তথায় উপস্থিত হয়। রাজার প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার সেই বিদেহী পুত্রটি জানায় যে, ইহাই তাহার একমাত্র জন্ম ছিল না; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সে ভিন্ন ভিন্ন মাতাপিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে আরও জানায় যে, বর্ত্তমানে তাহার আর জন্মগ্রহণের ইচ্ছা নাই

এবং পুণ্যবলে সে পুনরায় গর্ভবাস প্রভৃতির দুঃখ না পাওয়ার অধিকারী হইয়াছে। পুত্রের প্রেতাত্মার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া রাজা-রাণীর অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং তাঁহারা সেইদিন হইতে মানসিক শান্তি লাভ করেন। এই সকল ঘটনা ষষ্ঠ স্কন্ধের ১৪—১৬তম অধ্যায়গুলিতে বিবৃত হইয়াছে।

সপ্তম স্কন্ধে প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলকভেদে বৈদিক কর্ম্মের দ্বৈবিধ্য বর্ণনা প্রসঙ্গেও বলা হইয়াছে যে প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম সম্পাদন করিলে মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

"প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
আবর্ত্ততে প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেনাশ্নুতেঽমৃতম্॥" (৭।১৫।৪৭)

এই প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদের দুইটি পূর্ব্বজন্মের বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। নারদ নিজেই বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী এক জন্মে তিনি গন্ধর্ব্বরাজের পুত্ররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং যথাকালে রাজত্ব লাভ করিয়া বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন। এক সময়ে দেবতাদের যজ্ঞে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া তিনি নিজের অবিবেচনা-মূলক কার্য্যদ্বারা প্রজাপতিগণের অসন্তোষ সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাদের অভিশাপে মৃত্যুর পর শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। অভিশপ্ত হইয়া তিনি প্রজাপতিগণের কাছে বহু অনুনয় বিনয় করায় শূদ্রযোনিতে জন্মিলেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পান এবং তাঁহাদের মুখে পুণ্যকথা শ্রবণ করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হন। দেবর্ষির শূদ্রজন্মের বিবরণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'উপবর্হণ' নামক গন্ধর্ব্বরূপে তিনি যে জন্মগ্রহণ করেন, এই সম্বন্ধে ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"অহং পুরাভবং কশ্চিদ্ গন্ধর্ব্ব উপবর্হণঃ।
নাম্নাতীতে মহাকল্পে গন্ধর্ব্বাণাং সুসম্মতঃ॥
রূপ-পেশল-মাধুর্য্য-সৌগন্ধ্যপ্রিয়দর্শনঃ।
স্ত্রীণাং প্রিয়তমো নিত্যং মত্তঃ স্বপুরলম্পটঃ॥
একদা দেবসত্রে তু গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ।
উপহূতা বিশ্বসৃগ্‌ভির্হরিগাথোপগায়নে॥
অহঞ্চ গায়ংস্তদ্বিদ্বান্ স্ত্রীভিঃ পরিবৃতো গতঃ।
জ্ঞাত্বা বিশ্বসৃজস্তন্মে হেলনং শেপুরোজসা॥
যাহি ত্বং শূদ্রতামাশু নষ্টশ্রীঃ কৃতহেলনঃ॥ (৭।১৫।৬৯—৭৩)

অষ্টম স্কন্ধে গজ ও কুম্ভীরের দ্বন্দ্বের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে তাহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া ভাগবতের ঋষি জানাইয়াছেন যে, এই কুম্ভীরটি পূর্ব্বজন্মে গন্ধর্ব্বকুলে জন্মিয়া 'হুহু' নামে অভিহিত হইত এবং একদা মহর্ষি দেবলকে অসন্তুষ্ট করিবার ফলে তাঁহার অভিশাপে কুম্ভীর জন্ম লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কুম্ভীরটি মুক্তিলাভে সমর্থ হয়।

"যোঽসৌ গ্রাহঃ স বৈ সদ্যঃ পরমাশ্চর্য্যরূপধৃক্।
মুক্তো দেবলশাপেন হূহূর্গন্ধর্ব্বসত্তমঃ॥" (৮।৪।৩)

হস্তীটি পূর্ব্বজন্মে ছিল পাণ্ড্যদেশের রাজা। তাহার নাম ছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। একদা স্নানান্তে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তিনি শ্রীহরির অর্চ্চনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এমন সময় মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া রাজভবনে উপস্থিত হন। পূজাকার্য্যে নিযুক্ত রাজা অতিথিদের যথারীতি অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহামুনি অগস্ত্য তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে, অতিথির সম্বর্দ্ধনা না করিয়া রাজা যে ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়াছেন, এই পাপে পরজন্মে তিনি হস্তী রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

"স বৈ পূর্ব্বমভূদ্রাজা পাণ্ড্যো দ্রবিড়সত্তমঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ॥" (৮।৪।৭)

প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে উল্লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

দেবমাতা অদিতির প্রার্থনায় ভগবান্ বিষ্ণু যে বামনরূপে তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সর্ব্বজনবিদিত ঘটনাটি অষ্টম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেভাবে দেবকীর গর্ভে শ্রীভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বস্তুতঃ জন্মান্তরগ্রহণেরই একটি বর্ণনা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শিশুকালে যে দুইটি অর্জ্জুনবৃক্ষ উৎপাটন করিয়াছিলেন, তাহারা পূর্ব্বজন্মে গন্ধর্ব্বপুত্র ছিল এবং তখন তাহাদের একজনের নাম ছিল নলকূবর এবং অপর জনের নাম ছিল মণিগ্রীব। উক্ত গন্ধর্ব্বদ্বয় এক সময়ে দেবর্ষি নারদের অপ্রিয় আচরণ করেন এবং ফলে নারদের শাপে তাঁহাদিগকে বৃক্ষযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রমাণস্বরূপ ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। যথা—

"কৃষ্ণস্তু গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং মাতরি প্রভুঃ।
অদ্রাক্ষীদর্জ্জুনৌ পূর্ব্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ॥
পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ।
নলকূবর-মণিগ্রীবাবিতি খ্যাতৌ প্রিয়ান্বিতৌ॥ (১০।৯।২২-২৩)

দশম স্কন্ধের ৩৪শ অধ্যায়ে আর একটি জন্মান্তরগ্রহণের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। একদা শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা নন্দ পবিত্র সরস্বতীনদীর তীরবর্ত্তী অম্বিকাবনে গেলে সহসা এক অজগর তাঁহাকে ধরিয়া গ্রাস করিতে থাকে। নন্দ তখন এই বিপদ্ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য রাম-কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া সর্পের কবল হইতে পিতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উক্ত সর্পের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া অজগরটি দিব্যদেহ ধারণ করে এবং বলে যে, পূর্ব্বজন্মে সে সুদর্শন নামে গন্ধর্ব্ব ছিল। এক সময়ে অঙ্গিরোবংশীয় মুনিদিগকে কদাকার দেখিয়া সে বিদ্রূপ করিতে থাকে এবং ফলে ঋষিরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ দেন। ঋষিদের অভিশাপের ফলেই সে সর্পযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে সর্প যে কথাগুলি বলিয়াছিল, ভাগবতের ভাষায় তাহা নিম্নপ্রকার—

"অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ।
শ্রিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরন্ দিশঃ॥
ঋষীন্ বিরূপানঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ।
তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলব্ধাং স্বেন পাপ্মনা॥"

(১০।৩৪।৯—১০)

৬৪তম অধ্যায়ে কৃকলাসসংক্রান্ত যে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে তাহাও জন্মান্তর-গ্রহণেরই আর একটি প্রমাণ। একটি বৃহদাকৃতি কৃকলাস শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে মুক্তিলাভ করিয়া নিজ পূর্ব্বজন্মের কাহিনী বিবৃত করে। এই কৃকলাস পূর্ব্বজন্মে ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজ্যেশ্বর হন। সেই জন্মে তাঁহার নাম ছিল নৃগ। রাজা নৃগ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন এবং সর্ব্বদা দানাদি সৎকার্য্য করিতেন। এক সময়ে কোন ব্রাহ্মণের একটি গাভী রাজার গরুর দলে মিলিত হয় এবং রাজা ভ্রমবশতঃ নিজের মনে করিয়া সেই গাভীটি অন্য এক ব্রাহ্মণকে দান করেন। এই পাপের ফলেই রাজর্ষি নৃগ পরজন্মে কৃকলাসযোনিতে জাত হন।

(৯) অগ্নিপুরাণ

অগ্নিপুরাণের ৩৮তম অধ্যায়ে বিভিন্নপ্রকার প্রতিমানির্ম্মাণের ফল বিবৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, স্বর্ণদ্বারা শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণেশ, চণ্ডী, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্য হয় এবং এইরূপ প্রতিমার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্যাত্মা নির্ম্মাণকারীর সপ্তজন্মার্জ্জিত যাবতীয় পাপের বিনাশ ঘটে।

"সপ্তজন্মার্জ্জিতং পাপং প্রারম্ভাদেব নশ্যতি ॥" (৩৮।৩৩)

জন্মান্তর না থাকিলে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপনাশের প্রশ্নই উঠে না; সুতরাং উল্লিখিত বাক্যদ্বারা জন্মান্তরবাদের সুদৃঢ় স্বীকৃতিই অবগত হওয়া যায়। এইরূপ অন্যান্য কথাও অগ্নিপুরাণে আছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা আর লিখিলাম না।

(১০) স্কন্দপুরাণ

স্কন্দপুরাণ অতি বিশাল গ্রন্থ। ইহার বিভিন্ন খণ্ডের নানা স্থানে জন্মান্তর সম্বন্ধে অসংখ্য তথ্য ও উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মহেশ্বরখণ্ডের অন্তর্গত কেদারখণ্ডে সতীর দেহত্যাগ ও পার্ব্বতীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিশ্রুতকীর্ত্তি প্রজাপতি দক্ষ কনখল তীর্থে এক বিপুল যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে অনাহূতভাবে গিয়া পতিনিন্দাশ্রবণে দক্ষকন্যা সতী দেহত্যাগ করেন। পরজন্মে তিনি মেনকার গর্ভে হিমালয়কন্যারূপে জন্মিয়া পার্ব্বতী নামে খ্যাত হন এবং পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়া শিবের উপাসনা করিতে থাকেন। পার্ব্বতীর উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া যখন শিব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং বর দিতে চাহিলেন, তখন পার্ব্বতী লজ্জাজড়িতকণ্ঠে বলিলেন—"নাথ! পূর্ব্বের কথা কি আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন? কিভাবে আপনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন এবং কিভাবে আমি আপনার পত্নী হইয়াও দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগপূর্ব্বক আপনারই নির্দ্দেশে দেবতাদের প্রার্থনানুযায়ী তারকাসুরের বধ ঘটাইবার জন্য মেনকার গর্ভে পুনরায় জন্মিয়াছি, তাহা কি আপনার স্মরণ নাই?" স্কন্দপুরাণের ভাষায়—

"ব্রীড়য়া পরয়া যুক্তা সাধ্বী প্রোবাচ শঙ্করম্।
ত্বং নাথ মম দেবেশ! ত্বয়া কিং বিস্মৃতং পুরা ॥

দক্ষযজ্ঞবিনাশশ্চ যদর্থং কৃতবান্ প্রভো !
স ত্বং সাহং সমুৎপন্না মেনায়াং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥
দেবানাং দেবদেবেশ ! তারকস্য বধং প্রতি ॥

—কেদারখণ্ড ২১।৮৪-৮৬

শিবের সঙ্গেই যে পার্ব্বতীর বিবাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন, এই সম্বন্ধে যুক্তি-প্রদর্শনকালে মেনকাও তাঁহার স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, শিবপত্নী সতীই পার্ব্বতীরূপে জন্মিয়াছেন এবং শিবের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্টও করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে মেনকার উক্তি যথা—

"অনয়ারাধিতো রুদ্রো রুদ্রেণ পরিভাবিতা।
ইয়ং সতী মহাভাগা শিবায় প্রতিদীয়তাম্ ॥" —কেদারখণ্ড ২৩।১৭

মাহেশ্বরখণ্ডের অন্য একটি অংশের নাম কুমারিকাখণ্ড। ইহাতে মানস-সরোবরবাসী 'মন্থর' নামক দীর্ঘজীবী কূর্ম্মের দীর্ঘজীবনলাভের কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি জন্মের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কূর্ম্ম নিজ মুখেই তাহার পূর্ব্বজন্মের ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী এক জন্মে এই কূর্ম্ম ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছিল। তখন লোকে তাহাকে শাণ্ডিল্য বলিয়া ডাকিত। বাল্যবয়সে এই শাণ্ডিল্য ক্রীড়াচ্ছলে শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও সে ভক্তিভরে সর্ব্বদা শিবের অর্চ্চনা করিত। এই পুণ্যের ফলে মৃত্যুর পর সে বিদিশা নগরে পুনরায় ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং স্বভাবতঃ শিবভক্ত ও জাতিস্মর হয়। শিবের বরে ইহার পরবর্ত্তী জন্মে সে বিখ্যাত সূর্যবংশে জন্মিয়া এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হয়। প্রতিষ্ঠানপুরে ছিল তাহার রাজধানী এবং তাহার নাম ছিল জয়দত্ত। এই রাজা জয়দত্তও জাতিস্মর ছিলেন। পরম ধার্ম্মিক রাজা জয়দত্ত সর্ব্বদা ভক্তিভরে শিবার্চ্চনা করিতেন এবং বিভিন্ন স্থানে শিবের মন্দিরও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে বর দিতে চাহেন এবং রাজা জয়দত্তও অজয় এবং অমর হইবার জন্য বর প্রার্থনা করেন। আশুতোষ শিবের নিকট হইতে এই বর লাভ করিবার পর জয়দত্তের মতিবিভ্রম ঘটে, এবং সে শিবার্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ কুকর্ম্মে রত হয় এবং যখন তখন পরদার ধর্ষণ করিতে থাকে। শিবের বরে জয়দত্ত মৃত্যুহীন হইয়াছিল ; সুতরাং যমও তাহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না। অসহায় যম তখন কৈলাসে গিয়া মহাদেবের কাছে জয়দত্তের দুষ্কর্ম্মের বিবরণ জানান।

পতিব্রতা রমণীগণ শিবের অতি প্রিয়। তাঁহারই বরে অমরত্ব লাভ করিয়া পাপিষ্ঠ জয়দত্ত পতিব্রতাদের সতীত্ব নষ্ট করিতেছে জানিয়া শিব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই তিনি জয়দত্তকে তাঁহার কাছে আনাইয়া অভিশাপ দিলেন যে, অতঃপর এই পাপিষ্ঠ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কূর্ম্মদেহ লাভ করিবে। হতভাগ্য জয়দত্ত অনেক সাধ্য-সাধনা করিলে পর শিব সন্তুষ্ট হইয়া বলেন—"এখনই তুমি কূর্ম্মদেহ ধারণ করিবে; তবে দীর্ঘকাল কূর্ম্মরূপে বাস করিবার পর ৬০তম কল্পে শাপমুক্ত হইয়া আমার পার্শ্বচরত্ব লাভ করিতে পারিবে।" ইহাই কূর্ম্মের কূর্ম্মত্ব ও দীর্ঘজীবন লাভের কারণ। 'কুমারিকা'খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। স্কন্দপুরাণের ভাষায় কূর্ম্মের উক্তি; যথা—

"শাণ্ডিল্য ইতি বিখ্যাতঃ পুরাহমভবং দ্বিজঃ।
বালভাবে ময়া ভূপ! ক্রীড়মানেন নির্ম্মিতম্॥
পুরা প্রাবৃষি পাংশূত্থং শিবায়তনমুচ্ছ্রিতম্।
... ...

ততো মৃতোঽহং জাতশ্চ বিপ্রো জাতিস্মরো নৃপ!
বৈদিশে নগরেঽকার্ষং শিবপূজাং বিশেষতঃ॥
... ...

জাতো জাতিস্মরস্তত্র তৃতীয়েঽহং ভবান্তরে।
সার্ব্বভৌমো মহীপালঃ প্রতিষ্ঠানে পুরোত্তমে॥
জয়দত্ত ইতি খ্যাতঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ।
... ...
কেবলং শিবলিঙ্গানাং পূজাং পুষ্পৈঃ করোম্যহম্।
ততো মে ভগবাঞ্ছম্ভুঃ সন্তুষ্টোঽথ বরং দদৌ॥
অজরামরতাং রাজংস্তেনৈব বপুষা বৃতঃ।
... ...
বিচরামি মহীমেতাং মদান্ধ ইব বারণঃ।
শিবভক্তিং বিহায়াথ নৃপোঽহং মদনাতুরঃ॥
প্রধর্ষয়িতুমারব্ধং স্ত্রিয়ঃ পরপরিগ্রহাঃ॥"

কামান্ধ জয়দত্তের প্রতি শিবের অভিশাপ-বাক্য যথা—

"যস্মাদ্দুষ্টসমাচার ! ধর্ষিতাস্তে পতিব্রতাঃ।
কামার্ত্তেন, ময়া শপ্তস্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ ক্ষণাদ্ ভব ॥"

শাপমুক্তি সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণের বাক্য যথা—

"প্রাহ ষষ্টিতমে কল্পে বিশাপো ভবিতা গণঃ।
মদীয় ইতি সম্প্রোচ্য জগামাদর্শনং শিবঃ ॥"

বিষ্ণুখণ্ডের অন্তর্গত বৈশাখমাসমাহাত্ম্যখণ্ডে (অধ্যায়—১৫) পুরুযশাঃ নামক রাজার পূর্ব্বজন্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ক্ষুধার্ত্তকে জল না দেওয়ার জন্য এই পাপে পুরুযশাঃ ঐ জন্মে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

কাশীখণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধে ২৪শ অধ্যায়ে শিবশর্ম্মার পুনর্জ্জন্ম ও কাশীপ্রাপ্তি প্রভৃতির বিবরণ, ৩৩ তমাধ্যায়ে বিদ্যাধর ও সুশীলার জন্মান্তরগ্রহণ, ৩৪তম অধ্যায়ে কলাবতীর পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি এবং ৪৯তম অধ্যায়ে দ্রৌপদীর পঞ্চপতিলাভের হেতু বর্ণনা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বজন্মে তৎকর্ত্তৃক পাঁচবার পতিবর প্রার্থনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। উত্তরার্দ্ধের ৯৩ তমাধ্যায়ে ব্রহ্মার পুত্ররূপে শিবের এবং দক্ষের কন্যারূপে পার্ব্বতীর জন্মগ্রহণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ আরও বহু বিবরণ স্কন্দপুরাণের বিভিন্ন খণ্ডে রহিয়াছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় অধিক প্রকাশে বিরত রহিলাম।

(১১) ভবিষ্যপুরাণ

ভবিষ্যপুরাণের ব্রাহ্মপর্ব্বে তিথিমাহাত্ম্য ও বিভিন্ন ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল প্রসঙ্গে নানাস্থানে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দেখা যায়। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়ার নাম 'পুষ্পদ্বিতীয়া'। এইদিন পুষ্পাহারী হইয়া বিধি অনুসারে ব্রতের আচরণ করিলে মানুষ দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করতঃ পুনরায় মনুষ্যলোকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পর পর সাত জন্ম তিনি এইভাবে বিপ্রবংশে জন্মিয়া বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া সকলের কাছে সম্মানিত হন। অতঃপর সত্যযুগে বিপ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মিবামাত্র সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। এই জন্মে তিনি সর্ব্ববিধ আধি-ব্যাধির পীড়া হইতে মুক্ত থাকেন। কয়েকবার এইরূপ জন্মগ্রহণ করিবার পর অবশেষে তিনি সমগ্র মধ্যদেশের রাজা হন। ভবিষ্যপুরাণের ভাষায়—

"সুচিরং দিবি নারীভির্লোকেঽসৌ রমতেঽশ্বিনোঃ।
ইহ চাগত্য কল্পান্তে জাতো বিপ্রঃ পুরস্কৃতঃ ॥
বেদবেদাঙ্গবিদুষঃ সপ্তজন্মান্তরাণ্যসৌ ॥
জাতো জাতো ভবেদ্ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণোঽসৌ কৃতে যুগে।
দাতা যজ্ঞপতির্বাগ্মী আধিব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ ॥
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতঃ সহ পত্ন্যাবসচ্চিরম্।
মধ্যদেশে সুনগরে ধর্ম্মিষ্ঠো রাজ্যভাগ্ ভবেৎ ॥" (৩০।৮৫—৮৭)

বিভিন্ন ব্রতের প্রসঙ্গে এই প্রকার বহুবিধ উক্তি বিভিন্ন অধ্যায়ে রহিয়াছে।

উত্তরপর্ব্বের চতুর্থ-অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন প্রসঙ্গে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে আরও বহু স্পষ্ট কথা বলা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিয়াছেন—

"দেবত্বং মানুষত্বঞ্চ তির্য্যক্ত্বং কেন হেতুনা।
প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কেন গর্ভবাসং সুদারুণম্ ॥"

[মানুষ কিরূপ কর্ম্ম করিলে দেবত্ব, কিরূপ কর্ম্ম করিলে মনুষ্যত্ব এবং কিরূপ কর্ম্ম করিলে তির্য্যক্ত্ব লাভ করে, তাহা আমাকে বলুন। কি কারণে মানুষ পুনঃ পুনঃ গর্ভবাসের যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হয়, তাহাও আমাকে বলুন।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—শুভ কর্ম্ম করিলে মানুষ দেবত্বপ্রাপ্ত হয়, শুভাশুভ মিশ্র কর্ম্ম করিলে মনুষ্যলোকে জন্মে এবং কেবল অশুভ কর্ম্ম করিলে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মিয়া থাকে। ভবিষ্যপুরাণের ভাষায়—

"শুভৈর্দেবত্বমাপ্নোতি মিশ্রৈর্মানুষতাং ব্রজেৎ।
অশুভৈঃ কর্ম্মভির্জন্তুস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে ॥" (৪।৬)

উল্লিখিত শ্লোকে যে শুভাশুভ কর্ম্মের কথা বলা হইল, তাহা কাহারও খেয়ালখুশীমত নির্দ্ধারণ করিলে চলিবে না। বেদাদিশাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম বিহিত এবং যেগুলি অবিহিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদিগকেই যথাক্রমে শুভ ও অশুভ কর্ম্মরূপে বিবেচনা করিতে হইবে। এইরূপ শুভাশুভ কর্ম্মের ফলেই উল্লিখিত প্রকারে জন্মান্তর লাভ হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যথা—

"প্রমাণং শ্রুতিরেবাত্র ধর্ম্মাধর্ম্মবিনিশ্চয়ে ॥" (৪।৭)

(১২) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মসমূহে নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই পরবর্ত্তী জন্মে উচ্চবংশে জাত হন। এইভাবে যাঁহারা বর্ত্তমান জন্মে ভোগাসক্ত হন, তাঁহাদিগকে পরবর্ত্তী জন্মে হীনযোনিতে প্রবেশ করিতে হয়।

"বিনা বিপত্তের্ম্মহিমা পুংসাং নৈব ভবেৎ স্থত!
সুখং দুঃখঞ্চ সর্ব্বেষাং ক্রমেণ প্রভবেদিতি॥"

—ব্রহ্মখণ্ড ১৩ | ১১

এই প্রসঙ্গে যে উপাখ্যানটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। দেবসভায় রম্ভার নৃত্য দেখিয়া উপবর্হণ নামক গন্ধর্ব্বের চিত্তবিকার হয়। তখন তাঁহার এই অসংযমের জন্য ব্রহ্মা তাঁহাকে অভিশাপ দেন এবং তাহারই ফলে উপবর্হণ শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে জানা যায় যে, কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিলে মৃত্যুর পর নরকভোগান্তে তিনি চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

"যঃ শূদ্রপত্নীং গৃহ্লাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
স চণ্ডালো ভবেৎ সত্যং ন কর্ম্মার্হো দ্বিজাতিষু॥"

—ব্রহ্মখণ্ড ২০ | ২৮

কিভাবে ব্রহ্মার শাপে দেবর্ষি নারদ প্রথমে গন্ধর্ব্বযোনিতে এবং অতঃপর দাসী-পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ ব্রহ্মখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সর্ব্বদাই সৃষ্টির প্রসার-দর্শনে অভিলাষী। এক সময়ে তিনি নিজ পুত্রদিগকে নির্দ্দেশ দেন যে তাহারা যেন বিবাহ করিয়া সৃষ্টিপ্রসারে ব্রতী হন। বিষয়বিরাগী দেবর্ষি নারদ তখন ব্রহ্মাকে পাল্টা কয়েকটি প্রশ্ন করেন। পুত্রের এইরূপ ঔদ্ধত্য দেখিয়া ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং নারদকে অভিশাপ দেন যে তিনি নারীলোলুপ গন্ধর্ব্বদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উপবর্হণ নামে খ্যাতিলাভ করিবেন এবং দীর্ঘজীবন লাভকরতঃ অসংখ্য সন্তান উৎপাদন করিয়া কালগ্রাসে পতিত হওয়ার পর পুনরায় একটি দাসীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

ব্রহ্মার অভিশাপ নিষ্ফল হইবার মত নহে; সুতরাং নারদকে গন্ধর্ব্বকুলে জন্ম-গ্রহণ করিতে হইল। দেহত্যাগের পূর্ব্বে নারদ পিতার কাছে বর চাহিলেন যে, কোন জন্মেই যেন তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি এবং বিষ্ণুভক্তি নষ্ট না হয়। তিনি

যুক্তি দেখাইলেন যে, জাতিস্মর ব্যক্তি হীন শূকরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও বিষ্ণুভক্ত হইতে পারে এবং এই বিষ্ণুভক্তির ফলে মৃত্যুর পর গোলোকধামে বিষ্ণুর পার্শ্বচর হইবার অধিকার লাভ করে।

"জাতিস্মরো হরের্ভক্তিযুক্তঃ শূকরযোনিষু।
জনিং লভেৎ সপ্রসবো গোলোকং যাতি কর্ম্মণা॥"

—ব্রহ্মখণ্ড ৮ | ৫৪

ব্রহ্মখণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, নারদ উপবর্হণ-গন্ধর্ব্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু নারীর পতি হন। দেবসভায় নর্ত্তনপরায়ণা অপ্সরা রম্ভাকে দেখিয়া উপবর্হণের রেতঃস্খলন হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ দেন—

"ব্রজ ত্বং শূদ্রযোনিত্বং গান্ধর্ব্বীং তনুমুৎসৃজ।
কালে বৈষ্ণবসংসর্গাৎ সৎপুত্রস্ত্বং ভবিষ্যসি॥"

—ব্রহ্মখণ্ড ১৩ | ১০

[তুমি এখনই গন্ধর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। যথাকালে বৈষ্ণবের পুণ্যসংসর্গ লাভ করিয়া পুনরায় আমার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারিবে।] এই প্রসঙ্গে যে সকল সাধারণ নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে বলা হইয়াছে যে, কোন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে সে ক্লেশদায়ক নরকে পতিত হয় এবং ১৪ জন ইন্দ্রের রাজত্বকাল ব্যাপিয়া তথায় যন্ত্রণাভোগ করিতে থাকে। ব্রাহ্মণকন্যাটিরও একই প্রকার পরিণতি ঘটে, তবে তাহার নরকভোগকাল আরও দীর্ঘতর। ১৮ জন ইন্দ্রের রাজত্বকাল ব্যাপিয়া তাহাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতঃপর সেই শূদ্রপুরুষ ও ব্রাহ্মণকন্যা উভয়েই চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া আত্মীয়গণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ভাষায়—

"শূদ্রো বা যদি গৃহ্লাতি ব্রাহ্মণীং জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
স পচ্যতে কালসূত্রে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
অষ্টাদশেন্দ্রাবচ্ছিন্নং কালঞ্চ কালসূত্রকে।
ব্রাহ্মণী পচ্যতে তত্র ভক্ষিতা কৃমিভির্ধ্রুবম্॥
ততশ্চণ্ডালযোনৌ চ লব্ধ্বা জন্ম চ ব্রাহ্মণী।
শূদ্রশ্চ কুষ্ঠী ভবতি জ্ঞাতিভিঃ পরিবর্জ্জিতঃ॥"

—ব্রহ্মখণ্ড ২০ | ৩৫—৩৭

উল্লিখিত অভিশাপের ফলে উপবর্হণ নামক গন্ধর্ব্ব কশ্যপমুনির ঔরসে দ্রুমিল নামক শূদ্রের ভার্য্যা কলাবতীর গর্ভে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিবরণটি ব্রহ্মখণ্ডের ২০তম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রকৃতিখণ্ডে যে বেদবতীর উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতেও জন্মান্তরের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগবান্ বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বেদবতী কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন। তখন দৈববাণীর মাধ্যমে ভগবান্ তাঁহাকে জানান যে, পরবর্ত্তী জন্মে তিনি শ্রীহরিকে পতিরূপে লাভ করিবেন। উক্ত দৈববাণী যথা—

"জন্মান্তরে তে ভর্ত্তা চ ভবিষ্যতি হরিঃ স্বয়ম্।
ব্রহ্মাদিভির্দুরারাধ্যং পতিং লপ্স্যসে সুন্দরি !"

—প্রকৃতিখণ্ড ১৪ | ৯

উল্লিখিত বর লাভ করিয়াও বেদবতী সন্তুষ্ট হইলেন না। বর্ত্তমান জন্মেই শ্রীহরিকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য তিনি তখনও তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাক্ষসরাজ রাবণ বনমধ্যে তাঁহাকে একাকিনী পাইয়া বলাৎকার করিতে উদ্যত হয়, এবং বেদবতী তাহাকে অভিশাপ দিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করেন। পরে এই বেদবতীই রাবণ-বিনাশের জন্য সীতারূপে জন্মগ্রহণ করতঃ রামরূপী ভগবান্ বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করেন।

"সা চ কালান্তরে সাধ্বী বভূব জনকাত্মজা।
সীতাদেবীতি বিখ্যাতা যদর্থে রাবণো হতঃ ॥"

—প্রকৃতিখণ্ড ১৫ | ২১

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডেও জন্মান্তরবাদের অনুকূলে বিভিন্ন প্রমাণ রহিয়াছে। পার্ব্বতী মহাদেবকে ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়া পূজাদিদ্বারা তাঁহার তুষ্টিবিধান করিয়াছিলেন। তখন মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া পার্ব্বতীকে বর দেন যে, তিনি প্রত্যেক জন্মেই মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবেন। এই সম্বন্ধে মহাদেবের উক্তি যথা—

"সপ্তপ্রদক্ষিণীকৃত্য যতো ভক্ত্যা ত্বয়া নতাঃ।
সর্ব্বজন্মনি তুষ্টোঽহং তৎফলং লভ সুন্দরি ॥"

—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৩৯ | ২৮

মহর্ষি বশিষ্ঠ পার্ব্বতী-সম্বন্ধে হিমালয়ের কাছে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও জন্মান্তর এবং জাতিস্মরবাদ সম্বন্ধে স্বীকৃতি রহিয়াছে। পার্ব্বতীর পূর্ব্বজন্মের কথা

স্মরণ করিয়া বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, তিনি এই জন্মেও জাতিস্মর হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বশিষ্ঠের উক্তি যথা—

"জাতিস্মরা চ সর্ব্বজ্ঞা সিদ্ধিদা সিদ্ধিরূপিণী।
তস্যা অস্থিস্থিতং ভস্ম ভক্ত্যা ধত্তে শিবঃ স্বয়ম্॥

—ঐ ৪১ | ১৬

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিবিধ প্রসঙ্গেও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ জন্মান্তরবাদের পক্ষে নানা কথা বলিয়াছেন। ব্যভিচারিণী নারীর নিন্দাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি উহার রান্না করা অন্ন ভক্ষণ করে, তাহার সপ্তজন্মের অর্জ্জিত সমুদয় পুণ্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

"পুংশ্চল্যান্নঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে দৈবাদ্ যদি নরাধমঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্॥" (২৩ | ৩৯)

তীর্থমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গেও জন্মান্তরের স্বীকৃতি রহিয়াছে। প্রমাণস্বরূপ,

"তত্র স্নাত্বা পুনর্জ্জন্ম নরাণাং ন ভবেদ্ গিরে!" (৪৩ | ২৩)

প্রভৃতি বাক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১৩) মার্কণ্ডেয়পুরাণ

মার্কণ্ডেয়পুরাণের একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারাই জনগণের হিতসাধন এবং পৃথিবীর ভার হরণ করিবার উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির-প্রভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"তেজোভাগৈস্ততো দেবা অবতেরুর্দ্দিবো মহীম্।
প্রজানামুপকারার্থং ভূভারহরণায় চ॥" (৫।২০)

মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে এক সময়ে বিশ্বামিত্রের ভীষণ কলহ হয়। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে অভিশাপ দেন যে মৃত্যুর পর বিশ্বামিত্র বকরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বামিত্র সেই পুণ্যাত্মা নৃপতিকে যে ক্লেশ দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ এই অভিশাপ দেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণের ভাষায় বশিষ্ঠের শাপ যথা—

"তস্মাদ্দুরাত্মা ব্রহ্মদ্বিট্ প্রাজ্ঞানামবরোপিতঃ।
মচ্ছাপোপহতো মূঢ়ঃ স বকত্বমবাপ্স্যতি॥" (৯ | ৯)

বিশ্বামিত্রও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি পাল্টা অভিশাপ দেন যে, বশিষ্ঠও মৃত্যুর

পর আড়িপক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। বিশ্বামিত্রের যুক্তি এই যে, শুনঃশেপ নামক একটি ব্রাহ্মণ বালককে যজ্ঞে বধ করিবার জন্য হরিশ্চন্দ্র মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং স্বভাবতঃ পুণ্যাত্মা রাজাকে উল্লিখিত মহাপাপ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই বিশ্বামিত্র তাঁহাকে নিদারুণ ক্লেশে নিপাতিত করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের দৃষ্টিতে রাজাকে ক্লেশদান করিয়া তিনি কোন অপরাধ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার প্রতি অনর্থক শাপ প্রদানের জন্য তিনি বশিষ্ঠকেও পাল্টা শাপ দিলেন। বিশ্বামিত্রকর্তৃক প্রদত্ত অভিশাপ সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়পুরাণের শ্লোক যথা—

"শ্রুত্বা শাপং মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽপি কৌশিকঃ।
ত্বমপ্যাড়ির্ভবস্বেতি প্রতিশাপমযচ্ছত॥ (৯ | ১০)

মার্কণ্ডেয়পুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে উভয় ঋষিরই উল্লিখিত অভিশাপ-বাক্য দুইটি ফলিয়াছিল এবং পরবর্তী জন্মে বিশ্বামিত্র বকরূপে ও বশিষ্ঠ আড়িপক্ষী রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণের ভাষায়—

"অন্যোন্যশাপাত্তৌ প্রাপ্তৌ তির্য্যক্‌ত্বং পরমদ্যুতী।
বশিষ্ঠঃ স মহাতেজা বিশ্বামিত্রশ্চ কৌশিকঃ॥" (৯ | ১১)

মার্কণ্ডেয়পুরাণের প্রথমদিকে পিতাপুত্রের যে কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে, তাহাদ্বারাও জন্মান্তরবাদ দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়। ভৃগুবংশে সুমতি নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার একটি পুত্র জড়ের ন্যায় আচরণ করিত। পুত্রের উপনয়নসংস্কার করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে যথাবিধি বেদপাঠ করিতে বলিলেন এবং অন্যান্য বহু উপদেশ দিলেন; কিন্তু পুত্রটি তাঁহার কোন নির্দ্দেশই মানিয়া চলিল না। পিতা প্রায় রোজই উপদেশ দেন এবং পুত্র উহা শুনিয়াও যেন শুনে নাই, এইরূপ ভাব দেখায়। অবশেষে একদিন পিতা পুত্রকে উত্তমরূপে বুঝাইতে থাকিলে পুত্রটি তাহার জড়বদাচরণের হেতু বর্ণনা করে। সে পিতাকে জানায় যে, অতীত-কালে এক অযুত জন্মে সে পিতার নিকট হইতে অনুরূপ উপদেশই শুনিয়া আসিয়াছে। এই সম্বন্ধে পুত্রের উক্তি যথা—

"তাতৈতদ্ বহুশোঽভ্যস্তং যৎত্বয়াদ্যোপদিশ্যতে।
তথৈবান্যানি শাস্ত্রাণি গল্পানি বিবিধানি চ।
জন্মনামযুতং সাগ্রং মম স্মৃতিপথং গতম্॥" —অধ্যায় ১০

পিতা যখন পুত্রের অতীত জন্মগুলির বিবরণ জানিতে চাহিলেন, তখন পুত্র বলিল যে, বহুজন্ম পূর্ব্বে সে ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া আত্মবিদ্যার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছিল।

"অহমাসং পুরা বিপ্রো ন্যস্তাত্মা পরমাত্মনি।

আত্মবিদ্যাবিচারেষু পরাং নিষ্ঠামুপাগতঃ॥ —অধ্যায় ১০

অতঃপর বিভিন্ন জন্মে সে জন্মকালীন ও মৃত্যুকালীন ক্লেশ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করে। পিতার এক প্রশ্নের উত্তরে পুত্র বলে যে, বর্ত্তমান জন্ম হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তমজন্মে সে বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু একদা কোন জলাশয়ে জলপানে প্রবৃত্ত একটি গরুকে বাধাদান করিয়া সে মহাপাপে লিপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর ঘোরতর ক্লেশদায়ক নরকে পতিত হইয়া দীর্ঘকাল দারুণ ক্লেশ সহ্য করে। অতঃপর নরকভোগান্তে আরও ৬টি বিভিন্ন জন্মে নানারূপ ক্লেশ পাওয়ার পর সপ্তম-জন্মে পুনরায় মনুষ্যকুলে জন্ম লাভ করিয়াছে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য মার্কণ্ডেয়পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের—

"অহং বৈশ্যকুলে জাতো জন্মন্যস্মাত্তু সপ্তমে।

সমতীতে গবাং রোধং নিপানে কৃতবান্ পুরা॥" (১৩।১)

প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অত্রিপত্নী অনসূয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উপাসনা করিয়া তাঁহাদের নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, উল্লিখিত দেবতাত্রয় যেন তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

"তদ্ যান্তু মম পুত্রত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।" (১৬।৮৯)

দেবতারাও তাঁহাকে এই বর দেন এবং ব্রহ্মা চন্দ্ররূপে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয়রূপে ও মহাদেব দুর্ব্বাসারূপে তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

"সোমো ব্রহ্মাভবদ্ বিষ্ণুর্দত্তাত্রেয়ো ব্যজায়ত।

দুর্ব্বাসা শঙ্করো জজ্ঞে বরদানাদ্দিবৌকসাম্॥" (১৭।১১)

মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য বা সপ্তশতী 'চণ্ডী' দুর্গাপূজার সময় পাঠ করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্বস্ত্যয়নের উদ্দেশ্যে বা গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি মঙ্গলকার্য্যেও এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করা হয়। এই গ্রন্থখানার কথা হিন্দুমাত্রেই জানেন। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়—পরম ধার্ম্মিক রাজা সুরথ ভক্তিভরে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিলে দেবী তাঁহাকে অভিলষিত বর দান করেন এবং ফলে তিনি মৃত্যুর পর সাবর্ণি-মনুরূপে জন্মগ্রহণের অধিকারী হন। রাজা সুরথের প্রতি ভগবতীর উক্তি যথা—

"স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে! স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্।

হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি॥

মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবস্বতঃ।
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি॥" (১৯।১৩—১৪)

মার্কণ্ডেয়পুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্নপ্রকার পাপের ফলে মানুষ মৃত্যুর পর নরকভোগান্তে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি পাপ ও তজ্জনিত প্রাপ্য জন্মান্তরের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। যথা—পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ পরজন্মে গর্দ্দভরূপে এবং পতিত ব্যক্তিকে যাজন করিলে কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অধ্যাপকের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে, সে কুকুরযোনিতে জন্মিয়া থাকে। অধ্যাপক-পত্নীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করিলে বা অধ্যাপকের দ্রব্য অপহরণ করিলে গর্দ্দভ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মাতাপিতার প্রতি খারাপ ব্যবহার করিলেও কুকুর হইয়া জন্মিতে হয়। যে দুরাত্মা মাতাপিতার প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জন করে, সে মৃত্যুর পর নরকভোগান্তে শারিকারূপে এবং ভ্রাতৃপত্নীর অবমাননাকারী ব্যক্তি কপোতরূপে জন্মিয়া থাকে। ভ্রাতৃপত্নীর দেহে আঘাত করিলে পরজন্মে কচ্ছপযোনিতে প্রবেশ করিতে হয়। যে দুরাত্মা মনিবের নিকট হইতে বেতন ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহার হিত সাধনে পরাঙ্মুখ হয়, সে মৃত্যুর পর বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইভাবে অসংখ্যপ্রকার পাপের ফলে মানুষ যে নরকভোগের পর রাক্ষস, শ্বাপদ, কৃমি, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ কবিতে বাধ্য হয়, তাহার বিস্তৃত তালিকা সমগ্র পঞ্চদশ অধ্যায় ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

জন্মিবার পর সাধারণ মানুষ কেন তাহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ভুলিয়া যায়, ইহাও মার্কণ্ডেয়পুরাণে পরিষ্কারভাষায়ই বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে মার্কণ্ডেয়পুরাণ বলেন—গর্ভস্থ ভ্রূণও তাহার পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী স্মরণ রাখিতে পারে; কিন্তু জন্মিবার প্রাক্কালে জননীর যে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, তাহার সহিত বৈষ্ণবীমায়ার যোগ হওয়ায় নবজাত শিশুটি সাধারণতঃ তাহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ভুলিয়া যায়। এই বৈষ্ণবী-মায়াই জন্মান্তরীয় স্মৃতিনাশ করার প্রধান হেতু (১১।১৯)।

(১৪) বামনপুরাণ

বামনপুরাণের ৩৬ তম অধ্যায়ে ব্রহ্মর্ষিকুণ্ড-নামক তীর্থের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, কোন মনুষ্য এই পবিত্র তীর্থে আসিয়া সপ্তর্ষিগণের উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ স্নান করিলে এই পুণ্যের প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গভোগান্তে পুনরায় পৃথিবীতে

জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তলোকের অধিপতি হন। এই সম্বন্ধে বামনপুরাণের শ্লোক যথা—

"সপ্তর্ষীংশ্চ সমুদ্দিশ্য পৃথক্ শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
ঋষীণাঞ্চ প্রসাদেন সপ্তলোকাধিপো ভবেৎ॥ (৩৬।১৩)

৮৬ তম অধ্যায়ে এক দুরাত্মা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মফল বর্ণনা প্রসঙ্গে জানানো হইয়াছে যে, জীবদ্দশায় রাক্ষসোচিত কর্ম্ম করার ফলে এই পাপিষ্ঠ মৃত্যুর পর রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং মনুষ্য প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে থাকিয়া সকলের ত্রাসের কারণ হয়। অবশেষে এক ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিবার জন্য গ্রহণ করিলে তাঁহার মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া পাপিষ্ঠ রাক্ষসের চৈতন্যোদয় হয় এবং ব্রাহ্মণের উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিয়া সে মুক্তিলাভ করে।

৮৫ তম অধ্যায়ে গজ ও কচ্ছপের পূর্ব্ববর্ত্তী একটি জন্মের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, দেবতাদের অভিশাপে হূহূ নামক গন্ধর্ব্ব পরজন্মে কুম্ভীরত্ব লাভ করে এবং ভগবান্ কৃষ্ণের কৃপায় কুম্ভীর জন্মে সুদর্শনচক্র দ্বারা নিহত হইয়া পরমধাম প্রাপ্ত হয়। বামনপুরাণের ভাষায়—

"এবং হি দেবশাপেন হূহূর্গন্ধর্ব্বসত্তমঃ।
গ্রাহত্বমগমৎ কৃষ্ণান্মোক্ষং প্রাপ্য দিবং গতঃ॥" (৮৫।৫৫)

(১৫) বরাহপুরাণ

বরাহপুরাণের ১২৩ তম অধ্যায়ে দ্বাদশীতিথিতে বিষ্ণুপূজার মাহাত্ম্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, বৈশাখ এবং কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতিথিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক। উল্লিখিত দুই মাসের দ্বাদশী তিথিতে যে ব্যক্তি ব্রতপরায়ণ হইয়া 'ওঁ নমো বাসুদেবায়' প্রভৃতি মন্ত্রে নারায়ণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে আর জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয় না (ন জন্মমরণঞ্চৈব ন গ্লানিং ন চ বৈ ক্ষুধাম্॥ ১২৩।৩৩॥)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানুষ সাধারণতঃ মৃত্যুর পর 'পুনর্জ্জন্ম' এবং তাহার অপরিহার্য্য ফল 'পুনর্মৃত্যু'—এইরূপ জন্মমৃত্যুপ্রবাহের অধীন হইয়া থাকে।

১২৪ তম অধ্যায়ে বসুন্ধরা বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রশ্ন করিয়াছেন—"মানুষ কি করিলে মৃত্যুর পর পুনরায় মনুষ্য, রাক্ষস প্রভৃতি বা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ

প্রভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয় না, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন। বরাহপুরাণের ভাষায় বসুন্ধরার উক্তি যথা—

"কথং যোনিং ন গচ্ছেত বিযোনিং ন চ গচ্ছতি।
তির্য্যগ্‌যোনিং ন গচ্ছেত কর্ম্মণা কেন কেশব!
তন্মমাচক্ষ্ব সকলং যেন চৈব সুখম্ভবেৎ॥" (১২৪।৩৪)

বসুন্ধরার উল্লিখিত প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর বরাহপুরাণের ১২৪ তম অধ্যায়ে এবং পরবর্ত্তী কোন কোন অধ্যায়েও লিপিবদ্ধ আছে। ইহা দ্বারা সাধারণতঃ জন্মান্তরবাদের অপরিহার্য্যতাই অবগত হওয়া যায়।

গজেন্দ্রমোক্ষণের পৌরাণিক বিবরণটি সর্ব্বজনবিদিত। বরাহপুরাণের ১৪৪ তম অধ্যায়ে বিবদমান গজ ও কচ্ছপের পূর্ব্বজন্মের বিববণ প্রদত্ত হইয়াছে। বরাহপুরাণ আমাদিগকে জানাইতেছেন যে পূর্ব্বকালে জয় ও বিজয় নামে দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহারা মরুত্তরাজার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়া প্রচুর ধনলাভ করেন, এবং এই ধনের বিভাগ লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন। কলহ করিবার কালে দুই ভ্রাতাই ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে নিদারুণ অভিশাপ দেন। জয়ের শাপে বিজয় মৃত্যুর পর কুম্ভীর-যোনিতে এবং বিজয়ের শাপে জয় হস্তিযোনিতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। দুই ভ্রাতার পরস্পরের প্রতি অভিশাপবাক্য বরাহপুরাণে নিম্নলিখিত ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। যথা—

"জয়োঽব্রবীদসামর্থ্যং মন্বানো মাং ব্রবীষি কিম্।
ন দদামি গৃহীত্বা যত্তস্মাদ্ গ্রাহত্বমাপ্নুহি॥
বিজয়োঽপ্যব্রবীন্নূনমন্ধীভূতোঽসি কিন্ধনৈঃ।
গজো ভব মদান্ধস্ত্বং যো মামেবং প্রভাষসে॥" (১৪৪।১২২-১২৩)

(১৬) মৎস্যপুরাণ

মৎস্যপুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পিতৃগণের মানসী কন্যা অচ্ছোদা এক সময়ে অমাবসু নামক রূপবান্ পিতৃপুরুষকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গ কামনা করেন। এই অপরাধে পিতৃগণ তাঁহাকে স্বর্গভ্রষ্ট হইবার জন্য অভিশাপ দেন। অচ্ছোদা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলে পর পিতৃগণ প্রসন্ন হইয়া বলেন যে অচ্ছোদা স্বর্গভ্রষ্ট হইলেন সত্য, কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষের ঘরে না জন্মিয়া বসুরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ

করিবেন এবং মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ব্যাসদেবকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। মৎস্যপুরাণের ভাষায় প্রসন্ন পিতৃগণের উক্তি যথা—

"তস্মাদ্ রাজ্ঞো বসোঃ কন্যা ত্বমবশ্যম্ভবিষ্যসি।
কন্যা ভূত্বা চ লোকান্ স্বান্ পুনরাপ্স্যসি দুর্লভান্॥
পরাশরস্য বীর্য্যেণ পুত্রমেকমবাপ্স্যসি॥" (১৪।১৪-১৫)

মহর্ষি কৌশিকের সাতটি পুত্র গর্গমুনির কাছে অধ্যয়ন করিবার কালে যে ভাবে গোহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া পাঁচ জন্ম হীনযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিবার ফলে এই পুণ্যবলে প্রতি জন্মেই জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কেহ কেহ কুরুক্ষেত্রে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গৃহে এবং অন্যেরা রাজা ও মন্ত্রীর পুত্ররূপে জন্মলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মৎস্যপুরাণের ২০ তম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। জন্মান্তর ও জাতিস্মরত্বলাভ যে কাল্পনিক ঘটনা নহে, উল্লিখিত উপাখ্যানটি হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। হরিবংশ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থেও কৌশিক-পুত্রগণের উল্লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে; সুতরাং ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না।

১১৫ তম অধ্যায়ে রাজা পুরুরবার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। মনুর প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ মৎস্য বলিয়াছেন যে, উর্ব্বশীপতি রাজা পুরুরবা পূর্ব্বজন্মে মদ্রদেশের রাজা ছিলেন এবং সেই জন্মেও তাঁহার নাম ছিল পুরুরবা। ইহা চাক্ষুষ মন্বন্তরের ঘটনা। সেই জন্মে রাজা পুরুরবা নৃপতিসুলভ সমুদয় গুণেরই অধিকারী ছিলেন; শুধু তাঁহার চেহারাটি সুন্দর ছিল না।

"অতীতে জন্মনি পুরা যোঽয়ং রাজা পুরুরবাঃ।
পুরুরবা ইতি খ্যাতো মদ্রদেশাধিপো হি সঃ॥
চাক্ষুষস্যান্তরে রাজা চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
স বৈ নৃপগুণৈর্যুক্তঃ কেবলং রূপবর্জ্জিতঃ॥" (১১৫।৭—৮)

সূতের মুখে উল্লিখিত কথাটুকুমাত্র শুনিয়াই উপস্থিত ঋষিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জানিতে চাহিলেন—কোন্ পুণ্যবলে পুরুরবা মদ্রদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন, আর কোন্ পাপের ফলেই বা তাঁহার আকৃতি কুৎসিত হইল। ঋষিগণের প্রশ্ন যথা—

"পুরুরবা মদ্রপতিঃ কর্ম্মণা কেন পার্থিবঃ।
বভূব কর্ম্মণা কেন বিরূপশ্চৈব সূতজ!॥" (১১।৯)

ঋষিগণের কৌতূহল দেখিয়া সূত বলিলেন—মদ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে

পুরূরবা একটি বিশুদ্ধ ব্রহ্মণবংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্মে তিনি প্রতিটি দ্বাদশী-তিথিতে উপবাস পূর্ব্বক ভগবান্ জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার কাছে রাজত্ব প্রার্থনা করিতেন। এই উপবাসসহ বিষ্ণুপূজারূপ পুণ্যের ফলে তিনি পরজন্মে মদ্রদেশের অধিপতি হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মণজন্মে উপবাসী থাকিয়া স্নান করিবার সময় পুরূরবা তৈল মর্দ্দন করিতেন। উপবাসী ব্যক্তির পক্ষে তৈল মাখিয়া স্নান করা নিষিদ্ধ। এইরূপ নিষিদ্ধ কার্য্য করিবার ফলে ব্রাহ্মণের যে পাপ হয়, তাহারই ফলে রাজপুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়াও তিনি কদাকার হইয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণের ভাষায়—

"দ্বিজগ্রামে দ্বিজশ্রেষ্ঠো নাম্না চাসীৎ পুরূরবাঃ।
নদ্যাঃ কূলে মহারাজঃ পূর্ব্বজন্মনি পার্থিবঃ॥
স তু মদ্রপতী রাজা যস্ত নাম্না পুরূরবাঃ।
তস্মিন্ জন্মন্যসৌ বিপ্রো দ্বাদশ্যাস্ত সদানঘ।
উপোষ্য পূজয়ামাস রাজ্যকামো জনার্দ্দনম্।
চকার সোপবাসশ্চ স্নানমভ্যঙ্গপূর্ব্বকম্।
উপবাসফলাৎ প্রাপ্তং রাজ্যং মদ্রেম্বকণ্টকম্।
উপোষিতস্তথাভ্যঙ্গাদ্ রূপহীনো ব্যজায়ত॥" (১১৫।১০—১৩)

এইভাবে জন্মান্তরবাদ সমর্থনে আরও বহু ঘটনা মৎস্যপুরাণের নানাস্থানে দেখা যায়।

(১৭) কূর্ম্মপুরাণ

জন্মান্তরবাদের সমর্থনে কূর্ম্মপুরাণেও বহু কথা রহিয়াছে। এই মহাপুরাণের পূর্ব্বভাগ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মার নির্দ্দেশে দেবী ঈশানী দক্ষকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"তামাহ ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষস্য দুহিতা ভব।
সাপি তস্য নিয়োগেন প্রাদুরাসীৎ প্রজাপতেঃ॥"

—পূর্ব্বভাগ ১১।৯

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ভৃগুমুনির অভিশাপে স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুই রাম ও কৃষ্ণরূপে মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ভগবান্ বিষ্ণুর নির্দ্দেশে ভগবতী যোগনিদ্রা নন্দগোপের গৃহে যশোদার কন্যারূপে জন্মিয়াছিলেন।

"ভৃগুশাপচ্ছলেনৈবমানয়ন্ মানুষীং তনুম্।
বভূব তস্যাং দেবক্যাং রোহিণ্যামপি মাধবঃ॥
উমাদেহসমুদ্ভূতা যোগনিদ্রা চ কৌশিকী।
নিয়োগাদ্ বাসুদেবস্য যশোদাতনয়া হ্যভূৎ॥
—পূর্ব্বভাগ ২৪।৭৩—৭৪

অবিমুক্ত-বারাণসীর মাহাত্ম্য-বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, এই স্থানে প্রবেশমাত্র মানুষের সহস্র জন্মে সঞ্চিত সমুদয় পাপ নষ্ট হইয়া যায়।

"জন্মান্তরসহস্রেষু যৎপাপং পূর্ব্বসঞ্চিতম্।
অবিমুক্তে প্রবিষ্টস্য তৎপূর্ব্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্॥"—ঐ ৩০। ৩০

গঙ্গানদী স্বভাবতঃই পবিত্র। কাশীধামে তাঁহার পবিত্রতা আরও অধিক। এই সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণ বলেন যে, কাশীধামস্থ গঙ্গায় একবার মাত্র স্নান করিলে মানুষ শতজন্মার্জ্জিত যাবতীয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।

"বারাণস্যাং বিশেষেণ গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
প্রবিষ্টা নাশয়েৎ পাপং জন্মান্তরশতৈঃ কৃতম্॥"—ঐ ৩০। ৪৯

প্রয়াগতীর্থের প্রশংসাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এই পবিত্র স্থানে মৃত্যু ঘটিলে মানুষ অতি দীর্ঘকাল স্বর্গবাস করে এবং তাহার পর প্রভূত বিত্তশালী লোকের গৃহে জন্মিয়া সুখলাভের সুযোগ পায়। সেই জন্মেও পুণ্যকার্য্য করিলে সে মৃত্যুর পর পুনরায় স্বর্গে গমন করে এবং পুণ্যক্ষয়ের পর পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জম্বুদ্বীপের অধিপতি হয়।

"যাবন্ন স্মরতে জন্ম তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে।
তস্মাৎ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষীণকর্ম্মা নরোত্তমঃ।
হিরণ্যরত্নসম্পূর্ণে সমৃদ্ধে জায়তে কুলে॥" ঐ ৩৫। ৩৫—৩৬
"ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ॥"—ঐ ৩৫। ৪১

কূর্ম্মপুরাণের উত্তরবিভাগে 'ঈশ্বর-গীতা'তে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, যাঁহার আত্মা কুকর্ম্ম বা কদাচারের ফলে মলিনতাপ্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি এইভাবে আত্মার মলিনতাসম্পাদনের ফলে শতজন্মেও মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

"তথাত্মা মলিনঃ সৃষ্টো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ।
ন হি তস্য ভবেন্মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি ॥"

—উত্তরবিভাগ, অধ্যায়—২

ভূমিদানের প্রশংসা-প্রসঙ্গে কূর্ম্মপুরাণ বলেন—যে ব্যক্তি শস্যসমৃদ্ধ ভূমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; অর্থাৎ এই দানরূপ পুণ্যের ফলে তিনি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

"ইক্ষুভিঃ সন্ততাং ভূমিং যবগোধূমশালিনীম্।
দদাতি বেদবিদুষে যঃ স ভূয়ো ন জায়তে ॥"—ঐ, অধ্যায়—২৬

শিবপূজার প্রশংসাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মহাদেবের প্রীতিকামনায় যে ব্যক্তি অমাবস্যা-তিথিতে তপস্বী ব্রাহ্মণকে যে কোন দ্রব্য দান করেন, তাঁহার সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়; আর যে ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতিথিতে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়া ভগবান্ পিনাকীর অর্চ্চনা করান, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

"অমাবস্যামনুপ্রাপ্য ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে।
যৎকিঞ্চিদ্দেবদেবেশং দদ্যাদ্ বোদ্দিশ্য শঙ্করম্ ॥
প্রীয়তামীশ্বরঃ সোমো মহাদেবঃ সনাতনঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥
যস্তু কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং স্নাত্বা দেবং পিনাকিনম্।
আরাধয়েদ্ দ্বিজমুখে ন তস্যাস্তি পুনর্ভবঃ ॥"—ঐ, অধ্যায়—২৬

কূর্ম্মপুরাণ বলেন—কেহ যদি গো, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞাগ্নি বা কোন দেবতাকে কিছু দান করিবার কালে দাতাকে বাধা দান করে, তাহা হইলে সেই দুরাত্মা মৃত্যুর পর তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

"দীয়মানন্তু যো মোহাদ্ গোবিপ্রাগ্নিসুরেষু চ।
নিবারয়তি পাপাত্মা তির্য্যগ্‌যোনিং ব্রজেত্তু সঃ ॥"

গয়াতীর্থের মাহাত্ম্য-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া কূর্ম্মপুরাণ বলেন—এই পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া যে মহাত্মা পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করেন, তাঁহাকে আর জন্মযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না।

"পরং গুহ্য গয়াতীর্থং পিতৄণাঞ্চাতিদুর্লভম্।
কৃত্বা পিণ্ডপ্রদানন্তু ন ভূয়ো জায়তে নরঃ ॥"

—উত্তরবিভাগ, অধ্যায়—৩৫

কূর্ম্মপুরাণ হইতে জানা যায় যে, মহাদেবের সহিত বিবাদ করিবার কালে রুদ্রের অভিশাপে দক্ষ-প্রজাপতির অকালমৃত্যু ঘটে, এবং পরজন্মে তিনি মারিষার গর্ভে প্রাচেতসরূপে জন্মগ্রহণ করেন (পূর্ব্বভাগ ; অধ্যায়—১৫)। প্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এখানে স্নান করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না (পূর্ব্বভাগ ৩৫ | ২০)। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, পুনর্জ্জন্ম লাভ করাই স্বাভাবিক নিয়ম। প্রয়াগে মৃত্যু হইলে মানুষ স্বর্গে গমন করে এবং দীর্ঘকাল স্বর্গভোগের পর কোন রাজা বা প্রভূত বিত্তশালী ব্যক্তির ঘরে জন্মিয়া থাকে।

"তস্মাৎ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষীণকর্ম্মা নরোত্তমঃ।
হিরণ্যরত্নসম্পূর্ণে সমৃদ্ধে জায়তে কুলে ॥"—পূর্ব্বভাগ ৩৫ | ৩৬

যমুনা এবং নর্ম্মদা প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য-বর্ণনাপ্রসঙ্গেও জন্মান্তরগ্রহণ ও জাতিস্মরত্বলাভের উল্লেখ রহিয়াছে। শুদ্ধচিত্তে যমুনার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানুষ পরজন্মে জাতিস্মর হইয়া জন্মে (পূর্ব্ব ভাগ ৩৮ | ১৪) এবং নর্ম্মদায় মৃত্যু ঘটিলে স্বর্গবাসের পর পৃথিবীতে রাজপুত্ররূপে জন্মিয়া রাজ্যেশ্বর হওয়া যায় (পূর্ব্বভাগ ৩৮ | ১৮)।

(১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞে অনাহূত ভাবে উপস্থিত হইয়া যে ভাবে দক্ষের জ্যেষ্ঠকন্যা শিবপত্নী সতী পতির অপমান দর্শন করেন, এবং যে ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া পিতাকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন, তাহা বিস্তৃতভাবে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে। পিতাপুত্রীর তর্কবিতর্ক, পরস্পরের প্রতি ক্রোধ, পিতার প্রতি সতীর অভিশাপ ও যোগবলে দেহত্যাগ এবং পরবর্ত্তী জন্মে মেনকা ও হিমালয়ের কন্যারূপে পুনরাবির্ভাব প্রভৃতি সমুদয় বিবরণই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও লিপিবদ্ধ আছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মপুরাণের কথাগুলিই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে প্রায় অবিকৃতভাবে বিদ্যমান থাকায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় বিরত রহিলাম।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের প্রত্যেকখানিতেই উল্লিখিত প্রকারে জন্মান্তর সম্বন্ধে আরও বহু তথ্য নিবদ্ধ আছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

জাতিস্মরত্বলাভের হেতু

সংবাদপত্র খুলিলে প্রায়ই আমরা দেখিতে পাই—অমুক স্থানের একটি ছেলে বা মেয়ে তাহার পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় বিবরণ অনর্গল বলিয়া যাইতেছে এবং পরীক্ষাদ্বারা তাহার উক্তির সত্যতাও প্রমাণিত হইতেছে। কখনও দেখা যায়, দক্ষিণভারতের কোন গ্রামে জন্মিয়া একটি বালক বা বালিকা ৬।৭ বৎসর বয়সে বলিয়া যাইতেছে ---পূর্ব্বজন্মে সে উত্তর ভারতের অমুক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পিতার নাম ছিল অমুক, তাহার একজন ভাই এবং একজন ভগিনী ছিল, অমুক গ্রামের অমুকের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহিত জীবনে সে অমুক অমুক ছেলের এবং অমুক অমুক মেয়ের পিতা বা মাতা হইয়াছিল, অমুক দেবালয়ে সে প্রত্যহ পূজা দিত, তাহার বাড়ীতে এতখানি ঘব ছিল, তন্মধ্যে অমুক ঘরে সে শয়ন করিত এবং শয়নগৃহের দেওয়ালে অমুক শ্লোকটি লিখিয়া রাখিয়াছিল, তাহার বাসস্থানের দক্ষিণদিকে অমুক হাওর এবং উত্তরদিকে অমুক বাজার ছিল, এত বৎসর পূর্ব্বে অমুক ব্যাধিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং মৃত্যুর পর অমুকস্থানে তাহাকে দাহ করা হইয়াছিল। তাহাকে উত্তর ভারতের উল্লিখিত গ্রামে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল গ্রামের রাস্তাঘাট ইত্যাদি সবই তাহার পরিচিত। তাহার অন্যান্য বর্ণনাও হুবহু মিলিয়া গেল। কখনও দেখা যায়—ইংলণ্ডে জন্মিয়া নিজগ্রামের বা সহরের বাহিরে কোথাও কদাপি না গিয়া কোন বালক বলিয়াছে—পূর্ব্বজন্মে সে ব্রিটিশ সেনাদলে চাকুরী করিত এবং চাকুরী উপলক্ষে ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে গিয়া সে কয়েক বৎসর তথায় বাস করিয়াছিল। জিজ্ঞাসিত হইয়া সে তাহার পূর্ব্বজন্মের নাম, ধাম, মৃত্যুর স্থান ও হেতু প্রভৃতি সহ রেঙ্গুন সহরের বিভিন্ন দর্শনীয় বস্তুর বর্ণনা যথাযথভাবে দিয়াছে এবং তাহাকে রেঙ্গুনে লইয়া গেলে, তাহার পূর্ব্বজন্মের পরিচিত স্থানগুলি একে একে দেখাইয়াও দিয়াছে। তাহার পূর্ব্ব দেহের বিনাশের পর রেঙ্গুন সহরে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাও সে প্রকাশ করিয়াছে। উল্লিখিতপ্রকার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দেখিয়া নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায় যে জন্মান্তর যথার্থই আছে, এবং অনেকে পরজন্মে জাতিস্মর হইয়াও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

ইহার পর স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে—পুনর্জ্জন্ম যেমন অবশ্যম্ভাবী জাতিস্মরত্বলাভও তেমনি অবশ্যম্ভাবী হয় না কেন? গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থালাভ যেমন মনুষ্যদেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম মৃত্যুর পর দেহান্তরপ্রাপ্তিও ঠিক তেমনি স্বাভাবিক। গীতার ভাষায়—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥"

মানুষ তো যৌবনে তাহার বাল্য বা কৈশোরের স্মৃতি ভুলিয়া যায় না। বার্দ্ধক্যেও বাল্যাদি সকল অবস্থার স্মৃতিই জাগরূক থাকে। তবে কেন দেহান্তর-প্রাপ্তির পর প্রায় সকল মানুষই তাহাদের পূর্ব্বজন্মের ঘটনাগুলি ভুলিয়া যায়? এই সংশয়ের উত্তর দানের পূর্ব্বে গীতার আর একটি শ্লোকের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। তথায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ আশ্রয় করেন। উক্ত শ্লোকটি যথা—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥" (২ | ২২)

নূতন বস্ত্র যেমন পুরাতন বস্ত্রের স্মৃতিরক্ষা করিতে পারে না, মানুষের নূতন দেহও তেমনি তাহার পুরাতন দেহের স্মৃতি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বাল্যের স্মৃতি কৈশোরে এবং বাল্য-কৈশোরাদি অবস্থার স্মৃতি যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে যিনি স্মরণ করেন, তিনি দেহস্থ আত্মা। এই আত্মা কলুষরূপ আচ্ছাদনের দ্বারা আবৃত না হইলে জন্মান্তরেও পূর্ব্বজন্মের ঘটনাগুলি স্মরণ করিতে পারেন। মানুষ যেমন বৃদ্ধ বয়সে তাহার বাল্যের বহু ঘটনা বিস্মৃত হয়, তেমনি পূর্ব্বজন্মের ঘটনাগুলিও সে পরজন্মে বিস্মৃত হইরা থাকে। টাইফয়েড্ প্রভৃতি কঠিন রোগে ভুগিলে অনেক মানুষ তাহার পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিয়া যায়। মৃত্যু, নরকভোগ. গর্ভবাস এবং পুনর্জ্জন্মগ্রহণ —এইগুলির প্রত্যেকটি কঠিন টাইফয়েডের চেয়েও অধিকতর স্মৃতিভ্রংশকারী।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ বলেন—সন্তান জন্মিবার প্রাক্কালে জননীর যে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, তাহার সহিত বৈষ্ণবী মায়ার যোগ হওয়ার ফলে নবজাত শিশুটি সাধারণতঃ

তাহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ভুলিয়া যায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে—এই বৈষ্ণবী মায়াই জন্মান্তরীয় স্মৃতিনাশের প্রধান হেতু।

"ততস্তং বৈষ্ণবী মায়া সমাস্কন্দতি মোহিনী।
তয়া বিমোহিতাত্মাসৌ জ্ঞানভ্রংশমবাপ্নুতে॥"

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১১ | ১৯

অতএব অধিকাংশ লোকই যে পরজন্মে তাহাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ভুলিয়া যায়, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

পূর্ব্বজন্মের সংস্কারসমূহ অতি সূক্ষ্মভাবে পরজন্মেও জীবাত্মার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। দুর্ভেদ্য আবরণ না থাকিলে তাহারা পূর্ব্বজন্মের ঘটনাগুলি স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। যাঁহারা নিজ কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্বজন্মে সুদৃঢ় সংস্কারের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই পরজন্মে স্বাভাবিকভাবে জাতিস্মর হইয়া জন্মেন। অন্যান্যদের মৃদু সংস্কার কর্ম্মজ আচ্ছাদনদ্বারা চাপা পড়িয়া যায় বলিয়া তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের ঘটনাগুলি স্মরণ করিতে পারেন না। সৎকার্য্যসাধনের দ্বারা এই আচ্ছাদন অপসারণ করিতে পারিলে পূর্ব্বজন্মের বিস্মৃত ঘটনাগুলিও পুনরায় চিত্তপটে প্রকাশ লাভ করিতে পারে। তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি মহাত্মগণ তপঃপ্রভাবে শুধু নিজেরই নহে, অন্যদেরও পূর্ব্বজন্মের ঘটনাগুলি বলিয়া দিতে পারিতেন। এইরূপ অন্ততঃ ২।৪ জন মহাত্মা সম্ভবতঃ এখনও ভারতবর্ষে জীবিত আছেন।

কিভাবে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি নষ্ট হয় এবং কিভাবে তাহাকে পুনরুদ্ধার করা যায়, একটি দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা পরিষ্কার করিতেছি। হারিকেণের চিমনি যদি পর পর কয়েকদিন পরিষ্কার করা না হয়, তাহা হইলে উহাতে এত বেশী কালি জমে যে ভিতরের উজ্জ্বল আলোক বাহিরে প্রায় একটুও আসে না। তখন যদি চিমনিটিকে পুনরায় পরিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে ভিতরের আলোকটুকু বেশ উজ্জ্বল ভাবেই বাহির হইয়া আসে। এইভাবে মানুষ যদি তাহার পূর্ব্বজন্মের ভুলিয়া যাওয়া ঘটনাগুলি পুনরায় স্মরণ করিতে চায়, তাহা হইলে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মবিশেষের দ্বারা তাহার সংস্কারসমূহকে দৃঢ়তর করিয়া সে তাহা স্মরণ করিতে পারে। কি কি উপায়ে জীবাত্মার এই কলুষ আবরণ উন্মোচন করিয়া মানুষ তাহার পূর্ব্বজন্মের ঘটনাগুলি স্মরণ করিতে পারে, তাহাও শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এইসম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্ ॥" (৪ | ১৪৮)

বঙ্গার্থ :—সর্ব্বদা নিয়মিত বেদাভ্যাস, শৌচপালন, তপশ্চর্য্যা এবং সর্ব্বভূতের প্রতি অদ্রোহ—এই চারিটি উপায়ের সাহায্যে মানুষ তাহার পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী স্মরণ করিতে পারে।

নিয়মিত যথাবিধি বেদাভ্যাস করিয়া প্রাচীন ভারতের ঋষিরা তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মসমূহের যাবতীয় ঘটনা স্মরণ করিতে পারিতেন। ঋগ্বেদ (৪।২৬।১) হইতে জানা যায়—ঋষি বামদেব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বহুজন্মের কথা বলিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের নিয়মিত যথাবিধি বেদাভ্যাসেরই ফল। 'শৌচ' বলিতে সদাচার বুঝায়। শাস্ত্র বলেন--

"আচারেষু ব্যবস্থানং শৌচমিত্যভিধীয়তে ॥"

কথিত আছে মহর্ষি জৈগীষব্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সহস্রজন্মের বিবরণ বলিতে পারিতেন। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার সদাচারেরই ফল। ৺সুশীলচন্দ্র বসু তাঁহার 'জাতিস্মরকথা' গ্রন্থে স্বকীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যে সকল জাতিস্মরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতিস্মরেরা পূর্ব্বজন্মে সদাচার-পরায়ণ ছিলেন।

কুষাণরাজ কনিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 'বুদ্ধচরিতম্' নামে যে গ্রন্থখানা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—গৌতম বুদ্ধ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিবার পরই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সহস্র সহস্র জন্মের বিবরণ বলিতে পারিতেন। অতএব তপস্যার ফলে যে জাতিস্মরত্ব লাভ করা যায় তাহারও উদাহরণ পাওয়া গেল। বুদ্ধ যে তপস্যার ফলেই জাতিস্মরত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহা অশ্বঘোষের নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি হইতে জানা যায় ; যথা—

"সর্ব্বেষু ধ্যানবিধিষু প্রাপ্য চৈশ্বর্য্যমুত্তমম্।
সস্মার প্রথমে যামে পূর্ব্বজন্ম-পরম্পরাম্ ॥
অমুত্রাহময়ং নাম চ্যুতস্তস্মাদিহাগতঃ।
ইতি জন্মসহস্রাণি সস্মারানুভবন্নিব ॥"

বুদ্ধচরিতম্ (১৪ | ২—৩)

অদ্রোহ বলিতে বুঝায়—মনে প্রাণে অহিংস হওয়া। এইরূপ অদ্রোহ বা অহিংসা প্রতিষ্ঠার ফলে যে কেহ কেহ জাতিস্মর হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণ আছে। অতএব

জাতিস্মরত্বলাভের যে চারিটি প্রধান হেতুর কথা মনু বলিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটিরই উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও অন্যান্য সৎকর্ম্মের ফলে মানুষ পরজন্মে জাতিস্মরত্ব লাভ করিতে পাবে। বিভিন্ন পুরাণ এবং হরিবংশ নামক মহাগ্রন্থ হইতে জানা যায়—মহর্ষি কৌশিকের ৭টি অপদার্থ পুত্র কেবলমাত্র পিতৃশ্রাদ্ধ-রূপ পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদনের ফলে পরবর্ত্তী কয়েকটি জন্মে জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াছিল। বহু নরনারী ভক্তিভরে মাতাপিতা ও গুরুর সেবা করিবার ফলে এবং কেহ কেহ অতিথিসেবা প্রভৃতি অন্যান্য সৎকর্ম্মের ফলেও যে পরজন্মে জাতিস্মর হইতে পারিয়াছিলেন, বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থে তাহারও উদাহরণ আছে। জাতকগ্রন্থগুলিতেও অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

মহর্ষি শঙ্খ বলেন—শতরুদ্রী, অথর্ব্বশিরস্, গোসূক্ত, অশ্বসূক্ত, রথন্তরস্তোত্র, বামদেব্যগান প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্র সর্ব্বদা নিয়মমত আবৃত্তি করিলে, অথবা মহাব্রত, প্রভৃতি বেদোক্ত ব্রতের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলে মানুষ জাতিস্মরত্ব লাভে সমর্থ হয়। অর্থাৎ এই সকল মন্ত্র জপ বা ব্রত পালন করিলে মানুষ এই জন্মে পূর্ব্বজন্মের বিবরণ এবং পরবর্ত্তী জন্মে তাহার বর্ত্তমান জন্মের ঘটনাবলী স্মরণ করিতে সমর্থ হয়। মহর্ষি শঙ্খের ভাষায়—

শতরুদ্রীমথর্ব্বশিরাস্ত্রিসুপর্ণাং মহাব্রতম্।
গোসূক্তমশ্বসূক্তঞ্চ ইন্দ্রসূক্তঞ্চ সামনী ॥
ত্রীণি পুষ্পাঙ্গদেহানি রথন্তরঞ্চাগ্নিব্রতং বামদেব্যঞ্চ।
এতানি গীতানি পুনন্তি জন্তূন্ জাতিস্মরত্বং লভতে যদীচ্ছেৎ ॥

—শঙ্খসংহিতা ১০ | ৫—৬

যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—চিত্তগত সংস্কারকে দৃঢ়ীভূত করিতে পারিলে তাহার ফলেও মানুষ পূর্ব্বজন্মের ঘটনাগুলি স্মরণ করিতে পারে। এই সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত যোগসূত্র-গ্রন্থের বিভূতিপাদে (সূত্র—১৮) লিখিয়াছেন—"সংস্কারসাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্" ॥ এই সূত্রেরই ব্যাখ্যায় মহামতি ব্যাস বলিয়াছেন—সংস্কার দ্বিবিধ; তন্মধ্যে একটি স্মৃতিহেতু বাসনারূপ এবং অপরটি বিপাকহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ। উল্লিখিত দ্বিবিধ সংস্কারে 'সংযম' করিলে তাহার ফলেও পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। কথাটাকে আর একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলা আবশ্যক। কোন জ্ঞান হইতে আমাদের চিত্তে যে সংস্কার জন্মায় তাহার পারিভাষিক নাম 'বাসনা'। এই বাসনা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। স্মরণশক্তিকে সংবর্দ্ধিত করিতে হইলে এই

বাসনারূপ সংস্কারকে দৃঢ় করিতে হয়। তাহা করিবার একটি শ্রেষ্ঠ উপায় হইল ব্রহ্মচর্য্য পালন। এই কারণেই পূর্ব্বকালে ছাত্রদিগকে বাসনাবর্দ্ধক ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হইত। সেই যুগের ছাত্রদের মধ্যে যে তীক্ষ্ণপ্রতিভা ও স্মৃতিশক্তি বিদ্যমান ছিল, বর্ত্তমান যুগের ছাত্রদের পক্ষে তাহা কল্পনাতীত। সেই যুগে এক এক জন লোক গণ, সূত্র, অভিধান হইতে আরম্ভ করিয়া বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। আজকাল মুখস্থ করা তো দূরের কথা, ক্ষুদ্রাবয়ব কয়েকখানা পাঠ্যপুস্তকের অল্প কিছু কথা স্মরণ রাখিতেই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা হিমসিম খাইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোগস্পৃহাবর্দ্ধনের ইহাই পরিণতি।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা এবং প্রত্যাহার-সাধনার সাহায্যে ভোগস্পৃহাকে চিত্ত হইতে বিদূরিত করিতে হইবে। এই প্রচেষ্টা সফল হইলে জন্মান্তরীয় স্মৃতির আবরক অপসারিত হওয়ায় পূর্ব্বজন্মের বহু স্মৃতি অন্তরে প্রকাশ লাভ করিবে। দ্বিতীয় সংস্কার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ। এক্ষেত্রেও সংযমের সাহায্যে যখন ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের সাক্ষাৎকার হইবে, তখন আবৃতি নাশ হওয়ায় মানবচিত্তে পূর্ব্বজন্মের সমুদয় স্মৃতি ভাসিয়া উঠিবে। উল্লিখিত উপায় সমূহের সাহায্যে সাধু মহাত্মারা পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী স্মরণ করিতে সমর্থ হন।

অন্য একটি সূত্রে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি যোগাভ্যাসে আত্মনিয়োগ করতঃ যদি কখনও অন্যের নিকট হইতে দ্রব্যাদি গ্রহণ না করেন এবং অপরের দান গ্রহণ করিবার ইচ্ছাটিকে পর্য্যন্ত তাঁহার মন হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, তবে ইহার ফলেও তাঁহার মনে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে (অপরিগ্রহ-স্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ।—যোগসূত্র ২ | ৩৯)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চ প্রেতের উপাখ্যান

মানুষ যে মৃত্যুর পর তাহার কর্ম্মানুযায়ী পুনরায় ভাল বা মন্দ যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করে, এবং সেই জন্মেও অনেক ক্ষেত্রে জাতিস্মর হয়, এই বিষয়ে একটি সুন্দর ঘটনা বা উপাখ্যান গরুড়পুরাণের উত্তরখণ্ডে (অষ্টম অধ্যায়ে) লিপিবদ্ধ আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

সন্তপ্তক নামে এক ব্রাহ্মণ তপস্যাদিদ্বারা পাপ ক্ষয় করিয়া সংসারের অসারতা বুঝিতে পারেন এবং বনে চলিয়া যান। বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে তিনি দেখিতে পান—পার্শ্ববর্ত্তী বটবৃক্ষের অগ্রভাগে একটি মৃতদেহকে স্নায়ুদ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে এবং পাঁচটি প্রেত ঐ মৃতদেহটিকে ভক্ষণ করিতেছে। মৃতদেহে তখন মাংস আর প্রায় ছিলই না; কেবলমাত্র শিরা, অস্থি এবং চর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট ছিল। প্রেতেরা তখন হাড় চিবাইতেছিল এবং তাহাদের দন্ত ও মৃতের হাড়ের সজ্ঘর্ষণে বিকট শব্দ হইতেছিল। এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রাহ্মণ সন্তপ্তকের মনে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হইল এবং তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গরুড়পুরাণের ভাষায়—

"স তত্র বটবৃক্ষাগ্রে স্নায়ুবদ্ধং শবন্তথা।
দদর্শ তদ্ভুজশ্চৈব পঞ্চ প্রেতান্ সুদারুণান্॥ ৮।১৫

… … …

রণৎকোটিমহাদংষ্ট্রানস্থিগ্রন্থ্যবঘট্টিতান্।
তান্ দৃষ্ট্বা এস্তহৃদয়ো গতিমাকুঞ্চ্য সংস্থিতঃ॥" ৮।১৮

প্রেতেরা শবটিকে তখন খাইয়া প্রায় শেষ করিয়াছে। সহসা সম্মুখে একটি হৃষ্টপুষ্ট জীবিত মানুষ দেখিয়া তাহার মেদ ও মাংস ভক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে পাঁচটি প্রেতই এক লম্ফে বৃক্ষাগ্র হইতে নামিয়া আসিল এবং ব্রাহ্মণকে ধরিয়া লইয়া আকাশে উঠিল। একা ব্রাহ্মণ পাঁচটি প্রেতের সঙ্গে কেমন করিয়া লড়াই করিবেন? নিরুপায় হইয়া তিনি ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। বিষ্ণু তো বৈকুণ্ঠে বসিয়া সবই দেখিতেছিলেন। তিনি শুধু অপেক্ষায় ছিলেন—ব্রাহ্মণ তাঁহাকে স্মরণ

করে কি না। যে মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিল, সেই মুহূর্ত্তেই বিষ্ণুর আদেশে মহাপরাক্রান্ত যক্ষ মণিভদ্র ভীমবিক্রমে প্রেতগুলিকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহারাও উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রাহ্মণকে পার্শ্ববর্ত্তী 'পারিপাত্র' পর্ব্বতে রাখিয়া যক্ষরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ততক্ষণে ব্রাহ্মণকে প্রেতের কবলমুক্ত করিয়া মণিভদ্র অদৃশ্য হইয়াছেন। তখন প্রেতেরা পুনরায় ব্রাহ্মণকে ধরিবার জন্য তাঁহার কাছে আসিতেই বিষ্ণুর কৃপায় তাহাদের পূর্ব্বজন্মস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তাহাবা ব্রাহ্মণের প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, তাহার জন্য অনুতপ্ত হইল এবং তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের নাম কি? তোমরা এইরূপ কুৎসিত প্রেতযোনি লাভ করিয়াছ কেন, এবং শবভক্ষণরূপ কুৎসিত কর্ম্মেই বা প্রবৃত্ত হইয়াছ কি কারণে?" প্রেতেরা তখন একে একে তাহাদের নাম এবং প্রেতত্বলাভের হেতু ব্রাহ্মণের কাছে বিবৃত করিল।

প্রথম প্রেত বলিল—তাহার নাম 'পর্য্যুসিত'। পূর্ব্বজন্মে সে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিল। একদা শ্রাদ্ধবাসরে এক ব্রাহ্মণকে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনে; কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্রাহ্মণের আগমনে বিলম্ব হওয়ায় সে নিজেই আয়োজিত আহার্য্য ভক্ষণ কবিয়া ফেলে। অবশেষে যখন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে খাওয়াইবার মত অন্য কিছু না থাকায় সে পর্য্যুসিত অন্ন তাঁহাকে খাইতে দিয়াছিল। শ্রাদ্ধবাসরে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে পর্য্যুসিত খাদ্য দেওয়া মহাপাপ। এই পাপের ফলেই সে বর্ত্তমান জন্মে হীন প্রেতযোনিতে জন্মিয়া পর্য্যুসিত পদার্থ ভোজন করিতেছে, এবং তাহার নামও হইয়াছে 'পর্য্যুসিত'।

দ্বিতীয় প্রেত বলিল—তাহার নাম 'সূচীমুখ', কারণ তাহার দেহটি বিশাল এবং তদনুসারে ক্ষুধাও খুব বেশী; অথচ তাহার মুখ সূঁচের অগ্রভাগের মত অতি ক্ষুদ্র। দারুণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় অস্থির হইয়াও সে মুখের ক্ষুদ্রতার জন্য পর্য্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিতে পারে না, এবং ফলে সব সময়েই ক্ষুধাতৃষ্ণায় কষ্ট পায়। পূর্ব্বজন্মে সে জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিল। তাহার প্রেতযোনিতে জন্ম এবং এইরূপ বিশাল দেহ ও ক্ষুদ্র মুখ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে যে বলিল—পূর্ব্বজন্মে সে একদা এক তীর্থযাত্রী বিধবা ব্রাহ্মণী ও তদীয় শিশুপুত্রের সব হরণ করে। তাহাদের সঙ্গে যে জলটুকু ছিল, তৃষ্ণার্ত্ত বালক পান করিতে চাহিলে বালককে এক বিন্দুও না দিয়া এই দুর্ব্বৃত্ত নিজে সবটুকু জল পান করে। ফলে তৃষ্ণায় বালকটির মৃত্যু হয় এবং তাহার মাও

অধীর হইয়া নিকটবর্ত্তী এক কূপে পড়িয়া আত্মহত্যা করে। এই পাপের ফলেই উক্ত দুরাত্মা প্রেতযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং সে যাহাতে সর্ব্বদা ক্ষুধাতৃষ্ণায় ভীষণ কষ্ট পায়, এই কারণে তাহার দেহ ও উদর বিশাল অথচ মুখটি অতি ক্ষুদ্র হইয়াছে।

তৃতীয় প্রেত বলিল—তাহার নাম 'শীঘ্রগ'! পূর্ব্বজন্মে সে বৈশ্যজাতিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। এক সময়ে এক বন্ধুর সঙ্গে বাণিজ্য করিতে যায়, এবং উভয় বন্ধুর চেষ্টায় প্রচুর ধন উপার্জ্জন হয়। ফিরিবার পথে এই পাপিষ্ঠ তাহার বন্ধুটিকে হত্যা করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয় এবং সমুদয় ধনরত্ন লইয়া শীঘ্র (তাড়াতাড়ি) বাড়ীতে আসে। ধনরত্নগুলি নিরাপদস্থানে গোপন করিয়া সে বন্ধুর বাড়ীতে যায় এবং বিমর্ষভাবের অভিনয় করিয়া বন্ধুপত্নীকে বলে যে. তাহারা প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পথিমধ্যে দস্যুরা তাহাদিগকে আক্রমণ-পূর্ব্বক সমুদয় ধন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ততোঽধিক দুঃখের বিষয় এই যে, দস্যুরা তাহার বন্ধুটিকেও হত্যা করিয়াছে। এই দারুণ দুঃসংবাদ শুনিয়া তাহার বন্ধুপত্নী শোকে অভিভূত হন এবং প্রাচীন ভারতীয় নারীদের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া অনুমৃতা হন। উল্লিখিত পাপের ফলেই এই দুর্ব্বৃত্ত বর্ত্তমানে প্রেতযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং পূর্ব্বজন্মে বন্ধুকে হত্যা করিয়া শীঘ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়া এই জন্মে তাহার নাম হইয়াছে 'শীঘ্রগ'।

চতুর্থ প্রেত বলিল · তাহার নাম 'রোধজ'। পূর্ব্বজন্মে সে জাতিতে ছিল শূদ্র। রাজার অনুগ্রহে সে ১০০ গ্রামের অধিপতি হয়; কিন্তু তাহার নবাগত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্পত্তির অংশ না দিয়া পৃথক্ করিয়া দেয়। ছেলেটি অর্থাভাবে আহার্য্যসংস্থান করিতে না পারিয়া ক্ষুধার কষ্ট পাইতে থাকে। ছোট ছেলের কষ্ট দেখিয়া তাহার মাতাপিতা বড় ছেলের অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী ছোট ছেলেটিকে দিয়া কোন প্রকারে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দুর্ব্বৃত্ত তাহা জানিতে পারে এবং মাতাপিতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ছোট ছেলেটি ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে কিছুদিন জীবিকা-নির্ব্বাহ করে এবং পরে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই পাপের ফলেই উক্ত দুরাত্মা বর্ত্তমান জন্মে প্রেত হইয়াছে, এবং মাতাপিতাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া বর্ত্তমান জন্মে তাহার নাম হইয়াছে 'রোধজ'।

পঞ্চম প্রেত বলিল—তাহার নাম 'লেখক'। পূর্ব্বজন্মে সে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিল এবং এক রাজার দেবালয়ে দেবার্চ্চনা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। দেববিগ্রহ-

গণের বিভিন্ন অঙ্গে মূল্যবান রত্নালঙ্কার দেখিয়া এই পাপিষ্ঠের লোভ জন্মে এবং সে উক্ত রত্নালঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিবার উপায় চিন্তা করিতে থাকে। ক্রমে সে তীক্ষ্ণাগ্র লৌহশলাকাদ্বারা রত্নগুলি একে একে অপসারণ করে এবং গোপনে রাজার কক্ষে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিয়া সমুদয় ধনরত্ন লইয়া পলাইয়া আসে। পলায়নকালে পথিমধ্যে এক ভীষণ ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণপূর্ব্বক হত্যা করে। রত্নগুলি সেই অরণ্যমধ্যেই থাকিয়া যায়। উল্লিখিত পাপের ফলে এই দুর্ব্বৃত্ত বর্ত্তমান জন্মে প্রেত হইয়াছে এবং তীক্ষ্ণাগ্র লৌহদ্বারা দেববিগ্রহের দেহে লেখ বা রেখা অঙ্কন করার ফলে বর্ত্তমান জন্মে তাহার নাম হইয়াছে 'লেখক'।

প্রেতগুলির মুখ হইতে তাহাদের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং কুকর্ম্মের ফলে তাহাদের দুর্গতি দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে অভিভূত ও সহানুভূতিসম্পন্ন হন। নিষ্পাপ ব্রাহ্মণের সঙ্গলাভ করার ফলে প্রেতগণের পাপমুক্তি হয়, এবং তাহারা প্রেতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জাতিস্মর ব্যক্তিদের ইতিহাস

জাতিস্মর ব্যক্তিরা যে কেবল বর্ত্তমান কালেই জন্মগ্রহণ করিতেছেন, এমন নহে; স্মরণাতীত কাল হইতে পুণ্যভূমি ভারতে জাতিস্মর ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। অতি প্রাচীন ঋগ্বেদ-সংহিতায়ও জাতিস্মর ব্যক্তিদের উল্লেখ রহিয়াছে। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে—মহর্ষি বামদেব পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন জন্মে মনু, সূর্য্য, কক্ষীবান্ ঋষি, কুৎস ঋষি এবং উশনারূপে দেহধারণ করিয়াছিলেন। উক্ত মন্ত্র যথা—

"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জ্জুনেয়ং ন্যৃঞ্জেঽহং কবিরুশনা পশ্যতামা॥" (৪।২৬।১)

পরবর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থগুলিতেও জাতিস্মর ব্যক্তিদের কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কথিত আছে মহর্ষি জৈগীষব্য তাঁহার পূর্ব্ববর্তী সহস্র জন্মের বিবরণ বলিতে পারিতেন।

পুরাণ গ্রন্থগুলিতে জাতিস্মর ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণ হইতে কিছু কিছু সংবাদ পরিবেশন করিতেছি। ব্রহ্মপুরাণ হইতে জানা যায়—শিবপত্নী শৈলরাজ-দুহিতা উমা জাতিস্মর ছিলেন। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পুরাণে জন্মান্তরবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ হইতে জানা যায়—বিষ্ণুশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের পুত্রেরা সকলেই জাতিস্মর ছিল। তাহাদের মাতাপিতা যে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি জন্মেও তাহাদের মাতাপিতা ছিলেন, এই সংবাদটিও তাহারা বিষ্ণুশর্ম্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছে (ভূমিখণ্ড অধ্যায়—৩)। ভূমিখণ্ডের ৪৬ তম অধ্যায়ে মুমূর্ষু শূকরী তাহার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ বলিয়াছে এবং ১২৩ তম অধ্যায়ে চ্যবন মুনির প্রশ্নের উত্তরে কুঞ্জন তাঁহার পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছেন। উত্তরখণ্ডের ২০১ তম অধ্যায় হইতে জানা যায়—নিগমোদ্বোধক তীর্থে স্নান করিবার ফলে শিবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের অন্তরে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। উল্লিখিত ২০১ তম অধ্যায়েই বলা হইয়াছে—সখীর গৃহে এক পুস্তকে ভারতের মানচিত্রমধ্যে প্রয়াগতীর্থ দেখিয়া রাজা বীরবর্ম্মার মহিষী হেমাঙ্গীর অন্তরে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তিনি স্বামীর কাছে তাঁহার পূর্ব্ব-

জন্মের বিবরণ বলেন এবং প্রয়োগতীর্থে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেমন করিয়া কলাবতী নাম্নী নারী তাহার পূর্ব্বজন্মেব বিবরণ স্মরণ করিয়াছিল তাহার বিববণ উত্তরখণ্ডের ৩৪তম অধ্যায়ে রহিয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়—স্বায়ম্ভুব মনুর ১০ জন পৌত্রের মধ্যে তিনজন জাতিস্মর ছিলেন (২।১।৯)। রাজর্ষি ভরত যে হরিণযোনিতে জন্মিয়াও পুণ্যবলে জাতিস্মর হন এবং ইহার পরবর্ত্তী জন্মেও জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, ইহার বিস্তৃত বিবরণও বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে (অধ্যায়—১২) রহিয়াছে। কিভাবে এক মণ্ডূকী বারাণসীতে শিবের নির্ম্মাল্য ভক্ষণের ফলে পরবর্ত্তী জন্মে রাজকন্যারূপে দেহধারণ করিয়া জাতিস্মর হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ শিবপুরাণের সনৎকুমারসংহিতায় (অধ্যায়—৪৩) লিপিবদ্ধ আছে। এই সনৎকুমারসংহিতাতে একই স্থানে রাজা প্রতাপমুকুট ও তাঁহার জাতিস্মর পুত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শিবপুরাণের অন্তর্গত ধর্ম্মসংহিতায় (অধ্যায়—৬৩-৬৪) গর্গের শিষ্য ও কৌশিক মুনির পুত্রগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করার ফলে এই পুণ্যবলে পরবর্ত্তী কয়েকটি জন্মে জাতিস্মর হইয়া জন্মিয়াছিল।

স্কন্দপুরাণ যেমন আয়তনে বৃহৎ, তেমনি ইহাতে জাতিস্মর বংক্তিদের সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। মাহেশ্বর খণ্ডের অন্তর্গত কেদারখণ্ডে শিবপত্নী সতীর দেহত্যাগ এবং জাতিস্মররূপে পুনরায় দেহধারণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কুমারিকাখণ্ডে দীর্ঘজীবী কূর্ম্মের বৃত্তান্ত প্রদান করিবার কালে জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, এই কূর্ম্ম তাহার পূর্ব্বর্ত্তী কয়েকটি জন্মেব বিস্তৃত বিবরণ অবগত ছিল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উপবর্হণ নামে এক জাতিস্মর গন্ধর্ব্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কি ভাবে দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার অভিশাপে গন্ধর্ব্বযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক জাতিস্মর হইয়াছিলেন এবং কিভাবে পুনরায় তিনি দাসীপুত্ররূপে জন্মিয়া জাতিস্মর হন তাহার বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে (অধ্যায়—৮) প্রদত্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডেও বিভিন্ন জাতিস্মর ব্যক্তিদের বিবরণ রহিয়াছে। ৪১ তম অধ্যায়ে জাতিস্মররূপে পার্ব্বতীর জন্ম এবং পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত কথনের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের প্রথমদিকে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ সুমতি ও তাঁহার পুত্রের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে উক্ত ব্রাহ্মণের পুত্রটি তাহার

পূর্ব্ববর্ত্তী অযুত জন্মের বিবরণ অবগত ছিল। পিতার প্রশ্নের উত্তরে পুত্র তাহার বিভিন্ন জন্মের বিবরণ বিবৃত করিয়াছে।

মৎস্যপুরাণেও জাতিস্মর ব্যক্তিদের বিবরণসমূহ দেখা যায়। মহর্ষি কৌশিকের যে ৭টি পুত্র গর্গমুনির কাছে অধ্যয়ন করিবার সময়—গোহত্যারূপ মহাপাপ করিয়া অভিশপ্ত হয়, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ মৎস্যপুরাণের ২০ তম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারা পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণ করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল তাহারই ফলে যে পরবর্ত্তী ৫টি জন্মে জাতিস্মরত্ব লাভে সমর্থ হয়, ইহাও মৎস্য পুরাণ জানাইয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক যদিও পুরাণগুলিকে পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া তাহাদের গৌরব ম্লান করিবার জন্য অপচেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি আমরা নিঃসন্দেহে অবগত আছি যে পুরাণ গ্রন্থগুলি অতি প্রাচীন। ইহারা অত্যন্ত পুরাতন বলিয়াই পুরাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পৌরাণিক যুগের পরে যখন গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে তখনও দেশে জাতিস্মর লোক জন্মগ্রহণ করিতেন। মহাকবি অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধচরিতম্ নামক স্বরচিত মহাকাব্যের চতুর্দ্দশ সর্গে আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, গৌতম বুদ্ধ প্রথম জীবনে জাতিস্মর ছিলেন না বটে, কিন্তু তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিবার পর পূর্ব্ববর্ত্তী সহস্র জন্মের স্মৃতি তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠে। উল্লিখিত সহস্র জন্মের কোনটিতে তিনি কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কোন্ জন্মের পর কিরূপে পুনরায় উৎপন্ন হন, তাহাব প্রত্যেকটি বিবরণ প্রত্যক্ষ পদার্থের ন্যায় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। (বুদ্ধচরিত ১৪।২-৩)

শুধু ভারতবর্ষেই নহে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কিছু সংখ্যক জাতিস্মর ব্যক্তি জন্মিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ বাল্য বয়সেই ইহারা পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় বিবরণ বলিতে পারে। যৌবনারম্ভের পূর্ব্বেই পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়। ইউরোপ প্রভৃতি দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ দেশের জাতিস্মর ব্যক্তিদের বিবরণ সংগ্রহ করতঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও আমেরিকা প্রভৃতি কোন কোন দেশে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ঘটনাগুলি অতিশয় চিত্তাকর্ষক।

এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নাম ৺সুশীল কুমার বসু। অল্পদিন পূর্ব্বে ইনি

দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার গ্রন্থের নাম 'জাতিস্মরকথা'। উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে সুশীলবাবুর অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি।

১। উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত হরদৈ জেলায় ভাপুর সাপাহা গ্রামে শ্যামল সিংহ নামে এক ক্ষত্রিয় বাস করিতেন। তাঁহার একটি কন্যাসন্তান জন্মিলে উহার নাম রাখা হয় রামদেবী। এই মেয়েটি শিশুকাল হইতে তাহার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ অল্পবিস্তর বলিত। তাহার বয়স যখন ৮।৯ বৎসর, তখন সে পূর্ব্বজন্মের নাম ধাম ইত্যাদি বলিতে থাকায় তাহার কথাগুলি সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিল। রামদেবী বলে যে, পূর্ব্বজন্মে তাহার নাম ছিল রূপকুমারী এবং তাহার পিতার নাম ছিল বেণীমাধব গোপীনাথ মিশ্র। মিশ্র মহাশয় জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্গত সৈদাপুর সরাই গ্রামে তিনি বাস করিতেন। অল্পবয়সে কলেরারোগে রূপকুমারীর মৃত্যু ঘটে এবং তাহার পরই সে শ্যামল সিংহের কন্যারূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

রামদেবীর কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্মের মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট লইয়া যাওয়া হয় এবং সে তাঁহাদের প্রত্যেককেই চিনিতে পারিয়া সমবেত জনগণকে আশ্চর্য্যান্বিত করে। শুধু ইহাই নহে; পূর্ব্বজন্মে সে কখন কি করিয়াছিল, তাহাও ঠিক ভাবেই বলিয়া দেয়। ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান জন্মে চক্ষুঃসংলগ্ন না করিয়া এবং কাহারও নিকট না শুনিয়া সে পূর্ব্বজন্মে অধীত উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন অংশ মুখস্থ বলিয়া উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করে।

সুশীলবাবু স্বয়ং এই মেয়েটির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন করেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হন। সুশীলবাবুর এক প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলে যে, সম্ভবতঃ সে পূর্ব্বজন্মে কোন পাপ করিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে বর্ত্তমান জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে না জন্মিয়া ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মিয়াছে। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে রামদেবী বলে—তাহার বেশ মনে আছে, পূর্ব্বজন্মে যখন তাহার দেহটিকে দাহ করা হয়, তখন সে ধোঁয়ার মত হইয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছিল এবং ৬ মাস কাল নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল।

২। শ্রীনগরে ব্যাসমুনি নামে একটি ৭ বৎসরের বালক পূর্ব্ব জন্মের কথা বলিতে পারে—এই সংবাদ শুনিয়া সুশীলবাবু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। এই

বালকটি তাহার পিতা বাসুদেব শর্ম্মার সহিত শ্রীনগরের আমিরা বাদলে বাস করিত। বাসুদেব শর্ম্মা বি-এ পাশ এবং একটি গ্রামোফোন কোম্পানীর মালিক ছিলেন।

জাতিস্মর ব্যাসমুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সুশীলবাবু জানিতে পারেন যে, পূর্ব্বজন্মে সে ডাক্তার ছিল এবং তখন তাহার নাম ছিল সন্ত সিং ডুগন। ডাঃ ডুগন রাওয়ালপিণ্ডিতে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন। ১৯৩২ ইং সালের ১০ই নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডি সহরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইহার পরই ডাক্তার সন্ত সিং ডুগনের আত্মা বাসুদেব শর্ম্মার পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করে এবং যথাকালে তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতঃ ব্যাসমুনি নামে পরিচিত হন। ১৯৩৩ সনে এই বালকটি জন্মগ্রহণ করে। ব্যাসমুনি যখন তাহার পূর্ব্বজন্মের কথা বলিতে থাকে, তখন তাহার পূর্ব্বজন্মের পুত্রেরা তাহাকে দেখিবার জন্য আসে এবং সে তাহাদের প্রত্যেককে চিনিতে পারে।

সুশীলবাবুর এক প্রশ্নের উত্তরে জাতিস্মর বালকের পিতা বাসুদেব শর্ম্মা বলেন যে, রাওয়ালপিণ্ডির ডাক্তার সন্ত সিং ডুগনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ডাক্তারের মৃত্যুদিবসে তিনি ডাক্তারকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন এবং বাড়ীতে ফিরিয়া তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে ডাক্তার সন্ত সিং ডুগন সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময়েও তাঁহারা ঐ ডাক্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

৩। পেশোয়ারের একটি মুসলমান পরিবারে একটি জাতিস্মর বালিকা জন্মগ্রহণ করে। মেয়েটি তাহার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলে স্থানীয় গোঁড়া মুসলমানেরা ইহাতে অস্বস্তি বোধ করে। মুসলমানধর্ম্মের মতে জন্মান্তর নাই; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে একটি জাতিস্মর বালিকার আবির্ভাব তাঁহাদের মনঃপূত হয় নাই। এই মেয়েটি মাত্র ৫ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ কোরাণ মুখস্থ বলিতে পারিত এবং কোরাণের যে কোন ছুরার যে কোন রুকুর যে কোন আয়ত জিজ্ঞাসামাত্র আবৃত্তি করিত এবং ব্যাখ্যা করিয়া দিত। স্থানীয় মুসলমানেরা মেয়েটির পিতার উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করিলে তিনি মেয়েটিকে লইয়া অন্যত্র চলিয়া যান। এই মেয়েটির নূতন ঠিকানা জানিতে না পারায় সুশীলবাবু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। স্থানীয় পুলিশ অফিসার প্রভাত মুখার্জ্জি নিজে মেয়েটিকে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সে যথার্থই জাতিস্মর।

৪। দিল্লী নগরীর চাঁদনীচকে চিরাখানা মহল্লায় যং বাহাদুর নামে একজন

লোক বাস করিত। তাহার কন্যা শান্তিদেবী জাতিস্মর ছিল। এই মেয়েটির বয়স যখন ১৩ বৎসর, তখন সুশীলবাবু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বালিকার জন্ম ১৯২৬ ইংরাজী সনের ডিসেম্বর মাসে। প্রথমে সুশীলবাবু শুনিয়াছিলেন—উক্ত সনের ২৬শে ডিসেম্বর শান্তির জন্ম তারিখ। পরে তিনি নিঃসন্দেহে জানিতে পারেন যে, তাহার জন্ম তারিখ ১১ই ডিসেম্বর। শান্তির ঠিকুজিও সুশীলবাবু তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন।

শান্তির নিকট হইতে সুশীলবাবু জানিতে পারেন যে, পূর্ব্বজন্মে সে মথুরার পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবের সহধর্ম্মিণী ছিল। চৌবে মহাশয় তখনও জীবিত ছিলেন। শান্তি তাহার পূর্ব্বজন্মের সকল কথাই বলিতে পারিত। পূর্ব্বজন্মের সকল আত্মীয়কেই চিনিতে পারিত এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের নামও বলিত। পূর্ব্বজন্মে তাহার নাম ছিল লুগ্দীদেবী। জাতিস্মর বালিকা শান্তি তাহার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ বলিতেছে শুনিয়া তাহার পূর্ব্বজন্মের স্বামী পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে দেখিতে আসেন। শান্তির বয়স তখন ৯ বৎসর। শান্তি দেখিবামাত্র তাহার পূর্ব্বজন্মের স্বামী ও পুত্রকে চিনিতে পারে, এবং চৌবেজী কি কি জিনিষ খাইতে ভালবাসেন, তাহা তাহার মাকে বলিয়া দেয়। চৌবেজী আসিবেন, এই সংবাদ পাইয়া শান্তির মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—চৌবেজী দেখিতে কি রকম? শান্তি তখন চৌবেজীর চেহারার অবিকল বর্ণনা করিয়া তাঁহার স্বভাব সম্বন্ধেও অনেক কথা বলে। সে আরও জানায় যে, চৌবেজীর বামকর্ণের কাছে একটি আঁচিল আছে। চৌবেজী আসিলে দেখা গেল, তাঁহাকে না দেখিয়াই শান্তি তাঁহার চেহারার যে বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ভারতের রাজধানীর বুকে এইরূপ জাতিস্মর বালিকার আবির্ভাব দেশের নানাস্থানে আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়। এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক লীডার (Leader) এর ১৯৩৫ ইংরাজী সনের ২৯ শে নভেম্বর সংখ্যায় এই বালিকার বিবরণ প্রকাশিত হয়। শান্তি যথার্থই জাতিস্মর কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য দিল্লীর নাস্তিকসমাজ উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। দিল্লীনগরীতে ১৫ জন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। ইহার সদস্যদের মধ্যে এ্যাড্‌ভোকেট্, রাজনৈতিক নেতা, পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন। উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া এই সমিতি **'A case of Re-incarnation'**

নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কি কি ভাবে শান্তিকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা উক্ত পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ আছে।

উল্লিখিত সমিতির সদস্যগণ শান্তিকে লইয়া মথুরা ষ্টেশনে পৌঁছিলে শান্তি দেখামাত্রই তাহার পূর্ব্বজন্মের ভাসুর বাবুরাম চৌবে ও অন্যান্য আত্মীয় ও প্রতিবেশী-দিগকে চিনিতে পারিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে শান্তি আর কখনও মথুরায় আসে নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সে ষ্টেশন হইতে রাস্তা দেখাইয়া অন্যান্য সকলকে তাহার পূর্ব্বজন্মের বাড়ীতে লইয়া আসে। পূর্ব্বজন্মে মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি গুপ্ত স্থানে সে কতকগুলি টাকা রাখিয়াছিল। তাহাব স্বামী বা পরিবারের আর কেহই ইহা জানিতেন না। শান্তি তাহার পূর্ব্বজন্মের স্বামীকে ঐ টাকার কথা বলে, এবং টাকাগুলি ঠিক জায়গায়ই পাওয়া যায়। পূর্ব্বজন্মে একটি সন্তান প্রসব করিবার ১০ দিন পর সূতিকারোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল—এই সত্য সংবাদটিও সে সর্ব্বসমক্ষে বলে।

সুশীলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে শান্তি তাঁহাকে বলে যে পূর্ব্বজন্মে যে দ্বারকাধীশের পূজা করিত এবং এখনও করে। পূর্ব্বজন্মে সে গীতা, রামায়ণ ও উপনিষৎ পাঠ করিয়াছিল এবং মাতৃগর্ভে বাস করিবার সময়েও পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি তাহার মনে জাগরূক ছিল। পূর্ব্বজন্মে সে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, বদ্রীনাথ, রামেশ্বর ও দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থেও গিয়াছিল।

লুগ্দীদেবী ১৯২৫ সনের ৪ঠা অক্টোবর দেহত্যাগ করেন এবং ১৯২৬ সনের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে শান্তিরূপে পুনবার জন্মেন। লুগ্দীদেবীর আত্মীয়েরা জানান যে, এই মহিলাটি অতিশয় ধর্ম্মভাবাপন্ন এবং পতিগতপ্রাণা ছিলেন। তাঁহার মত পতিসেবা-পরায়ণা রমণী খুব কমই দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই পাতিব্রতা-ধর্ম্মের প্রভাবেই তিনি পরজন্মে জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

৫। বেরিলী-নিবাসী এ্যাড্ভোকেট্ কৈকেয়ীনন্দন সহায় বি-এ, এল্-এল্-বি মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র জগদীশচন্দ্র জাতিস্মর ছিল। এই ছেলেটি তাহার সাড়ে তিন বৎসর বয়সের সময় হইতে পূর্ব্বজন্মের কথা বলিতে আরম্ভ করে। সে বলে যে, পূর্ব্বজন্মে সে বারাণসী-নিবাসী বাবুজী-পাণ্ডের পুত্র ছিল। বাবুজী পাণ্ডের আসল নাম পণ্ডিত মথুরাপ্রসাদ পাণ্ডে। বারাণসীর পাণ্ডেঘাটে ছিল তাহাদের বাড়ী। বেরিলীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় থাকিয়া বারাণসী সম্বন্ধে কোন সংবাদ না জানিয়া জগদীশচন্দ্র তাহার পিতাকে জানাইয়াছিল যে, তাহার পূর্ব্বজন্মের পিতা বাবুজী

পাণ্ডের দুইখানা মোটর গাড়ী ও একখানা ফিটনগাড়ী আছে। বিশাল বাড়ীর সম্মুখে একখানা অলিন্দে তিনি বসেন আর চাকরেরা গায়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া দেয়। বৈকালে তিনি এখানেই বসিয়া বিশ্রাম করেন এবং রাত্রিতে এখানে বসিয়া ভাঙ্ ও আফিঙ্ খান। প্রায়ই ভগবতী নাম্নী এক বাঈজী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করে এবং গান গায়। বাড়ীর ভিতরে মাটীর নীচে একটি কুঠরী আছে এবং তাহার মধ্যে একটি লোহার সিন্দুক আছে। এইরূপ আরও বিভিন্ন সত্য সংবাদ সে পরিবেশন করিয়াছিল।

বালকটিকে পরীক্ষা করিবার জন্য বারাণসীতে লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে বেরিলীর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রামবাবু সাকসেনা এম্-এ, এল্-এল্-বি মহাশয় ১৯২৬ ইংরাজী সনের ২৮ শে জুলাই তারিখে তাহার একটি বিবৃতি রেকর্ড করেন এবং উহার সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়। পূর্ব্বজন্মে তাহার নাম ছিল জয়গোপাল। সেই জন্মে ১০।১১ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। অনুসন্ধানে জানা যায় পূর্ব্বজন্মে সে বাবুজী পাণ্ডের দৌহিত্র ছিল। জন্মের পরই তাহার মাতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতামহ পাণ্ডেজী তাহাকে নিজের সন্তানের মত পালন করিতেন এবং তাঁহাকেই সে বাবা বলিয়া ডাকিত। বালকটির বয়স যখন সাড়ে ছয় বৎসর, তখন তাহাকে বারাণসীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে যথার্থই জাতিস্মর। সুশীলবাবু যখন জগদীশের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন সে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ভুলিয়া গিয়াছিল।

৬। বেরিলী সহরে রামগোপালবাবুর ঔরসে বিশ্বনাথ নামে একটি জাতিস্মর পুত্র ১৯২১ ইং সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বজন্মে সে পিলিভিতের জমিদার হরনারায়ণের পুত্র ছিল। তখন তাহার নাম ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ। তাহার স্বভাব ছিল অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল। যৌবনে সে মদ্য, মাংস ও অসৎসঙ্গে আসক্ত হইয়া পড়ে। শিশু বিশ্বনাথকে পিলিভিতে লইয়া গেলে সে তাহার পূর্ব্বজীবনের বাড়ী ও অন্যান্য নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের বাড়ী ইত্যাদি ঠিক ঠিক ভাবে দেখাইয়া দেয়। তাহার পূর্ব্বজীবনের সমপাঠী, বন্ধু এবং আত্মীয়দিগকেও সে চিনিতে পারে। পূর্ব্বজন্মে সে উত্তমরূপে ডুগিতবলা বাজাইতে শিখিয়াছিল। বর্ত্তমান জন্মে শৈশবেই কাহারও নিকট না শিখিয়া অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত উহা বাজাইতে পারিত। বিশ্বনাথ তাহার পূর্ব্বজীবনের ফটো সনাক্ত করে এবং যে বারবনিতার সঙ্গে সে মেলামেশা করিত, উহার নাম যে পদ্মা ছিল তাহাও সে বলিয়া দেয়। পিলিভিতের পুলিশ

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায়বাহাদুর লালা রামস্বরূপ এবং রায়সাহেব বাবু আসরফিলাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতেই তাহার উল্লিখিত পরীক্ষা হয়। ১৯১৮ ইং সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে পিলিভিতের জমিদারপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ জ্বর ও ফুস্‌ফুস্‌ঘটিত রোগে মারা যায়। পাঁচ মাস রোগভোগের পর ৩৩ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু ঘটে। অনুসন্ধানে জানা যায়, উল্লিখিত জমিদারপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণও ছেলেবেলায় জাতিস্মর ছিল। ৬ বৎসর বয়সের পর ক্রমে সে পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিয়া যায়।

বারবনিতাসক্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক কেমন করিয়া পরজন্মে জাতিস্মর হইল? এই প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগিতে পারে। বাল্যবয়সে সে জাতিস্মর থাকায় বুঝা যায়—ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জন্মে সে এমন কোন সৎকার্য্যসাধন করিয়াছিল, যাহার ফলে সে কয়েকজন্ম পর্য্যন্ত জাতিস্মরত্ব লাভের যোগ্যতা লাভ করে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপ নিশ্চয়ই তাহাকে অধঃপতনের দিকে লইয়া গিয়াছিল। জমিদার-পুত্ররূপে অকাল মৃত্যু লাভ এবং পরজন্মে সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের পুত্রত্বপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের প্রকাশক নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মসমূহে সঞ্চিত পুণ্যের প্রাচুর্য্য তাহাকে অধিকতর অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

৭। আলিগড়ে এক মুসলমান ভদ্রলোকের ঘরে একটি জাতিস্মর ছেলে জন্মে। সে পূর্ব্বজন্মে হিন্দু ছিল। মুসলমানের ঘরে জন্মিয়াও সে হিন্দু আচার মানিয়া চলিতে চাহিত। সে কাহারও উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণ করিত না।

৮। তহশীল বেরেলীর অন্তর্গত করণপুর গ্রামনিবাসী মহম্মদ হাসান খাঁর পুত্র মহম্মদ জহন খাঁ হাফিজ এর কন্যা পীরবান পাঁচ বৎসর বয়সে মারা যায়। মৃত্যুর এক বৎসর পর সে ঐ গ্রামেই মহম্মদ মাদারীখানের কন্যা তুহীর গর্ভে কন্যারূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এবং পূর্ব্বজন্মের সমুদয় বিবরণ বলিতে থাকে। উক্ত করণপুর গ্রামের গণ্যমান্য মুসলমানেরা সকলেই এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়া একটি বিবৃতি দেন এবং তাহাতে সহি করেন। ৺সুশীলকুমার বসু মহাশয়ের লিখিত 'জাতিস্মরকথা' গ্রন্থের ১১০—১১১ পৃষ্ঠায় উক্ত বিবৃতিটি অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে।

৯। ফতেপুরের কালেক্টর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু নন্দীলালের কন্যা শকুন্তলা জাতিস্মর ছিল। মেয়েটির বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন তাহার পিতা এলাহাবাদ হইতে বদলী হইয়া ফতেপুর গিয়া একটা ভাড়া করা বাড়ীতে উঠেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত ভাড়া বাড়ীটির কাছে যাইতেই শকুন্তলা বলিয়া উঠে যে উহা তাহারই পূর্ব্বজন্মের বাড়ী। তখনই সে পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় বিবরণ যথাযথভাবে

বলিতে আরম্ভ করে। সে বলে যে সম্মুখের পুকুরের জল পূর্ব্বে লোনা ছিল এবং পূর্ব্বজন্মে সে গাড়ী গাড়ী আমলকী ফল ঐ পুকুরের জলে ফেলিয়া পচাইয়া জলকে সুপেয় করিয়াছিল। সে আরও বলে যে, পূর্ব্বজন্মে তাহার নাম ছিল 'পেশ্কারিন্' এবং তাহার স্বামীর নাম ছিল গণেশপ্রসাদ। অনুসন্ধানে জানা যায়—সত্যই পূর্ব্বে এই বাড়ীতে গণেশপ্রসাদ নামে এক ভদ্রলোক বাস করিতেন এবং তাঁহার পত্নীর নাম পেশ্কারিন্ ছিল। পেশ্কারিন্ যথার্থই গাড়ী গাড়ী আমলকী ফল পুকুরে ফেলিয়া পচাইয়া জলকে সুস্বাদু করিয়াছিলেন।

শকুন্তলা আরও বলে যে, পেশ্কারিনের মৃত্যু হইলে সে ঝাঁসিতে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। নন্দীবাবু তখন ঝাঁসিতেই ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ কন্যার চাকরাণী তাহাকে বলিত "তুমি যদি মরিয়া নন্দীবাবুর ঘরে জন্মগ্রহণ কর তবে আমি খুব সুখী হইব।" দাসীর মুখে পুনঃ পুনঃ এইরূপ কথা শুনিবার ফলেই বালিকাটি মরিয়া নন্দীলালের কন্যারূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

শকুন্তলার জন্ম হয় এলাহাবাদে ১৯৩৪ ইংরাজী সনের ২৭ শে জানুয়ারী-তারিখে। ১৯৩৬ সনের জুলাই মাস হইতেই তাহার জাতিস্মরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩৯ সনের ৩রা জানুয়ারী তারিখে নন্দীলালবাবু বদলী হইয়া ফতেপুরে আসেন এবং নূতন বাড়ীতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাব কন্যার জাতিস্মরত্বের সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায়। সুশীলবাবু এই মেয়েটির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলে যে পেশ্কারিন্ রূপে মরিবার সময় দেবতার প্রতি তাহার অটুট ভক্তি ছিল। ঝাঁসিতে ব্রাহ্মণকন্যারূপে বাস করিবার কালে তাহার দেবার্চ্চনা করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইত, তৎসত্ত্বেও সে দেবার্চ্চনা করিতে পারিত না; কারণ বাড়ীর লোকেরা সর্ব্বদাই তাহার তাদৃশ প্রচেষ্টায় বাধা দিত। ব্রাহ্মণকন্যারূপে সে প্রত্যহ স্নান করিত এবং মনে মনে ঠাকুরকে ডাকিত।

১০। কাণপুর সহরের মেষ্টন রোডে 'শর্ম্মা রেষ্টুরেণ্ট' নামে একটি দোকান ছিল। সম্ভবতঃ এখনও উহা আছে। উক্ত দোকানের স্বত্বাধিকারী মঙ্গলদেও শর্ম্মার স্ত্রী বিদ্যাবতী দেবী জাতিস্মর ছিলেন। আড়াই বৎসর বয়সের সময় হইতেই তিনি পূর্ব্বজন্মের কথা বলিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন যে, পূর্ব্বজন্মে তিনি পণ্ডিত বাসুদেব শর্ম্মার পত্নী ছিলেন। সুশীলবাবু যখন এই মহিলার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর। এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। শৈশবে যখন তিনি পূর্ব্বজন্মের কথা বলিতে আরম্ভ করেন, তখন

তাঁহার মাতাপিতার মনে আশঙ্কা জন্মে যে শীঘ্র পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি না ভুলিলে হয়তো মেয়ে বাঁচিবে না। তাই তাঁহারা উহা ভুলাইবার জন্য শিশু কন্যাকে উচ্ছিষ্ট খাইতে দিতেন। কিন্তু মেয়েটির পূর্ব্বজন্মের সংস্কার এত দৃঢ় ছিল যে উচ্ছিষ্টভক্ষণজনিত অশুচিতাও তাহা নষ্ট করিতে পারে নাই।

বিদ্যাবতী দেবীর পূর্ব্বজন্মের স্বামী যখন জানিতে পারেন যে তাহার পরলোকগতা পত্নী পুনরায় মানবকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি তাহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হন। মেয়েটি যখন বদায়ুনে অবস্থান করিত, তখন তিনি তথায় গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বালিকা তাহার পূর্ব্বজন্মের স্বামীকে দেখিয়াই চিনিতে পারে। কুশলপ্রশ্নাদির পর বালিকা তাঁহাকে জানায় যে, পূর্ব্বজন্মে সে বাড়ীতে তুলসীতলায় তাহার সোনার হারটি এবং নিমগাছের তলায় ১০০টি টাকা পুতিয়া রাখিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বামীকে বা অন্য কাহাকেও সে ইহা বলে নাই। বাসুদেব শর্ম্মা বাড়ীতে ফিরিয়া নিমগাছের তলা খুঁড়িয়া টাকাগুলি পাইয়াছিলেন; কিন্তু হারটি তিনি তুলসী তলায় খুঁজিয়া পান নাই। সম্ভবতঃ অন্য কেহ হারটি তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। বাসুদেব শর্ম্মা টাকাগুলি পাইয়া এবং হার না পাইয়া বিদ্যাবতী দেবীকে পত্রদ্বারা এই সংবাদ জানাইয়াছিলেন। একটি কন্যা সন্তান প্রসব করার তিন দিন পর বসন্তরোগে বাসুদেব শর্ম্মার পত্নীর মৃত্যু হয়। সেই জন্মে তিনি পতিপ্রাণা ছিলেন। বিদ্যাবতীর পূর্ব্বজন্মের পিতার নামও ছিল বাসুদেব শর্ম্মা। পূর্ব্বজন্মে তিনি শিবভক্ত ছিলেন এবং প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন। পূর্ব্বজন্মে তাঁহার নাম ছিল মোহন দেবী। ইনি বাসুদেব শর্ম্মার তৃতীয়া পত্নী ছিলেন। রাম নাম জপ করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং গঙ্গাতীরে তাঁহাকে দাহ করা হয়।

১১। গোয়ালিয়রে মিহিরলাল নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র সুখলাল জাতিস্মর ছিল। সুখলাল বলিত যে পূর্ব্বজন্মে সে ভিন্দ জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ঐ জন্মে তাহার নাম ছিল কাশীরাম এবং সে তখন পাটোয়ারীর কাজ করিত। ঐ গ্রামের ভগবন্ত সিং-এর পুত্র ছোটেলাল শত্রুতাবশতঃ তরবারির আঘাতে তাহার দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিগুলি কাটিয়া ফেলে এবং তাহার বুকে গুলিবিদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করে। আশ্চর্য্যের বিষয়—এই জন্মেও শিশু সুখলালের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিগুলি জন্মাবধিই ছিল না। এই হত্যাপরাধের অপরাধীকে পুলিশ ও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। সুখলাল যখন তাহার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ

বলিতে থাকে, তখন স্বভাবতঃই নানাস্থান হইতে বহু লোক তাহাকে দেখিতে আসে। জাতিস্মর শিশুর সংবাদ পাইয়া একদিন নহাটাগ্রামের ছোটেলালও শিশুটিকে দেখিতে আসিল। ছোটেলালকে দেখিয়াই শিশু সুখলাল উত্তেজিত হইয়া বলিল—"এই ছোটেলালই পূর্ব্বজন্মে আমাকে হত্যা করিয়াছিল।" ছোটেলাল তখন পলাইয়া বাঁচে।

১২। উত্তর প্রদেশে মৈনপুরী জেলার থানা ফরহা, তহশীল যশরাণার অন্তর্গত কৌরাটিগ্রামে রামচরণ মহাজন নামে একজন লোক বাস করিত। ১৯২৭ সনের ৭ই নভেম্বর তারিখে তাহার একটি জাতিস্মর পুত্র জন্মে। এই শিশুটি আড়াই বৎসর বয়সের সময় হইতে তাহার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ বলিতে থাকে এবং তাহার পূর্ব্বজন্মের স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির নিকট তাহাকে উপস্থিত করিলে সে দেখিবামাত্র তাহাদের প্রত্যেককে সনাক্ত করে। পূর্ব্বজন্মে তাহার নাম ছিল গোপী বেনিয়া। সর্পাঘাতে গোপীর মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর এক বৎসর পরে সে প্রায় ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী কৌরাটি গ্রামে রামচরণের পুত্ররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

১৩। এটোয়ায় বাবুরাম বাবু নামে এক ভদ্রলোক ওকালতি করিতেন। তাঁহার এক ভগিনীর নাম ছিল বিটলী। এই স্ত্রীলোকটি সর্ব্বদাই বলিত যে মৃত্যুর পর সে তাহার ভ্রাতা বাবুরামের কন্যারূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে। ১৯৫৬ সংবতের আশ্বিনমাসে শুক্লপক্ষে বিটলীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে সে ফরাক্কাবাদে তাহার স্বামিগৃহে অবস্থান করিতেছিল। ১৯৬৮ সংবতের আষাঢ় মাসে কৃষ্ণপক্ষে সে বাবুরামের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। সেই ছিল বাবুরামের প্রথম সন্তান। বাবুরাম মেয়েটির নাম রাখেন গিরিজা। এই বালিকার বয়স যখন চারি বৎসর, তখন সে তাহার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ বলিতে থাকে এবং পরীক্ষাদ্বারা দেখা যায়, তাহার কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য।

১৪। মামুদাবাদে শিবলাল নামে একটি লোকের বাড়ী ছিল। সে টুণ্ডলা ষ্টেশনে রেলবিভাগে কাজ করিত। শিবলালের দ্বিতীয় কন্যা 'চরণদেঈ' পূর্ব্বজন্মের বিবরণ বলিতে পারিত। সুশীলবাবু যখন এই মেয়েটির সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তাহার বয়স ১১ বৎসর। এই বালিকা তিন বৎসর বয়সে প্রথম কথা বলিতে শিখে এবং তখনই পূর্ব্বজন্মের বিবরণ বলিতে থাকে। সে বলে যে পূর্ব্বজন্মে তাহার বাড়ী ছিল আগ্রা সহরের জীন-কী-মণ্ডি মহল্লায়। তখন তাহার নাম ছিল গোপা। সে অতিশয় পতিপ্রাণা ছিল এবং প্রত্যহ দেবার্চ্চনা করিত। স্বামীর

দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে জ্বররোগে তাহার মৃত্যু হয়। এই মেয়েটি যথার্থই জাতিস্মর ছিল কি না, বুঝিবার জন্য তাহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। প্রত্যেক পরীক্ষায়ই সে উত্তীর্ণ হয়।

১৫। শিবদয়াল নামে এক ভদ্রলোক কাণপুরে মোক্তারী করিতেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মুসলমানেরা তাঁহাকে হত্যা করে। শিবদয়াল কাণপুরের প্রেমনগর মহল্লার অধিবাসী ছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পরে তিনি উক্ত প্রেমনগর মহল্লারই অপর অধিবাসী দেবীপ্রসাদ ভাটনগরের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং জাতিস্মর হন। ১৯৩৩ সনের আগষ্ট মাসে এই ছেলের জন্ম হয়। কথা বলিতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পূর্ব্বজন্মের বিবরণ বলিতে থাকে। ১৯৩৮ সনের মাঝামাঝি সময়ে তাহার জাতিস্মরত্বের বিববণ সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়। সুশীলবাবু যখন এই জাতিস্মর বালিকাটির সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তাহার বয়স ৬ বৎসর। দেবীপ্রসাদ শিশুকে তাহার পূর্ব্বজন্মের স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য পরিজনদের নিকট উপস্থিত করিলে সে তাহাদের প্রত্যেককেই ঠিক ঠিক ভাবে চিনিতে পারিয়াছিল।

১৬। চন্দ্রশেখর আজম নামে একটি লোক বিপ্লবীদলের কর্ম্মী ছিল। রাজদ্রোহের অভিযোগে তাহার ফাঁসি হয়। যতদূর মনে হয়, এলাহাবাদে তাহার ফাঁসি হইয়াছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পরে লক্ষ্নৌ এর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এবং জাতিস্মর হয়। এই বালকটিও তাহার পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী ও ফাঁসির বিবরণ ঠিক ঠিক ভাবে বিবৃত করিয়াছিল। এই জাতিস্মর বালকের বিশদ বিবরণ কাণপুর হইতে প্রকাশিত 'বর্ত্তমান' পত্রিকায় এবং লক্ষ্নৌ হইতে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক 'পাইওনিয়ার'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'জাতিস্মরকথা' গ্রন্থের ১৭৮তম পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি ছাড়াও অন্যান্য জাতিস্মর ব্যক্তিদের বিবরণ সুশীলবাবুর গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'জাতিস্মরকথা' গ্রন্থের ১০৮তম পৃষ্ঠায় হীরা কুঁয়ার নাম্নী জাতিস্মর বালিকার এবং ১৫৯তম পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ সুইডেনের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী মিসেস্ সিগনী রুণ্ডগুইষ্ট (Mrs. Signe Rundguist) এর বিবরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সুশীলবাবু ছাড়াও অন্যান্য বহু গ্রন্থকার বিভিন্ন ভাষায় রচিত নানাগ্রন্থে বহু জাতিস্মর ব্যক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পণ্ডিত ৺সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের রচিত জন্মান্তররহস্য গ্রন্থ হইতে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটি নিম্ন প্রকার—

একবার পশ্চিমদেশীয় একখানা খবরের কাগজে লিখিত হইয়াছিল—"এক ব্যক্তি বঙ্গদেশ হইতে চাকুরী করিবার জন্য পশ্চিমদেশে আসেন। এখানে আসিয়া একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে গমন করেন। সেই বাড়ীতে গিয়াই যেন তাঁহার চিত্তে কোন পুরাণো স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট সেই বাড়ীর একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমাদের এই বৈঠকখানার ঐ উত্তরপার্শ্বে বুদ্ধদেবের একখানি রৌপ্যপ্রতিমা ছিল না ?'

বাড়ীর ভদ্রলোকটি তদুত্তরে বলিলেন—'হাঁ মহাশয়! ছিল। আমার পিতা ঐ মূর্ত্তিটি স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও অনেকদিন ছিল। আমার বয়স যখন দশ বারো বৎসর, তখন মাতাঠাকুরাণী উহা একজন বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রলোকের নিকট বিক্রয় করেন। তখন আমাদের বড়ই অর্থকষ্ট হইয়াছিল।' বঙ্গীয় যুবক বলিলেন—'তোমাদের বাড়ীর মধ্যে একটা নিমগাছ ছিল; তাহা আছে ?' ভদ্রলোকটি বলিলেন—'কৈ না।' 'তোমার পিতা সেই বৃক্ষতলে কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার সংখ্যা অনেক। তোমরা পাইয়াছিলে কি ?'

ভদ্রলোক—সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

বঙ্গীয় যুবক—তোমার মাতাঠাকুরাণী জীবিত আছেন ?

ভদ্রলোক—আছেন, কিন্তু অতিশয় বৃদ্ধা হইয়াছেন বলিয়া নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পারেন না।

বঙ্গীয় যুবক—তাঁহাকে একবার এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।

টাকার লোভেই হউক, অথবা ভদ্রলোকের অনুরোধেই হউক, গৃহস্বামী তাহার বৃদ্ধা মাতার নিকট গমন করিয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন 'হাঁ নিমগাছ ছিল। সেবার ঝড়ের সময় গাছটা উপাড়িয়া পড়িয়া যায়। তুমি তখন খুব ছোট। আর তোমার পিতার যে কিছু টাকা ছিল, তাহা আমি জানি; কিন্তু কোথায় ছিল, তাহা তিনি মৃত্যুকালে বলিয়া যাইতে পারেন নাই। যে ভদ্রলোক এই সকল সংবাদ বলিয়াছেন, তিনি বোধ হয় ভাল জ্যোতিষী হইবেন। তাঁহাকে একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বল।'

গৃহস্বামী আসিয়া সে কথা বঙ্গীয় যুবকের নিকট বলিলে তিনি বৃদ্ধার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। বাটীর মধ্যে গিয়া পূর্ব্বস্মৃতি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া পড়িল। তাঁহার সম্পূর্ণরূপে মনে হইল—পূর্ব্বজন্মে এই বাড়ী তাঁহারই ছিল, ঐ প্রৌঢ় ব্যক্তি তাঁহার পুত্র এবং বৃদ্ধা তাঁহার মনোহারিণী কান্তা ছিলেন। তখন তিনি বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া যেখানে টাকা প্রোথিত ছিল তাহা বলিয়া দিলেন। পূর্ব্বসম্বন্ধের কথাও প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল।"

(জন্মান্তর রহস্য, ১৭শ সংস্করণ ; পৃষ্ঠা—৭৪—৭৬)

স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার পুনর্জ্জন্মবাদ গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ) কয়েকজন জাতিস্মর লোকের বিচিত্র কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন ; তন্মধ্য হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"বার বৎসরের বালক প্যাস্কাল (Pascal) জ্যামিতির দুরূহ অংশগুলির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিয়াছিল। পাঁচবৎসর বয়স্ক মেষপালক ম্যান্‌জিয়ামেলো কলের ন্যায় অনায়াসে কঠিন অঙ্কসমূহ কষিতে পারিত।......জেরা কোল্‌বার্ণের বয়স যখন আটবৎসর মাত্র তখন সে কোনরূপ অক্ষর ব্যবহার না করিয়াই তড়িতের ন্যায় কঠিন কঠিন অঙ্কসমূহের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিত।......একবার ঐ বালক আট সংখ্যাটিকে ষোলগুণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পনেরটি সংখ্যায় তাহার উত্তর বলিয়া দিল। সংখ্যাটি হইল ২৮১, ৪৭৪, ৯৭৬, ৭১০, ৬৫৬। তাহার সংখ্যাগুলিও নির্ভুল হইয়াছিল। পরে যখন ঐ দীর্ঘ সংখ্যাটির বর্গমূল (square root) কত হইবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তখন সে মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার সঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার পর ঐ সংখ্যাটির ঘনমূল (cube root) সম্বন্ধেও যখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তখন সে ক্ষণিকের মধ্যে তাহা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল। কোন এক ব্যক্তি বালকটিকে একবার অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন: 'আচ্ছা বল দেখি আটচল্লিশ বৎসরে কতগুলি মিনিটের সংখ্যা হয়?' বালকটি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছিল ২৫, ২৮৮, ৮০০ মিনিট।

বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতবিৎ মোজার্ত্ত চারি বৎসর বয়সে যন্ত্রসঙ্গীতের একটি গৎ ও আট বৎসর বয়সে একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। থেরেসা মিলানোল্লা অল্প বয়সে এমনি কৃতিত্বের সহিত বেহালা বাজাইয়াছিল যে সকলে শুনিয়া ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিল—থেরেসা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে তাহা শিক্ষা করিয়াছিল।"

—পৃষ্ঠা—৬০—৬১

স্বামী অভেদানন্দ উক্ত গ্রন্থেই পুনরায় বলিয়াছেন "একটি ৬ বৎসর বয়সের

বালিকাকেও আমি দেখিয়াছি। সে অতি সুন্দররূপে ও আশ্চর্য্যভাবে পিয়ানো যন্ত্র বাজাইতে পারিত এবং সে কোন গৎ একবার মাত্র শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহা হুবহু বাজাইতে পারিত।" —পৃষ্ঠা—৬২

উল্লিখিত ঘনটাগুলি ছাড়াও আরও বহু জাতিস্মর ব্যক্তির বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে অধিক প্রকাশে বিরত রহিলাম। বর্ত্তমানেও যে প্রায়ই বিভিন্ন স্থানে জাতিস্মর ছেলেমেয়েরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। যাঁহারা সুদূর গ্রামাঞ্চলে বাস করার ফলে দৈনিক সংবাদপত্র পড়িবার সংযোগ পান না, তাঁহাদের অবগতির জন্য কলিকাতার দুইখানা দৈনিক সংবাদপত্র হইতে ঐরূপ কয়েকটি ঘটনা প্রদর্শন করিতেছি।

বিগত ১৩৭৫ সনের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩০ শে মে ১৯৬৮ ইং) বৃহস্পতিবারের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত জাতিস্মর মেয়েটির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার ভাষায় সংবাদটি নিম্নপ্রকার।

"তমলুক শহরের নিকটবর্ত্তী কাপাসবেড়্যা গ্রামের শ্রীবলাই পাত্রের সাড়ে তিন বছরের মেয়ে 'পুটি' তার পূর্ব্বজন্মের সমূহ বৃত্তান্ত সঠিক বলিতে পারায় ঐ অঞ্চলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সে বল্‌ছে—পূর্ব্বজন্মে সে শালগেছ্যা গ্রামের শ্রীবংশী বেরার স্ত্রী ছিলও তার তখনকার নাম ছিল 'কাজল', তার সে সময় একটি ছেলে ও একটি মেয়েও ছিল। সে আরও বল্‌ছে—একদিন তার স্বামী তার গালে চড় মারায় সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার মৃত্যু হয়েছে ভেবে তার গলায় দড়ি দিয়ে গাছে তাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। প্রত্যহ শত শত লোক তাকে দেখতে যাচ্ছে।"

বিগত ১৩৭৬ সালের ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ্চ ১৯৭০ ইং) তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায় বুবুল নামক একটি জাতিস্মর বালকের সংবাদ প্রকাশিত হয়। "বুবুল বলে সে বাড়ী যাবে" শিরোনামায় সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল। যুগান্তর পত্রিকার ভাষায় সংবাদটি নিম্নপ্রকার।—

"বুবুল বলে, সে বাড়ী যাবে। বাড়ীতেই সে আছে, মা-বাবার চোখের মণি—একমাত্র সন্তান। দাদু ও ঠাকুমার আদরের ধন। ফুটফুটে ফুলের মতন দেখতে। কিন্তু মাঝে মাঝেই সে কেমন হয়ে যায়, কেঁদে ওঠে, রেগে যায়, বলে—আমি বাড়ী যাব, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল। মা বাবা আদর করে বুবুল সোনার মুখে চুমো খান। তাতে সে আরও রেগে যায়। কেমন যেন লজ্জা ও বিরক্তি তার চোখে মুখে

ফুটে উঠে। বাবাকে বলে—'দাদা, তুমি আমায় অমন করবে না। আমায় এখুনি বাড়ী নিয়ে চল।' এ রকম ভাবান্তরের সময় সে আর বাবাকে বাবা বলে না, মাকে মা বলে না। তার পিসি তার বাবাকে দাদা ডাকে, সেও তখন ডাকে 'দাদা'।

"কোথায় তোমার বাড়ী?" জলে ভরা টলটল চোখে তার গোলাপের মত লাল টুক্‌টুকে গাল দুটো ফুলিয়ে বলে—'আমাদের বাড়ী? আমাদের বাড়ী অনেক দূরে, অনেক দূরে।···আমায় বাজারে নিয়ে চল।' 'কোথায় তোমাদের বাজার?' 'ঐ যে আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা গলি, গলি পেরিয়ে বাজার, লালবাজার।' বিস্কুট, চকোলেট ভারী প্রিয় বুবুলের। কিন্তু অন্য স্মৃতিতে যখন সে ফিরে যায়, তখন তাও সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বলে—'না না, আমি ওসব খাব না। এই তো মা আমাকে খেতে দিলে—ডাল, ভাত, আলু···। তারপর বললে 'বোনের জন্য বিস্কুট নিয়ে আয় তো।' আমি সাইকেলে করে বোনের জন্যে বিস্কুট আনতে যাচ্ছিলাম।'

তারপর? তার পরের কথা আর কিছু বলতে পারে না। বাবার সাইকেল দেখলে মাঝে মাঝে সে যেন একেবারে পাগল হয়ে যায়। তারপর? তার পরে কথা আর কথায় বলেছিল—বাড়ী তাদের 'ভিরি'তে। তার বোনের নাম 'চিত্তা' আর তার নাম 'পুত্তা'। মাত্র তিন বছর বয়সের বুবুলকে নিয়ে বাড়ীর লোকের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। বুবুল তার মার দেয়া নাম। বাবা ডাকেন 'শুভ্র' বলে। আর পোষাকী নাম 'প্রসূন'।

সোমবার ব্যারাকপুর সদরবাজারে ওদের বাড়ীতে অনেকক্ষণ কাটালুম। ওর বাবা শ্রীপ্রেমাংশু চট্টোপাধ্যায়, ওর মা, ঠাকুমা সবাই বললেন—সেই দুই বছর বয়স থেকেই ওকে নিয়ে এই সমস্যা চলছে। এখন মাত্র তিন বছর দুমাস বয়স। বুবুল আমার সঙ্গে দিব্যি কথা বলেছে। পেয়ারার লোভ দেখিয়ে রাজী করিয়েছি আমাদের বাড়ী আসতে। বুবুল কি জাতিস্মর? পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিই কি তাকে সময় সময় পাগল করে তোলে?"

১৩৭৬ বাংলায় ২৩শে চৈত্র তারিখের যুগান্তর পত্রিকার সপ্তম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল।—

"রূপালী চা বাগানের তিন বছরের ছেলে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে দেখার জন্যে গত কয়েকদিন ধরে হাজার হাজার লোকের ভীড় হচ্ছে। এই ছোট ছেলেটি ডুয়ার্স-

বাসীদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। গত ২৫শে মার্চ্চ দুপুরবেলা হতে এই শঙ্কর তার পূর্ব্বজন্মের কথা বল্‌ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, 'বেলুড়ে আমাদের তিন নং বাড়ীতে যাব'—এই বলে।

সে বল্‌ছে, তার পূর্ব্বজন্মের পিতার নাম ছিল শ্রীসুধীর কুমার ঘোষ। তারা দুই ভাই, চার বোন্ ছিল। বড়দিদি স্বপ্না তাকে অনেক ভালবাসতো। তার ছোট ভাই আমাশয়ে ভুগে মারা গেছে। সে ডাক্তার আনতে গিয়ে ফিরে এসে দেখে ছোট ভাই মারা গেছে। তার নাম ছিল অলোক ঘোষ।

শঙ্করকে দেখার জন্য রোজ কয়েক হাজার দর্শকের ভীড় হতে থাকায় চা বাগানের কাজকর্ম্মে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে বলে বাগানের ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন। শঙ্করের পিতা শ্রীখগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী এক বিবৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ভীড় না করার জন্য আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে, শঙ্করের মত আরও জাতিস্মর এর পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছে, এ ছাড়া ছেলেটির মানসিক ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে চিকিৎসকগণ তাকে স্বাভাবিকভাবে পারিবারিক অবস্থায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।"

১৩৭৭ বাংলায় ২৭শে ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ ইং) রবিবারের যুগান্তর পত্রিকায় (পৃষ্ঠা ১ এবং ৫) "মাতৃগর্ভে ১৮ মাসের শিশু কথা বল্‌ছে" শিরোনামায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে।—

"জাকার্তা, ১২ই সেপ্টেম্বর। একটি শিশু এখনও মাতৃগর্ভে রয়েছে অথচ এই শিশুর মা বলছেন, শিশুটি কথা বলতে পারে এবং পবিত্র কোরাণের বাণী উদ্ধৃত করে। ইংরেজী, ফরাসী, ইন্দোনেশীয় এবং জাপানী ভাষায় শিশুটি কথা বলতে পারে বলে তার মা দাবী করছেন। শিশুর মা শ্রীমতী জহরা ফোন্না (২৩) জানান যে, তিনি ১৮ মাস ধরে এই শিশুকে গর্ভে ধারণ করছেন। এই সংবাদ জাকার্তায় খুব প্রচারলাভ করেছে। এমন কি প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর সঙ্গেও শ্রীমতী জহরা ফোন্নার সাক্ষাৎকার হয়েছে।

জাকার্তার শহরাঞ্চল কামাতে শ্রীমতী জহরা ফোন্না আজ সাংবাদিকদের বলেন যে, ভগবানের ইচ্ছায় তিনি এই শিশুকে ধারণ করেছেন এবং পুরোপুরিভাবে শিশুর নির্দ্দেশ মানছেন। এই শিশুর কান্না, প্রার্থনা এবং কথা বলার ক্ষমতা সম্বন্ধে জাকার্তায় সংবাদপত্রে নানা কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমতী আজ সাংবাদিকদের দুটি এক্স-রে ছবি দেখান। গর্ভ সঞ্চারের পাঁচ মাস এবং তের মাস পরে পাকিস্তানে

এই এক্স-রে করা হয়েছে বলে তিনি জানান। সাংবাদিকদের ৪৫ মিনিটব্যাপী সাক্ষাৎকারের সময় শিশুটিকে কথা বলাতে পারা যায় নি। এক সময় শিশুটি কাঁদছে বলে তার মা দাবী করেন এবং ঐ অস্পষ্ট কান্নার শব্দ কয়েক মিনিট ধরে শোনা গেছে।

শ্রীমতী জহরা ফোন্না এবং তাঁর স্বামী ১০ই অক্টোবর পশ্চিম জার্মানী রওনা হবেন এবং পরে দুই সপ্তাহের জন্য পাকিস্তানে থাকবেন। ইতিপূর্বে তাঁরা পাকিস্তান, পশ্চিম জার্মানী, জাপান ও মালয়েশিয়া সফর করেছেন, কিন্তু ঐসব দেশের ডাক্তারেরা এই অনন্যসাধারণ ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। শ্রীমতী জানান, ইন্দোনেশীয় ডাক্তারদের দ্বারা পরীক্ষা করাতে শিশুটি নিষেধ করেছে এবং দুবছর পরে মক্কায় সে ভূমিষ্ঠ হবে বলে জানিয়েছে। শিশুটি বলেছে যে, সে একটি ছেলে, কিন্তু এখনও তার নাম ঠিক করেনি।

শ্রীমতী বলেন—'সে খুব চতুর ছেলে এবং আমি সুখী'। অনেক লোক তাঁদের উপহার ও অর্থ দিতে চেয়েছে, কিন্তু তাঁরা কিছুই গ্রহণ করেন নি। শিশুটি তা পছন্দ করে না বলে তিনি জানান এবং বলেন যে, তাঁদের পরিবারবর্গ তাঁদের বিদেশযাত্রার অর্থ দিয়েছেন···। শিশুটির বলার ক্ষমতার কথা গত বছরের গোড়ার দিকে প্রথম প্রচারিত হয়। শিশুটির মা বাবা গ্রামের সাধাসিধে লোক। একটা বিরাট ধোঁকার কথা এ রকম দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা চালিয়ে যেতে পেরেছেন—সেটা বিশ্বাস করাও কঠিন।—রয়টার।"

জাতিস্মর ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে অনুরূপ অসংখ্য ঘটনা বিভিন্ন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলিতে একটু খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পাপের ফল

যাহারা গুরুতর পাপকার্য্য করিয়া রাজদণ্ড ভোগ, তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা এই পাপ ক্ষালন না করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল নরক ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ নরকভোগ কোন কোন ক্ষেত্রে হীনযোনিতে জন্ম-গ্রহণের মাধ্যমেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করতঃ ক্ষুৎপিপাসা শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বারা অশেষ ক্লেশ ভোগ করিবার পর হীনযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, আর কেহ কেহ সোজাসুজি ঐ সকল যোনিতে জন্মিয়া দেহধারী অবস্থায়ই নরকভোগ করিয়া থাকে। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে এই সম্বন্ধে বহু কথা বলা হইয়াছে। পাপগুলিকে সাধারণতঃ ৬টি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) অতিপাতক (২) মহাপাতক (৩) অনুপাতক (৪) উপপাতক (৫) জাতিভ্রংশকরপাতক এবং (৬) সঙ্করীকরণ পাতক। মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা এই সকল পাপের স্বরূপ, তাহা ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান, এবং না করিয়া মরিলে ইহাদের বিষময় ফল বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

১। অতিপাতক :—সংহিতাকার বিষ্ণু বলেন—মাতৃগমন, দুহিতৃগমন এবং পুত্রবধূগমনরূপ গুরুতম পাপকে অতিপাতক নামে অখ্যাত করা হয়। এইরূপ অতিপাতকীরা যদি নিজেদের কৃত পাপ সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপাইয়া পাপদেহ ভস্মীভূত করে, কেবলমাত্র তাহা হইলেই তাদৃশ মৃত্যুর পর উল্লিখিত পাপের কুফল হইতে রক্ষা পায়।

> "মাতৃগমনং দুহিতৃগমনং স্নুষাগমনমিত্যতিপাতকানি।
> অতিপাতকিনস্তেতে প্রবিশেয়ুর্হুতাশনম্।
> ন হ্যন্যা নিষ্কৃতিস্তেষাং বিদ্যতে হি কথঞ্চন॥"—বিষ্ণুসংহিতা, অধ্যায়—৩৪

২। মহাপাতক :—বিষ্ণুসংহিতার মতে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের সুবর্ণহরণ ও গুরুপত্নীগমন—এইগুলি মহাপাতক। এইরূপ মহাপাতকের জন্য বিষ্ণু দ্বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছেন। অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন অথবা পৃথিবীর সমস্ত তীর্থে পর্য্যটন। (অধ্যায়—৩৫)

৩। অনুপাতক :—যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে অথবা রজস্বলা বা গর্ভবতীকে হত্যা করিলে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক হয়। গর্ভস্থ ভ্রূণ, শরণাগত ব্যক্তি বা সুহৃদকে হত্যা করিলেও ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক হয়। দ্বিজাতির পক্ষে সুরাপান, ব্রহ্মোত্তর ভূমি বা গচ্ছিত দ্রব্যের অপহরণ, পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর বা নৃপতির পত্নীতে গমন, পিসী, মাসী, শিক্ষক বা মিত্রের পত্নীতে গমন, সগোত্রা বা উচ্চবর্ণের পত্নীতে গমন, রজস্বলা-গমন প্রভৃতি পাপ করিলে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক হয়। এই সকল পাতক মহাপাতক হইতে সামান্য লঘু বলিয়া ইহাদিগকে অনুপাতক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তেরই তুল্য (অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন বা সর্ব্বতীর্থ-পর্য্যটন)। (বিষ্ণুসংহিতা, অধ্যায়—৩৬)।

৪। উপপাতক :—গুরুজনের নিকট মিথ্যাভাষণ, রাজা বা বিচারকের নিকট অনর্থক অপরের দোষকীর্ত্তন, গুরুনিন্দা, বেদনিন্দা, অধীতশাস্ত্র-বিস্মরণ, আহিত অগ্নি পরিত্যাগ, উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে মাতা, পিতা, পুত্র ও পত্নীকে ত্যাগ, অভোজ্যান্ন ভোজন, অভক্ষ্যভক্ষণ, পরস্বাপহরণ, পরদারগমন, বর্ণবিহিত বৃত্তিপরিত্যাগ, অসৎ-প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রহত্যা, গোহত্যা, নাস্তিক্যবৃত্তির সাহায্যে জীবিকানির্ব্বাহ প্রভৃতি পাপকে উপপাতক নামে অভিহিত করা হয়। উপপাতকীরা আত্মশুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধাভরে চান্দ্রায়ণব্রত, পরাকব্রত, অথবা গোমেধ যজ্ঞ করিলে পাপের কুফল হইতে রক্ষা পান। (অধ্যায়—৩৭)

[গোমেধ যজ্ঞের স্বরূপ সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের মনে সম্প্রতি একটি ভ্রান্তধারণা আছে। পশ্চিমদেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তির রচিত বিভিন্ন গ্রন্থই এইরূপ ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। ইঁহারা বলেন—গোমেধ যজ্ঞে হিন্দুরা গোবধ করিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজা রন্তিদেবের যজ্ঞে বহু পশু বধের বর্ণনার উল্লেখ করা হয়। বস্তুতঃ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই জানা যায়—রাজা রন্তিদেবের যজ্ঞে হরিণ, ছাগল, শশক প্রভৃতি পশু বলি দেওয়া হইয়াছিল ; গোবধ করা হয় নাই। গোসব বা গোমেধ যজ্ঞের বর্ণনা যজুর্ব্বেদে রহিয়াছে। যজুর্ব্বেদ এবং শ্রৌতসূত্রগুলি হইতে জানা যায়—গোজাতির উন্নতি কামনায় যজ্ঞে হবির্দান, অসংখ্য গরুকে উত্তম তৃণাদি খাদ্য দান, পত্রবহুল-বৃক্ষশাখাদ্বারা গোদেহ হইতে মশা-মাছি বিতাড়ন এবং অন্যান্য প্রকার গোজাতির সেবাকার্য্যই গোমেধ-যজ্ঞে করা হইত। গোবধ কোথাও করা হইত না।]

৫। জাতিভ্রংশকর পাতক :—দণ্ডাদিদ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্যথা দেওয়া, মদ্য প্রভৃতি

অঘ্রেয় বস্তুর ঘ্রাণ লওয়া, কুটিলতা, পশুমৈথুন এবং পুংমৈথুন—এইগুলিদ্বারা যে পাপ হয়, তাহাদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জাতিনাশ হয় বলিয়া এই গুলিকে জাতি-ভ্রংশকর পাতক নামে অভিহিত করা হয়। স্বেচ্ছায় উল্লিখিত প্রকার পাপ করিলে আত্মশুদ্ধির জন্য সান্তপনব্রতের এবং অনিচ্ছায় করিলে তাহার জন্য প্রাজাপত্যব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। (অধ্যায়—৩৮)

৬। সঙ্করীকরণ পাতক :—গ্রাম্য বা আরণ্য পশু হত্যা করলে যে পাপ হয় তাহার নাম সঙ্করীকরণপাতক। এইরূপ পাপ ক্ষালনের জন্য কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র নামক প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন অথবা একমাস যাবকাহার করিয়া থাকিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত বিষ্ণু অপাত্রীকরণ, মলাবহ এবং প্রকীর্ণনামে আরও তিন শ্রেণীর পাপের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য স্মৃতিকারেরা শেষোক্ত পাপগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে গণনা করেন নাই, এই কারণে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রদানে বিরত রহিলাম।

বিষ্ণুসংহিতার ৪৪তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—গুরুতর পাপকার্য্যে লিপ্ত মনুষ্যেরা মৃত্যুর পর নরকভোগান্তে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অতিপাতকে লিপ্ত অপরাধীরা বৃক্ষাদি স্থাবরযোনিতে এবং মহাপাতকীরা কৃমিযোনিতে দেহ ধারণ করে। অনুপাতকীরা পক্ষিযোনিতে এবং উপপাতকীরা জলচরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। জাতিভ্রংশকরপাপে লিপ্ত ব্যক্তিরাও পরজন্মে জলচর জন্তুরূপে দেহধারণ করিয়া থাকে। যাহারা বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করে অথবা অদত্তা কন্যাতে উপগত হয়, তাহারা পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে সকল দুরাত্মা সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণের আচার নষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে কলুষিত করে, তাহারা অস্পৃশ্যশ্রেণীর মনুষ্যযোনিতে জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য গুরুতর পাপকার্য্য করিলেও পাপের গুরুত্ব অনুসারে কেহ কেহ হিংস্র মাংসভুক্ প্রাণীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশুচি লোকের প্রস্তুত বা স্পৃষ্ট অন্ন অথবা অন্যবিধ অবৈধ খাদ্য ভক্ষণ করে, সে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। চুরি (ডাকাতি) করিলে পরজন্মে শ্যেনপক্ষীরূপে এবং অপরের রাস্তা বন্ধ করিলে মূষিকরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ধান্য হরণ করিলে মূষিক, কাংস্য চুরি করিলে হংসপক্ষী, পানীয়জল হরণ করিলে অভিপ্লব নামক পক্ষী, মধু চুরি করিলে দংশ (বড় মাছি), দুগ্ধ হরণ করিলে কাক, মিষ্টদ্রব্য হরণ করিলে কুকুর, ঘৃত হরণ করিলে নকুল, মাংস হরণ করিলে গৃধ্র, চর্ব্বি চুরি করিলে মদ্‌গুপক্ষী, তৈল চুরি করিলে তৈল-পায়িক পক্ষী (ঘুঘু বিশেষ), লবণ চুরি করিলে বীচিবাক্ নামক পক্ষী, দধি চুরি করিলে বলাকা এবং কৌষেয়, ক্ষৌম এবং কার্পাসবস্ত্র হরণ করিলে যথাক্রমে তিত্তিরি,

দর্দ্দুর এবং ক্রৌঞ্চ পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গরুচোর পরজন্মে গোসাপরূপে, গুড় হরণকারী বাগ্‌গুদ পক্ষীরূপে এবং গন্ধদ্রব্যহরণকারী ছুচ্ছুন্দরীরূপে জন্মিয়া থাকে। পত্র বা শাক হরণ করিলে পরজন্মে ময়ূরযোনিতে, অন্যের জন্য রান্না বা প্রস্তুত করা খাদ্যসামগ্রী হরণ করিলে শল্লকীরূপে এবং অগ্নিহরণ করিলে বকপক্ষী রূপে জন্মিতে হয়। গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি হরণ করিলে গৃহহারীনামক কীটবিশেষরূপে এবং রক্তবস্ত্র বা শাড়ী হরণ করিলে চকোরপক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। হস্তিচোর কূর্ম্মরূপে, অশ্বচোর ব্যাঘ্ররূপে এবং ফলপুষ্পহরণকারী বানররূপে জন্মগ্রহণ করে। নারী-হরণকারী পরজন্মে ভল্লুকরূপে, নৌকাদিযান হরণকারী উষ্ট্ররূপে এবং সাধারণ পশু-হরণকারী ছাগলরূপে জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা যদি উল্লিখিত প্রকার পাপকর্ম্ম করে, তবে তাহাদিগকেও একই প্রকার ফলভোগ করিতে হয়।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—পাতকীরা দেহত্যাগান্তে নরকভোগের পর পাপানুযায়ী নিম্নপ্রকার যোনিসমূহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা পরের বস্তু লাভ করিবার জন্য অথবা অন্য যে কোন প্রকারে অপরের অনিষ্ট সাধনের জন্য চিন্তা করে, অথবা অন্য প্রকার অপকর্ম্মসাধনের চেষ্টা করে, তাহারা মৃত্যুর পর নরকভোগান্তে অন্ত্যজ মনুষ্যশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। মিথ্যাভাষণে অভ্যস্ত, খলস্বভাব ও প্রবঞ্চনাশীল লোকেরা পশু ও পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা অদত্তা কন্যাতে বা পরস্ত্রীতে উপগত হয়, অথবা যাহারা অবৈধ উপায়ে প্রাণিহিংসা করে, তাহারা বৃক্ষাদি স্থাবরযোনিতে জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বদা অন্যায়কার্য্যে রত, অস্থির-প্রকৃতি, বিষয়াসক্ত ও বিলাসী লোকেরা রজোগুণের প্রাবল্য হেতু মৃত্যুর পর হীন শ্রেণীর মনুষ্যরূপে দেহধারণ করে। নিদ্রালু, ক্রূরকর্ম্মে রত, লোভী, নাস্তিক, যাচক, প্রমাদগ্রস্ত, এবং অকারণে নিজের বর্ণানুযায়ী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যবর্ণের কার্য্যে লিপ্ত আর্য্যসন্তানেরা তমোগুণের আধিক্যবশতঃ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি নরকভোগান্তে মৃগ, শূকর বা কুকুররূপে এবং মদ্যপায়ী আর্য্যসন্তান গর্দ্দভযোনিতে অথবা পুক্কশ ও বেন নামক অস্পৃশ্যশ্রেণীর মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বর্ণচোর ক্রমান্বয়ে কৃমি, কীট ও পতঙ্গরূপে এবং মাননীয়া নারীর শ্লীলতাহরণকারী ব্যক্তি তৃণ, গুল্ম ও লতারূপে পুনরায় জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য পাপের ফলে মানুষ পরজন্মে যেরূপ দেহধারণ করে বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য জানাইয়াছেন, তাহা বিষ্ণুসংহিতায় প্রদত্ত বর্ণনারই অনুরূপ।

মনু বলেন—গুরুতর পাপকার্য্য সম্পাদনের পর বিহিত দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্তদ্বারা

তাহার ক্ষালন না করিলে কেহ কেহ বর্ত্তমান জন্মেই বিবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া শাস্তিভোগ করে, এবং অন্যেরা মৃত্যুর পর (নরকভোগান্তে) পুনরায় মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অথবা অঙ্গহীন হইয়া ক্লেশ পায়। এই সম্বন্ধে মনুর বচন যথা—

"ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈস্তথা
প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্য্যয়ম॥ ১১ | ৪৮ ॥

এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতার ১১ শ-অধ্যায়ে লিখিত আছে—বিভিন্ন পাপকার্য্যের নিদর্শনস্বরূপ মানুষ নিম্নলিখিত-প্রকার চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া তাহাদের পাপের প্রমাণ বহন করে। স্বর্ণচোরের নখ হয় কুৎসিত, সুরাপায়ী ব্যক্তির দাঁত হয় শ্যামবর্ণ, ব্রহ্মহত্যাকারী হয় ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, গুরুপত্নী বা অন্য মাননীয়া মহিলার শ্লীলতাহানির ফলে জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগ হয় চর্ম্মহীন। খলস্বভাব ব্যক্তির নাসিকায় হয় দুর্গন্ধ এবং পরনিন্দাকারী ব্যক্তির হয় মুখে দুর্গন্ধ। ধান্যচোরের ঘটে অঙ্গহীনতা এবং খাদ্যে ভেজাল মিশাইবার ফলে হয় অধিকাঙ্গতা। অন্নচোর উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয় এবং অন্যের লেখা নিজের নামে চালাইলে ইহার ফলে মানুষ হয় বাক্‌শক্তিরহিত। বস্ত্রাপহারক শ্বেতকুষ্ঠরোগে এবং অশ্বচোর পঙ্গুরোগে আক্রান্ত হয়। দীপহরণকারী ব্যক্তি হয় অন্ধ এবং দীপনির্ব্বাপণকারীর হয় এক চোখ কানা। অকারণে অন্যলোককে হিংসা করিলে তাহার ফলে হয় এক সঙ্গে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণ, এবং বলাৎকারের ফলে হয় অঙ্গস্ফীতি। এইভাবে অন্যান্য গুরুতর পাপের ফলেও মানুষ কখনও হয় জড়বুদ্ধি, কখনও চলচ্ছক্তিরহিত, কখনও মূক, কখনও অন্ধ, কখনও বধির এবং কখনও বা বিকৃতাঙ্গ। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মনুসংহিতারই অনুরূপ।

বিষ্ণুসংহিতার ৪৫ তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—পাপীরা নরকভোগান্তে পুনঃ পুনঃ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার পর যখন মনুষ্যকুলে জন্মলাভ করে, তখন পূর্ব্বজন্মের পাপ অনুযায়ী তাহাদের দেহে নিম্নলিখিত দুরারোগ্য ব্যাধিসকলের আবির্ভাব ঘটে। যে ব্যক্তি অতিপাতকশ্রেণীর পাপ করে সে পুনরায় মনুষ্যকুলে জন্মিয়া দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তির হয় যক্ষ্মারোগ। এইভাবে অন্যান্য পাপের ফলে পরজন্মে যে সকল ব্যাধি বা অনুরূপ চিহ্নে পাপীরা চিহ্নিত হয় বলিয়া মনুসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে, বিষ্ণুসংহিতাতে ও কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাষায় তাহাই বলা হইয়াছে। অধিকন্তু বিষ্ণু বলেন—যে ব্যক্তি দেবতা বা ব্রাহ্মণের

প্রতি ক্রোধ-প্রকাশ করে সে পরজন্মে বাক্‌শক্তিরহিত হয়। বিষপ্রদানকারীর জিহ্বা ঝুলিয়া পড়ে। অন্যের গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ করিলে তাহার ফলে মানুষ হয় উন্মাদ। গুরুজনের অবজ্ঞাকারী ব্যক্তির দেহে জন্মে অপস্মার ব্যাধি। চুরির ফলে জন্মিতে হয় জলচর নক্ররূপে এবং দেবতা, অতিথি প্রভৃতিকে না দিয়া একাকী মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিলে বাতগুল্মরোগদ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়। বিশ্বাসভঙ্গকারীর মাথায় চুল থাকে না। অবিবাহিত অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করিলে তাহার ফলে জন্মে শ্লীপদ রোগ। পরের জীবিকাহরণকারী ব্যক্তি হয় দরিদ্র এবং পরপীড়নকারী ব্যক্তির যে কোন রোগ কোন ঔষধেই সহজে সারে না।

শাতাতপ-সংহিতাতে (অধ্যায়-১) বলা হইয়াছে—গুরুতর পাপকার্য্য সাধনের পর বিহিত প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া দেহত্যাগ করিলে তাহার ফলে পাপী ব্যক্তিরা পরবর্ত্তী কয়েকজন্মে পাপানুযায়ী বিবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হয়। মহাপাতকীরা সাত জন্ম, উপপাতকীরা পাঁচ জন্ম এবং সাধারণ পাপীরা তিন জন্ম এইরূপ ব্যাধিদ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে।

"মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্ত-জন্মসু জায়তে।
উপপাপোদ্ভবং পঞ্চ ত্রীণি পাপসমুদ্ভবম্॥" ১ | ৩॥

শাতাতপ একথাও বলিয়াছেন যে, পরবর্ত্তীজন্মে উল্লিখিতপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া ঔষধেও রোগ সারিতেছে না দেখিয়া যখন মানুষ ইহাকে পাপজব্যাধি বলিয়া জানিতে পারে, তখনও যদি সে উক্ত পাপক্ষালনের জন্য শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করে এবং অনুতপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই জন্মেই তাহার পাপমুক্তি ঘটে এবং অতঃপর আর কোন জন্মেই তাহাকে এইভাবে ক্লেশ পাইতে হয় না। এই সম্বন্ধে শাতাতপের বচন যথা—

"প্রায়শ্চিত্তবিহীনানাং মহাপাতকিনাং নৃণাম্।
নরকান্তে ভবেজ্জন্ম চিহ্নাঙ্কিতশরীরিণাম্॥
প্রতিজন্ম ভবেত্তেষাং চিহ্নং তৎপাপসূচকম্।
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে যাতি পশ্চাত্তাপবতাং পুনঃ॥ ১ | ১—২॥

শাতাতপ ইহাও জানাইয়াছেন যে, উল্লিখিত পাপজ ব্যাধিগুলি জপ, দেবার্চ্চনা, হোম, দান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মদ্বারাও প্রশমিত হইয়া থাকে।

"দুষ্কর্ম্মজা নৃণাং রোগা যান্তি চোপক্রমৈঃ শমম্।
জপৈঃ সুরার্চ্চনৈর্হোমৈর্দানৈস্তেষাং শমো ভবেৎ॥ ১ | ৪॥

শাতাতপ জানাইয়াছেন যে, মহাপাতকশ্রেণীর পাপ করিলে ইহার ফলে মানুষ পরবর্ত্তী জন্মসমূহে কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাস, অতিসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, চক্ষুহানি প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। যাহারা উপপাতকশ্রেণীর পাপে লিপ্ত, তাহারা পরবর্ত্তী জন্মসমূহে জলোদরী, যকৃতের ও প্লীহার ব্যাধি, শূলরোগ, ফোড়া, শ্বাসরোগ, অজীর্ণ, দুরারোগ্য জ্বর, বমন রোগ, অপস্মার, হঠাৎ মূর্চ্ছিত হওয়া, গলগ্রহ, রক্তার্ব্বুদ, বিসর্প প্রভৃতি ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হয়। অতিপাতকের ফলে পরজন্মে মানুষ অর্শ প্রভৃতি ক্লেশদায়ক ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য সাধারণ পাপের ফলে দেহকম্প, বিচর্চ্চিকা, বল্মীক, পুণ্ডরীক, চিত্রাঙ্গতা প্রভৃতি ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়।

শাতাতপ বলেন (অধ্যায়—২) ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি নরকভোগের পর পুনরায় যখন আর্য্যবংশসম্ভূত মনুষ্যের গৃহে জন্মলাভ করে, তখন সে পাণ্ডুকুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। উষ্ট্র হত্যা করিলে পরজন্মে মানুষের কণ্ঠস্বর হয় বিকৃত এবং অশ্বহত্যাকারীর ঠোট হয় বাঁকা। যে ব্যক্তি মহিষী বধ করে, তাহার দেহে জন্মে কৃষ্ণগুল্ম রোগ। গর্দ্দভ হত্যা করিলে পরজন্মে সেই ব্যক্তির দেহে গর্দ্দভের মত লোম হয়। এই ভাবে অন্যান্য পাপের ফলেও মানুষের দেহে যে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি বা অন্যপ্রকার চিহ্ন পরজন্মে উৎপন্ন হয়, তাহার বিস্তৃত তালিকা শাতাতপ দিয়াছেন। এইগুলি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু প্রভৃতি স্মৃতিকারদের প্রদত্ত তালিকারই অনুরূপ বলিয়া আর পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করিলাম না।

শাতাতপ জানাইয়াছেন (অধ্যায়-৪)—যে ব্যক্তি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের স্বর্ণ হরণ করে, সে পরজন্মে নির্ব্বংশ হয়। মুক্তা হরণ করিলে পরজন্মে কেশের বর্ণ হয় পিঙ্গল এবং পিত্তল বা মধু হরণ করিলে পরজন্মে দুরারোগ্য নেত্ররোগে আক্রান্ত হইতে হয়। সীসক হরণ করিলে শীর্ষরোগ, দুগ্ধ হরণ করিলে বহুমূত্ররোগ এবং ইক্ষু হরণ করিলে উদরগুল্মরোগে আক্রান্ত হইতে হয়। তৈল চুরি করিলে দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগ এবং পকান্ন হরণ করিলে জিহ্বারোগ জন্মে। ফল চুরি করিলে অঙ্গুলিতে দুরারোগ্য ব্রণ জন্মে এবং তাম্বুল হরণ করিলে ওষ্ঠ হয় শ্বেতবর্ণ। শাকচোরের চক্ষু হয় নীলবর্ণ, কন্দমূলাদি হরণ করিলে বাহু হয় হ্রস্ব এবং সুগন্ধিদ্রব্য হরণ করিলে দেহে হয় দুর্গন্ধ। এইভাবে কোন্ বস্তু চুরি করিলে সেই চোরের দেহে পরজন্মে কিরূপ ব্যাধি বা চিহ্ন থাকে, তাহার দীর্ঘ তালিকা শাতাতপ দিয়াছেন।

শাতাতপ আরও বলিয়াছেন (অধ্যায়-৫)—যে পাপিষ্ঠ মাতৃস্থানীয়া নারীতে

উপগত হয়, পরজন্মে তাহার জননেন্দ্রিয় থাকে না। আর্য্যবংশে জন্মিয়া যে চণ্ডাল-জাতীয়া নারীর সহিত মিলিত হয়, সেই নরাধমকে পরবর্ত্তী মনুষ্যজন্মে অণ্ডকোষহীন হইয়া ধরাধামে আবির্ভূত হইতে হয়।

"মাতৃগামী-ভবেদ্ যস্ত লিঙ্গং তস্য বিনশ্যতি।
চাণ্ডালী-গমনে চৈব হীনকোষঃ প্রজায়তে॥" (৫ । ১)

গুরুপত্নীতে উপগত হইলে পরজন্মে দুরারোগ্য মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে এবং ভ্রাতৃপত্নীতে উপগত হইলে গলৎকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। পুত্রবধূতে উপগত হইলে পরবর্ত্তী জন্মসমূহে অসাধ্য কৃষ্ণকুষ্ঠরোগে পচিয়া মরিতে হয়। যে সকল পাপাত্মা আর্য্যবংশে জন্মিয়া সগোত্রা নারীকে বিবাহ করে, তাহারা পরজন্মে দুরারোগ্য ভগন্দররোগে ক্লেশ পায়।

"সগোত্রস্ত্রীপ্রসঙ্গেন জায়তে চ ভগন্দরঃ।" (৫ । ৩২)

সন্ন্যাসিনীর সহিত সহবাস করিলে প্রমেহরোগে এবং পশুযোনিতে উপগত হইলে মূত্রাঘাত রোগে কষ্ট পাইতে হয়। অনুরূপ পাপের ফলে স্ত্রীলোকদিগকেও পরজন্মে অনুরূপ ব্যাধিদ্বারাই আক্রান্ত হইতে হয়। এইভাবে অন্যান্য পাপের ফলে পরজন্মে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদের তালিকাসহ প্রত্যেকটি পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান ত্রিকালদর্শী পরমকারুণিক মহর্ষি শাতাতপ দিয়াছেন।

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তের ফলে যে উল্লিখিত প্রকার দুশ্চিকিৎস্য পাপজ-ব্যাধি বিদূরিত হইয়া পাপী ব্যক্তির মুক্তিলাভ হয়, এই বিষয়ে আমার নিজের একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য ঘটনাটি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। আমার জন্মভূমি বর্ত্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত কাশীপুর গ্রাম হইতে মাইল খানেক উত্তর পশ্চিমদিকে দশঘর নামে একটি গ্রাম আছে। সর্ব্বপ্রথম ১০টি পরিবার বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া এই গ্রামটির পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় দশঘর। এই দশঘর গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিতবংশের লোকেরা আমাদের পুরোহিত ছিলেন। অপরপক্ষে দশঘরের পণ্ডিতেরাও কাশীপুরের ভট্টাচার্য্যবংশকে (আমাদের বংশকে) পুরোহিতরূপে বরণ করিয়াছিলেন। উভয়বংশের লোকেরা পরস্পরের বাড়ীতে পৌরোহিত্য করিতেন। উভয় বংশের লোকেরাই যজুর্ব্বেদীয় কাশ্যপ-গোত্রোৎপন্ন হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক হইত না। তবে উভয়বংশের আত্মীয়তা ছিল অতি ঘনিষ্ঠ ; প্রায় এক পরিবারের মত।

দশঘরের পণ্ডিতবংশের ৺গুরুচরণ পণ্ডিত ছিলেনএকাধারে আমাদের যজমান এবং পুরোহিত। তিনি বয়সে পিতৃদেবের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন, তাই পিতৃদেব তাঁহাকে 'পুরোহিত দাদা' বলিয়া ডাকিতেন আর আমরা ডাকিতাম 'পুরোহিত জ্যাঠা'। ৺গুরুচরণ পণ্ডিতের তিনপুত্রের মধ্যে জ্যোষ্ঠপুত্র গিরিজাপ্রসন্ন স্মৃতিশাস্ত্রী পিতৃদেবের ছাত্র ছিলেন। তিনি একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে হেড্পণ্ডিতের কাজ করিতেন এবং বিভিন্ন ব্যাপারে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিতেন। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, অথচ অহঙ্কার বিন্দুমাত্রও ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্রের কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তিনি আলোচনা করিবার জন্য পিতৃদেবের নিকট আসিতেন। সম্ভবতঃ এখনও তিনি জীবিত আছেন। ৺গুরুচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র গিরীন্দ্র বাড়ীতে থাকিয়া বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও পৌরোহিত্য করিতেন এবং তৃতীয়পুত্র মহেন্দ্র তখন মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ার চেষ্টায় আছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই আমার চেয়ে বয়সে বড়।

গুরুচরণ পণ্ডিত মহাশয় আচারনিষ্ঠ সদাচারী ব্রাহ্মণ। জীবনে কোন অন্যায়কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া কেহ শুনে নাই। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্লেশদায়ক শূলরোগে তিনি প্রায়ই কষ্ট পাইতেন। বহুবিধ চিকিৎসা করাইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই ব্যাধি আরোগ্য হয় না। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে এই ব্যাধি এতই যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল যে, তাঁহার ব্যাধির যন্ত্রণা যে দেখিত, সে ই অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিত না। শাস্ত্রজ্ঞ গিরিজাপ্রসন্ন স্কুল হইতে ছুটি লইয়া পিতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছেন। অন্যান্য পুত্রেরা এবং পুত্রবধূরাও সাধ্যমত শুশ্রূষা করিতেছেন। প্রবীণতম চিকিৎসককে দিয়া চিকিৎসা করানো হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হয় না। এইরূপ অবস্থায় একদিন রোগযন্ত্রণায় কাতর বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠপুত্রকে বলিলেন—"আমার মনে হইতেছে, পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে। তুমি তোমার পূজনীয় অধ্যাপক আমাদের কুলপুরোহিত স্মৃতিরত্নের (আমার পিতার) সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কর। হয়তো তাহা হইলে আমার যন্ত্রণার অবসান হইবে।"

গিরিজাপ্রসন্নও মনে মনে এইরূপ চিন্তাই করিতেছিলেন। পিতার নির্দ্দেশ পাইয়া সেই দিনই তিনি আমার পরামারাধ্য পিতৃদেবের সহিত পরামর্শ করিতে আসিলেন। সেই বৎসর আমি ব্যাকরণ শাস্ত্রের মধ্য পরীক্ষায় আসাম সংস্কৃত বোর্ড হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া উপাধির পাঠ্য পড়িতেছি। স্মৃতি শাস্ত্রেও আমার প্রাথমিক

জ্ঞান আছে। শাস্ত্রালোচনা করিয়া পিতৃদেব প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন। তখন গিরিজাপ্রসন্ন বলিলেন—"অগ্রদানী ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব বটে, কিন্তু তাহাকে দিয়া তো মন্ত্রপাঠ করাইব না। আপনিই উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্রপাঠ করান।" পিতা উত্তর করিলেন—"প্রায়শ্চিত্তে মন্ত্রপাঠ তো আমি করাই না। তবে তোমরা আমার পরমাত্মীয় এবং একাধারে যজমান ও পুরোহিত; সুতরাং রবীন্দ্রকে পাঠাইব। সে মন্ত্রপাঠ করাইবে।" ইহার একদিন পরই প্রায়শ্চিত্তের দিন স্থির হইল। কিভাবে মন্ত্রপাঠ করাইতে হইবে, পিতৃদেব শিখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—মন্ত্র পড়ান শেষ হইলেই আমাকে পুকুরে নামিয়া অবগাহন স্নান করিতে হইবে এবং দানীয়সামগ্রী কিছুই আমি স্পর্শ করিতে পারিব না।

গুরুচরণ পণ্ডিত যন্ত্রণায় কাতরাইতে কাতরাইতে মধ্যমপুত্রের কাঁধে ভর দিয়া অতি কষ্টে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিলেন। গিরিজাপ্রসন্নও সম্মুখে উপস্থিত। আমি যথাবিধি মন্ত্রগুলি পাঠ করাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। তাহার পর গোগ্রাস দান করিতে হইবে। ভৃত্যকে উত্তম ঘাস আনিবার কথা বলিয়া গিরিজাপ্রসন্ন অন্য কাজে বাহির হইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই ভৃত্য অতি পুষ্ট কতকগুলি তৃণ আনিয়া উপস্থিত করিল। ঘরের বলিষ্ঠ গাভীকেও আনা হইল। আমি মন্ত্রপাঠ করাইতে লাগিলাম এবং রুগ্ন পণ্ডিত মহাশয়—

"সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥"

মন্ত্র বলিয়া তৃণগুচ্ছটি গাভীর সম্মুখে ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাভীটি সমগ্র তৃণগুচ্ছটিকে নিঃশেষে ভক্ষণ করিল। শাস্ত্র বলেন—গাভী যদি প্রদত্ত তৃণগুচ্ছ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে। গোগ্রাস দানের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যথা অনেকটা কমিয়া গেল এবং পুত্রের কাঁধে ভর না দিয়া লাঠিতে ভর দিয়া তিনি স্বেচ্ছায় গৃহে প্রবেশ করিলেন; অবশ্য স্নান করিবার পর। আমি পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলাম।

একটু পরেই গিরিজাপ্রসন্ন বাড়ী ফিরিয়া গোগ্রাসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং গাভী নিঃশেষে গোগ্রাস গ্রহণ করিয়াছে জানিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা হইতে ঘাস আনিয়াছিলি?" ভৃত্য উত্তর করিল—"গোবরের ঢিবির পাশ হইতে।" শুনিয়া আমরা সকলেই স্তম্ভিত। গোবরের ঢিবির পাশে যে সকল ঘাস জন্মে, তাহা অতিশয় পুষ্ট হয় বটে, কিন্তু কোন গরু ভ্রমেও তাহা মুখে দেয় না। অথচ

আশ্চর্য্যের বিষয়—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গাভীটি নিঃশেষে সমুদয় ঘাস খাইয়াছে। আমরা সকলেই গিয়া দেখিলাম—সত্যই গোবরের ঢিবির পাশ হইতে ঘাস আনা হইয়াছে। তখন গিরিজাপ্রসন্নের নির্দ্দেশে সেইস্থান হইতে আরও কিছু পুষ্ট কচি ঘাস আনিয়া সেই গাভীটিকে দেওয়া হইল ; কিন্তু এইবার গাভী ঘাসের গন্ধ লইয়াই মুখ সরাইয়া নিল। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ঘাস খাওয়ানো গেল না। তখন ঘরের অন্যান্য গরুগুলিকে সেই ঘাস দেওয়া হইল ; কিন্তু প্রত্যেকটি গরুই গন্ধ গ্রহণ করিয়াই ঘাস পরিত্যাগ করিল। গিরিজাপ্রসন্ন বিস্মিত হইয়া বলিলেন—নিশ্চয়ই পিতার রোগমুক্তি ঘটিবে ; নতুবা গাভী কিছুতেই এইরকম গোগ্রাস গ্রহণ করিত না। সকলের অনুরোধে দ্বিপ্রহরে পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতেই ভোজন করিতে হইল। আহার করিবার সময় বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় পাশে বসিয়া খাওয়ার তত্ত্বাবধান করিলেন। তখন তাঁহার ব্যথা একেবারেই নাই। আহারের পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

সেইদিন রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম—বৃদ্ধ পুরোহিত জ্যাঠা সম্পূর্ণ সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমাকে বলিতেছেন—"বাবা রে ! তুমি মন্ত্র পড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া আমাকে রীতিমত সুস্থ করিয়াছ। পূর্ব্বজন্মে একটি গুরুতর পাপকার্য্য করার ফলে আমার এই দুরারোগ্য শূলরোগ হইয়াছিল। আরও কয়েক জন্ম এই ব্যাধিতে কষ্ট পাইতাম ; কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে আমি এখন পাপমুক্ত।" এইরূপ স্বপ্ন দেখিবার পরই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রাত্রি ভোর হওয়ার অল্প বাকী। বেলা প্রায় একপ্রহর সময় দশঘর হইতে লোক আসিয়া সংবাদ দিল—পূর্ব্বদিন শেষরাত্রে বৃদ্ধ গুরুচরণ পণ্ডিত বিনা যন্ত্রণায় হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ জানিয়া পিতার কাছে আমার স্বপ্ন-বিবরণ বলিলে তিনি মন্তব্য করিলেন—"পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলেই ধর্ম্মপ্রাণ পুরোহিত দাদা এইরূপ কষ্ট পাইতেছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে পাপক্ষয় হওয়ায় তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।"

কোন কোন লোক যে ইহ জন্মেই পাপের ফল ভোগ করে, তাহার একটি দৃষ্টান্তও আমার জানা আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই ঘটনাটিও প্রকাশ করিতেছি। আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ৺বসন্তকুমারী দেবী ১৯৫৭ ইং সনে ৺কাশীধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার বাল্য বয়সে তাঁহার পিত্রালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, তাহা মাতৃদেবীর নিকট যেভাবে শুনিয়াছি, সেইভাবেই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার মাতুলালয় শ্রীহট্ট জেলায় (বর্ত্তমান বাংলাদেশে)

বিশ্বনাথ থানার এলাকাধীন 'কালীজুরি' গ্রামে। ঐ গ্রামের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী মাঠের ভিতর দিয়া একটি খাল প্রবাহিত হইতেছে। হেমন্তকালে ইহা একেবারে শুকাইয়া যায়। কার্ত্তিকমাসে ঐ খালে তখন কিছুটা জল থাকিত। খালের উৎপত্তি-স্থানে ব্রাহ্মণানদীর তীরে 'মুটুককোণা' নামে যে ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহারই নামানুসারে খালের নাম হইয়াছে 'মুটুককোণার খাল'।

কালীজুবি গ্রামের ভদ্রবংশীয় একজন লোক অত্যন্ত মামলাবাজ ছিলেন। অনেক সময়ে মিথ্যা মোকদ্দমা সৃষ্টি করিয়া তিনি কোন কোন নিরীহ প্রতিবেশীকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িতেন। এইরূপ মামলা মোকদ্দমার ফলে অপরের ভূসম্পত্তি গ্রাস করিয়া তিনি বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন। দুষ্কার্য্যপরায়ণ লোকদের সাহায্যকারীর অভাব কোন কালেই থাকে না। উক্ত ভদ্রলোকও বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের বিনিময়ে বহু নীচাশয় লোককে নিজের দলে আনিয়া সকলের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। একবার এক মিথ্যা মোকদ্দমায় তিনি তাঁহার এক সম্পন্ন প্রতিবেশীকে সর্ব্বস্বান্ত করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পরোপকারী সজ্জন ছিলেন। বিপদের দিনে কোন কোন দরিদ্র গ্রামবাসী তাঁহার নিকট আশাতীত সাহায্য পাইত। এইভাবে উপকৃত একজন নীচজাতীয় প্রতিবেশী তাহার উপকারীর দুঃখে ব্যথিত হয়। সে বলে—"কর্ত্তা! আপনি হুকুম দিলে এখনই আমি এই পাষণ্ডের মাথা কাটিয়া আনিয়া আপনার পায়ে ফেলিতে পারি।" উত্তরে ভদ্রলোক বলিলেন—"না হে, এরূপ কিছু করিও না। আমি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আছি। তিনিই উহাকে শাস্তি দিবেন!" লোকটি ক্ষুণ্নমনে চলিয়া গেল।

যে লোকটি অত্যাচারী ভদ্রলোকের মাথা কাটিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহার স্বভাব ভাল ছিল না। মধ্যে মধ্যে সে চুরি করিত। একদিন গভীর রাত্রিতে সে দূরবর্ত্তী গ্রামে চুরি করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মুটুককোণার খালের তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। শুক্লপক্ষের পঞ্চমী কি ষষ্ঠী তিথি। তখনও জ্যোৎস্না একেবারে পড়ে নাই। দূর হইতে সে দেখিল—একজন লোক খালের পার হইতে ক্রমশঃ জলের দিকে নামিতেছে। চেহারা দেখিয়া মনে হইল—ইনি সেই অত্যাচারী ভদ্রলোকটিই হইবেন। সে খালের পাড় ছাড়িয়া একটু দূর দিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ৪।৫ মিনিটের মধ্যেই সেই স্থানে পৌঁছিল।

জলের দিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার অনুমান সত্যই বটে। তাহার গ্রামের বহুলোকের সর্ব্বনাশের কারণস্বরূপ সেই ভদ্রলোকটিই জলের পাশে বসিয়া পায়খানা

করিতেছেন। সেইদিন তাঁহার একটি মোকদ্দমা ছিল। আদালতের কার্য্য শেষ হওয়ার পর দীর্ঘপথ হাঁটিয়া আসিতে এত রাত্রি হইয়াছে। চোরটিকে খালের পাড়ে দেখিয়া ভদ্রলোকের ভয় হইল। তিনি তাড়াতাড়ি শৌচ করিয়া চলিয়া যাইতে চাহিলেন। গভীর রাত্রি। পার্শ্বে কোথাও মানুষের চিহ্নমাত্র নাই। লোকটির প্রকৃতিও তাঁহার জানা; সুতরাং ভয় হওয়ারই কথা।

এদিকে চোরটিও বহু আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাইয়াছে। এই সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়িবে না। তিন লাফে সে জলের কাছে আসিল এবং হস্তস্থিত সিদ কাঠি দ্বারা শৌচরত ভদ্রলোকটিকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। ভদ্রলোক মারাত্মকভাবে আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উঠিবার জন্য মাথা তুলিলেন। এদিকে চোর দেখিল—শিকার পলাইয়া যাইবে; সে নিমেষমধ্যে লম্ফ দিয়া তাঁহারা দেহের উপর উঠিল এবং বাম হাঁটুদ্বারা তাঁহার দেহটিকে জলের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। চোরের দেহে প্রচণ্ড শক্তি। তদুপরি ভদ্রলোকের আঘাত মারাত্মক। সুতরাং উঠিবার জন্য দুই চারিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া জলের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও কিছুক্ষণ লোকটি তাঁহার দেহটিকে চাপিয়াই রাখিল। যখন মৃত্যু সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইল, তখন মৃতের দেহটি ভালরকম পরীক্ষা করিয়া সঙ্গের টাকা পয়সাগুলি লইয়া চম্পট দিল। পরদিন মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইল; কিন্তু হত্যাকারীর সন্ধান কেহ পাইল না। যে লোকটি হত্যা করিয়াছিল, তাহাকে কেহ সন্দেহ করিল না। যথারীতি পুলিশ আসিল, তদন্ত হইল এবং অপরাধী সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না পাওয়ায় ঘটনাটি চাপা পড়িয়া গেল।

উক্ত ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে হত্যাকারী লোকটির বাম হাঁটুতে একটি মাংসপিণ্ড গজাইয়া উঠিতে লাগিল। শক্ত মাংসপিণ্ড, কিন্তু তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা। ডাক্তারী ও কবিরাজী চিকিৎসা হইল; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। শেষ পর্য্যন্ত অপারেশনের সাহায্যে বর্দ্ধিত মাংসখণ্ড কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় যন্ত্রণার অবসান ঘটিল। কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই পুনরায় মাংসখণ্ডটি গজাইতে লাগিল এবং পূর্ব্বের চেয়েও অধিক যন্ত্রণা দেখা দিল। এবারও অপারেশনদ্বারা সে নিষ্কৃতি পাইল। এইভাবে প্রতি ২।৩ মাস পর পর অনবরত অপারেশন চলিল; কিন্তু রোগ আর সারিতে চায় না। বৎসরের পর বৎসর এইভাবে চলিতে লাগিল। অবশেষে একদিন লোকটি স্বপ্নে দেখিল—যে ভদ্রলোকটিকে যে হত্যা করিয়াছিল, তিনি

আসিয়া বলিতেছেন "তুই যতদিন নিজের অপরাধের কথা প্রকাশ না করিতেছিস্, ততদিন এ ব্যাধি সারিবে না।" পরদিন হইতে যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পাইল।

তখন লোকটি গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার অপরাধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হাঁটুর মাংস-বৃদ্ধি এবং যন্ত্রণাও অনেকটা কমিয়া আসিল। আর অপারেশনের প্রয়োজন রহিল না। দিন কয়েকের মধ্যেই তাহার জ্বর হইল এবং এই জ্বরেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। সকলেই বলিতে লাগিলেন—লোকটির পাপ প্রকাশ করিবার জন্যই ভগবান্ তাহাকে এই ব্যাধি দিয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন—

"ত্রিভির্ব্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দ্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে॥"

[তিন বৎসর, তিন মাস, তিন পক্ষ বা তিন দিনের মধ্যে অতি উৎকট পাপের ফলভোগ এই জীবনেই আরম্ভ হইয়া যায়।]

আমার পরমারাধ্য ৺মাতৃদেবী উক্ত হত্যাকারী লোকটিকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার নিজের মুখ হইতে তাহার উল্লিখিত পাপকার্য্যের বর্ণনা শুনিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পরলোকের কয়েকটি সংবাদ

বহু প্রেতাত্মা কখনও ছায়ামূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া, কখনও আকাশবাণীর সাহায্যে, কখনও পত্রাদির উপর লিখিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় বা অপরের জিজ্ঞাসিত বিষয়ে বিবিধ তথ্য বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ বিবরণ বিভিন্ন মনীষীর লেখা নানা গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থেও যে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ৺সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত **"জন্মান্তর রহস্য"** গ্রন্থ হইতে এইরূপ কয়েকটি সংবাদ বর্ত্তমানে উদ্ধৃত করিতেছি।

১। উইল্‌সনসাহেবের প্রেতাত্মা

বর্ত্তমানে যে সত্য ঘটনাটির উল্লেখ করিতেছি, ইহা আমেরিকার বোষ্টন সহরে ঘটিয়াছিল। জেমস্ ভিক্টর উইল্‌সন এবং ডক্টর ডেভিস্ নামক দুইজন ভদ্রলোকের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ডক্টর ডেভিস্ প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 'প্রকৃতির দৈবীশিক্ষা বা উপদেশ' নামে তিনি একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং উহা আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। উক্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া উইল্‌সন প্রথমে ডেভিসের পাণ্ডিত্য জানিতে পারেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে ঘন ঘন আলাপ ও সাক্ষাৎকার হইতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত দুইজনের মধ্যে পরম সম্প্রীতি জন্মে। উভয় বন্ধুর মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হইল—যিনি পূর্ব্বে পরলোকগমন করিবেন, তিনি জীবিত বন্ধুর কাছে সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত হইয়া পরলোকের সংবাদ বলিবেন। এইরূপ স্থির হওয়ার কিছুদিন পর অকস্মাৎ একদিন উইল্‌সনের মৃত্যু ঘটিল।

ডক্টর ডেভিস্ আশা করিয়াছিলেন, শীঘ্রই একদিন উইল্‌সনের আত্মা আসিয়া তাঁহার নিকট পরলোকের রহস্য উদ্ঘাটন করিবেন ; কিন্তু বেশ কিছুদিন অতীত হইল উইলসনের আত্মার দর্শন পাওয়া গেল না। ডেভিস্ তখন আশা ছাড়িয়া দিলেন। কিছুদিন পরে ডক্টর ডেভিস্ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া বেশ কিছুদিন ভুগিলেন।

রোগের উপশম হইলে একদিন তিনি স্বগৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল কে যেন আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। ডেভিস্ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু সেই স্থান হইতে পরলোকগত উইল্‌সনের কণ্ঠস্বরে কেহ কথা বলিতে লাগিল। ডেভিস্ প্রথমে চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেই কণ্ঠস্বরটি শুনিয়া নিঃসন্দেহে অবগত হইলেন যে, ইহা সত্যই উইল্‌সনের কণ্ঠস্বর।

উইল্‌সনের আত্মা বলিল—"আমি তোমাকে তিনবার খুঁজিয়া গিয়াছি; তিনবার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছি। তুমি পার্থিব পদার্থের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলে। তোমার অন্তরাত্মা পরলোকতত্ত্ব বুঝাইবার উপযুক্ত অবস্থায় ছিল না। বর্ত্তমানে তোমার শরীর ভাল নহে; এ সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করার শক্তি তোমার নাই। এক্ষণে আমি চলিলাম, উপযুক্ত অবস্থায় উপযুক্ত অবসরে আবার তোমার আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

এই ঘটনার অনেকদিন পরে ডক্টর ডেভিস্ যখন রীতিমত সুস্থ হইয়াছেন, তখন উইল্‌সনের প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ডেভিস্ চাহিয়া দেখিলেন—জীবদ্দশায় উইল্‌সনের যে রকম আকৃতি ছিল, ঠিক সেই রকম আকৃতিতেই তিনি ডেভিসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। জীবদ্দশায় তাঁহার চেহারায় যেটুকু লাবণ্য ছিল, তাহা যেন আরও বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। উইল্‌সনের বিবৃতিটি পণ্ডিত "সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা অতি দীর্ঘ। তাঁহার উক্তির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আমার অকস্মাৎ মৃত্যুতে তুমি এবং সমাজের সকলেই বড় চিন্তিত হইয়াছিলে। কিন্তু কোন জিনিষই হঠাৎ হয় না। আমার বর্ত্তমান সঙ্গীরা সকলেই তাহা জানিতেন ও বহুকাল হইতে এই ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।······আত্ম-লোকের ভৌগোলিক তত্ত্বসকল আমার উপর দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইতেছিল এবং আমার পরলোকপ্রাপ্তির পূর্ব্বসন্ধ্যায় আমার আত্মা পারলৌকিক সুখনিবাসের কথা ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে বিস্ময়ে উন্নীত হইয়াছিল। ক্রমে এ চিন্তা আমার দুর্ব্বল দেহের পক্ষে অত্যন্ত উন্নত, অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত বলবতী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধতন প্রদেশসকল যথাসম্ভব বিস্তৃত, বিকশিত হইতে লাগিল; রক্তস্রোতঃ ওতপ্রোতভাবে আমার মস্তকে ছুটিতে লাগিল, নামিতে লাগিল। কি একটা আভ্যন্তরীণ শক্তি আসিয়া আমার আত্মাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে আকর্ষণে

আমি পরাজিত হইতে লাগিলাম। বুঝিতে পারিলাম, আমার ভিতরে যেন একটা বিশেষ রকমের পরিবর্ত্তন চলিতেছে।"

"আপনার কথা আমার মনে ছিল। মনে মনে আপনার অঙ্কিত সেই পরলোকের মানচিত্র সেই আত্মার নিবাসভূমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। আপনি আধ্যাত্মিক শক্তির বলে আমার পূর্ব্বে সে রাজ্যে গিয়াছিলেন। আমার সে রাজ্যের পথ আপনি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।··· আমার মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধতন প্রদেশ পূর্ণ বিকসিত হইল। তখন সহস্রারের সেই সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র গহ্বর ভেদ করিয়া আমার জীবাত্মা বহির্গত হইল। জীবাত্মাই যথার্থ 'আমি' প্রকৃত মানব।··· মৃত্যুকালে আমি চিৎ হইয়া শুইয়াছিলাম। আমি ঘুমাইতেছিলাম, অথচ ঘুমাইতেছিলাম না। আমি যেন শরীরের ভিতর আছি, অথচ যেন দেহের বাহিরে। মনে হইতেছিল, যেন পৃথিবীতে নাই। তারপর নিদ্রা যেন আরও গাঢ় হইয়া আসিল, এবং আমার আমিত্ব যেন গলিয়া গিয়া একটা অগাধ অসীম সূক্ষ্ম ব্যোমের সাগরের ভিতর ডুবিয়া গেল।···

"আমার স্থূল মৃত শরীর আমার নিম্নে (বা পদতলে) পড়িয়া রহিয়াছে। আমার বন্ধুবান্ধব, চিকিৎসক প্রভৃতি তাহা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টারও কোন ত্রুটি হইতেছে না। আপনাদের গণনা ধরিলে আমি তখন সেই মৃতদেহের মস্তক হইতে দুই ফিটও দূরে ছিলাম না; তথাপি আমি অনন্তের জীব অনন্তে বাস করিতেছি।··· এ পৃথিবীর কোন বিষয়ই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। অনেক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আমার চারিধারে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা আমার জীবনের নূতন সঙ্গী।··· এ পৃথিবীর এক কেন্দ্রস্থিত আকাশ দিয়া আমরা এ পৃথ্বীমণ্ডল ছাড়াইয়া চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে অনেক রাজ্য, অনেক আতিবাহিক দেহীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

['জন্মান্তররহস্য' গ্রন্থের (সপ্তদশ সংস্করণ) ১৩২—১৪০ পৃষ্ঠায় উইল্‌সন সাহেবের প্রেতাত্মার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। উইল্‌সন সাহেবের মৃত্যু হয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে এবং তাঁহার প্রেতাত্মার প্রথম আবির্ভাব ঘটে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে।]

২। পরলোকের পত্র

[ডাক্তার এণ্ড্রু ডেভিস্‌-এর 'দি গ্রেট্ হারমোনিয়' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।]

জনৈক বিদেহী আত্মা নিজে দর্শন না দিয়া কাগজের উপর নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিয়া অভীষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে রাখিয়াছিলেন।

"বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আমিও একজন পৃথিবীর অধিবাসী ছিলাম।... গ্রীসে আমার বাস ছিল।... তাহার পর আমার শেষ পীড়া হইল। দুই চারি সপ্তাহ কাটিয়া গেল; পীড়ার উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল, যেন আমার ভয়ানক নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে। আমি মরণে ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। যতই চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ততই নিদ্রা গাঢ়তর হইতে লাগিল। শেষে বাসগৃহ, বন্ধুবান্ধব, বাহ্যজগৎ যেন চিরদিনের মত মুখ লুকাইয়া নিবিড় অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যাকালে আমার মৃত্যু হয়। তখন দুইটি ভিন্ন অন্য কোন আশা, অন্য কোন প্রার্থনা ছিল না। প্রথমটি—এট্‌লান্টিসে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ; দ্বিতীয়টি—মৃত্যুকালে দেবতার আশীর্ব্বাদপ্রাপ্তি। অনেকক্ষণ পরে আমার আমিত্ব জ্ঞান আবার ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক বর্দ্ধিত সুখ, অনেক বিশিষ্ট জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি আমার পার্থিব আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। তাহারা আমার কথা শুনিতে পায় না। যে স্থূল ইন্দ্রিয়ে তাহারা শুনিতে পায়, যে স্থূল বায়ু অবলম্বনে মনুষ্যের বাক্‌শক্তি পরিস্ফুট হয়, আমার সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। আমারও দেহ আছে, আমিও তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু তাহারা তাহা দেখিতে পাইতেছে না।... কাহার যেন সূক্ষ্ম সুরভি নিশ্বাসবায়ু আমার মুখে আসিতে লাগিল। আমি দেখিলাম—ঘনীভূত প্রীতি, ঘনীভূত ভালবাসা লইয়া অসংখ্য আধ্যাত্মিক পুরুষ আমার মুখের পানে চাহিয়া আছেন...।"

[এই প্রেতাত্মার সম্পূর্ণ পত্রখানার বঙ্গানুবাদ 'জন্মান্তররহস্য' গ্রন্থের ১৭ সংস্করণ) ১৪১—১৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।]

৩। সার্জ্জেণ্ট ডেভিসের প্রেতাত্মা

১৭৪৯ ইংরেজীর ২৮শে অক্টোবর গাইডিস্ রেজিমেণ্টের সার্জ্জেণ্ট আর্থার ডেভিস্ নিহত হন। তাঁহার নিকট অনেক অর্থ ও বহুমূল্য চেন অঙ্গুরীয়কাদি ছিল। সাধারণের ধারণা—কোন দস্যুদল ঐ অর্থলোভে ডেভিস্‌কে হত্যা করিয়াছে। পুলিশ অনেক অনুসন্ধানেও হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিল না। কিছুদিন এইভাবে কাটিয়া গেল। পাঁচ বৎসর পরে স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত ইন্‌ভার্ণা-নিবাসী ম্যাকফার্সন

নামক একজন কৃষক যুবক একদিন রাত্রে অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় তাহার শয়নকুটীরদ্বারে একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। ঐ মূর্ত্তিকে তাহার বন্ধু ফার্গুসন মনে করিয়া সে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল, এবং ঐ মূর্ত্তির নিকটে গমন করিল। ছায়ামূর্ত্তি বলিল— "আমি সার্জ্জেণ্ট ডেভিসের প্রেতাত্মা। আমাকে দুরাত্মারা হত্যা করিয়াছে এবং আমার দেহকঙ্কাল এখনও হিল্ অব্ খ্রাইস্ট নামক স্থানে আছে; তুমি উহা সমাধিস্থ করিও। প্রতিহিংসাবিষে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে। যদি সুবিধা বুঝ, তবে সেই হত্যাকারীদের নাম প্রকাশ করিয়া দিয়া যাহাতে তাহারা সাজা পাইতে পারে তাহা করিও।"·· পরদিন প্রাতঃকালে ম্যাক্‌ফার্সন তাহার বন্ধুর নিকট সমস্ত কথা বলিল। তাহার বন্ধু ফার্গুসন বলিলেন—"তাহার হত্যাকারী কে তাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?" ম্যাক্‌ফার্সন বলিলেন—"ভয়ে আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।" তখন উভয় বন্ধুতে প্রেত নির্দেশিত স্থানে গিয়া যথার্থই একটি নরকঙ্কাল দেখিতে পান এবং উহাকে সমাধিস্থ করেন।

কিছুকাল পরে আর একদিন ডেভিসের ছায়ামূর্ত্তি ম্যাক্‌ফার্সনের কুটীরদ্বারে আসিয়া দর্শন দেয়। সেদিন ম্যাক্‌ফার্সন অনেকটা সাহসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ছায়ামূর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাকে কে হত্যা করিয়াছিল?" ডেভিসের ছায়ামূর্ত্তি বলিল—"পর্ব্বতনিবাসী ডন্‌কান ও ম্যাক্‌ডোলাণ্ড আমাকে হত্যা করিয়াছে। তাহাদের উপর আমার দারুণ প্রতিহিংসা। তুমি দয়া করিয়া তাহাদিগকে পুলিশে ধরাইয়া দাও।" ডেভিস্ তৎপরদিবস ঐ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করে। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন এডিন্‌বরায় ডনকান্ ও ম্যাকডোলাণ্ড ধৃত হইয়া প্রধান ফৌজদারী আদালতে বিচারার্থ প্রেরিত হয়। পুলিশের অনুসন্ধানে ঐ আসামীগণের নিকট ডেভিসের কোন কোন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। ম্যাক্‌ফার্সন ও ফার্গুসন ব্যতীত ঐ মোকদ্দমায় ইজাবল মেকার্ডাই সাক্ষ্য দেয়; কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি হয় না। বিচারকগণ যুক্তি দেখাইলেন—"ডেভিস্ ইংরাজীতে কথা কহিত এবং ম্যাক্‌ফার্সন গলভাষায় কথা কহিতেছে ও ইংরেজী ভাষা জানে না; ঐ সাক্ষী কি প্রকারে ডেভিসের প্রেতাত্মার কথা বুঝিতে পারিল?" এই হেতুবাদের উপর নির্ভর করিয়াই বিচারকেরা আসামীদিগকে খালাস দিয়াছিলেন; কিন্তু প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন— প্রেতাত্মারা যে কোন ভাষায় কথা বলিবার সামর্থ্য রাখে।

—জন্মান্তর রহস্য; পৃষ্ঠা—১৪৯-১৫১

৪। ব্যারন্ হার্ডউইকের প্রেতাত্মা

ইংলণ্ডের উত্তরপ্রদেশে ডার্ব্বিশায়র। চেষ্টার ডার্ব্বিশায়র একটি সমৃদ্ধিশালী নগর। এই নগরে পুরাতন ও প্রসিদ্ধ হার্ডউইকহল অবস্থিত। ইহার অধিবাসিগণ বিস্তৃত জমিদারীর মালিক ও ইংলণ্ডের অন্যতম ব্যারনেট্। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে; হার্ডউইকহলের তখনকার অধিস্বামীর নাম স্যার রালফ হার্ডউইক। সুস্থদেহ যুবক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র। একটি পুত্র রাখিয়া ইঁহার প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে ইনি পুনরায় বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম রাল্‌ফ্ ইথলমুর। এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভেও একটি পুত্র জন্মে। উত্তরাধিকার আইন অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রই জমিদারীর মালিক হয়। লেডী হার্ডউইক তাই তাঁহার পুত্র ব্যারন্ হইবে না বুঝিয়া সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। জমিদারের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এস্ সিটন্, স্যার রাল্‌ফ সিটন্‌রূপে গদীতে বসিবেন এবং ঐ দিনেই তাঁহার বিবাহ হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি সম্ভ্রান্তবংশীয় পরমাসুন্দরী যুবতীকে বাড়ীতে আনিয়া রাখা হইয়াছে। এই যুবতীর নাম ফিলিসিয়া।

সিটন্ ও ফিলিসিয়া একদিন বিকালে যখন হাসিমুখে প্রেমালাপ করিতে করিতে বাগানে বেড়াইতেছিল, তখন গবাক্ষপথে তাহাদিগকে দেখিয়া লেডী হার্ডউইকের অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হয়। তিনি তাঁহার পুত্র ফিলিপ্‌কে উহা দেখাইয়া উত্তেজিত করেন এবং পরামর্শ দেন যে গোপনে সিটন্‌কে বধ করিয়া মৃতদেহ লুকাইয়া ফেলিতে পারিলে নির্দ্দিষ্ট দিনে ফিলিপ্‌ই জমিদারীর গদীতে বসিবে এবং ঐ অপ্সরাতুল্য সুন্দরী যুবতীটিও তাহার পত্নী হইবে। অতঃপর ফিলিপ্ দুইজন ইতালীদেশীয় ভৃত্যের দ্বারা ভ্রাতাকে গোপনে হত্যা করাইয়া বনমধ্যে সমাহিত করে এবং প্রমাণ লোপের উদ্দেশ্যে পরে সেই ভৃত্য দুইটিকেও বধ করতঃ তাহাদের মৃতদেহও অন্যত্র সমাহিত করে। এই সকল কার্য্য এত গোপনে সম্পাদিত হইয়াছিল যে কেহই জানিত না। নির্দ্দিষ্ট দিনে ফিলিপ্‌ই গদীকে বসিল এবং ফিলিসিয়ার সহিত তাহার বিবাহ হইল। যেদিন সিটনকে হত্যা করা হয়, সেইদিন রাত্রি হইতেই জমিদারবাড়ীতে ভৌতিক উপদ্রব আরম্ভ হয়। কিছুদিন পর যখন নূতন জমিদার ফিলিপ্ ও তাঁহার পত্নী ফিলিসিয়া অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন, তখন নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটে।

"একটি মৃগশাবককে দেখিতে পাইয়া ফিলিপ্ ও ফিলিসিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব চালাইয়া ছিলেন। একটু দূরে গিয়া পার্শ্বস্থিতা ফিলিসিয়ার দিকে চাহিয়া ফিলিপ

কি একটা সুখ-সোহাগের কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন — একজন অশ্বারোহী তাঁহাদের পাশে পাশে আসিতেছে। আরও স্পষ্টভাবে চাহিয়া দেখিলেন—এ অশ্বারোহী ও অশ্ব অন্য অশ্বারোহী বা অশ্বের মত নহে। এ অশ্বারোহী ও অশ্বের গতি আছে, শব্দ নাই ; অবয়ব আছে, কিন্তু তাহাতে পার্থিব পরমাণুর ঘন-সন্নিবেশ নাই। অশ্বারোহী ও অশ্ব উভয়েই যেন বাষ্পময় ছায়ামূর্ত্তি। ফিলিপ্ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার বেগবান অশ্বও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ফিলিসিয়াও রোমাঞ্চিত কলেবরে স্তব্ধনেত্রে সেই ছায়ামূর্ত্তির দিকে চাহিলেন। ছায়ামূর্ত্তি যুবতীর মুখের দিকে তীব্র তিরস্কার ও ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিল। সে মূর্ত্তি এস্ সিটনের। ফিলিপের অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল হইয়া লাফাইতে লাগিল। ফিলিপ্ ভয়ে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ফিলিসিয়া অশ্ব হইতে পড়িলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারও বদনে বিবর্ণ পাণ্ডুরেখা, বুকে ধড়ফড়ি এবং সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর কম্প দেখা দিল। ভৃত্যগণ তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। সকলেই স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া পড়িল।

কুকুরগুলি অস্বাভাবিকভাবে ডাকিতে ডাকিতে একটা স্থান খুঁড়িতে লাগিল। তখন অপরাপর ভদ্র পারিষদ্গণ খনিত্রদ্বারা সেই স্থান খুঁড়িয়া দেখিলেন। তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইল ; মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলেন যুবক এস্ সিটনের মৃতদেহ ঐ স্থানে সমাহিত রহিয়াছে। দেহের নানাস্থানে গভীর অস্ত্রক্ষত বিদ্যমান। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভগ্ন, কর্দ্দমাক্ত ও শোণিতসিক্ত। সকলেই বুঝিলেন—এস্ সিটন্ নিষ্ঠুরভাবে এই স্থানে নিহত হইয়াছেন। এই ঘটনার পর লেডী হার্ডউইক উন্মাদ হইয়া কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং বংশের অধঃপতন ঘটিল।"—জন্মান্তর রহস্য, পৃষ্ঠা—১৫১—১৫৬

৫। ডাক্তারের প্রেতাত্মা

বোষ্টন সহরের 'টিক্নর্ এণ্ড্ কোম্পানী' (Ticknor & Co.) কর্ত্তৃক ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'লাইট্ অন্ দি হিডেন্ ওয়ে' (Light on the Hidden Way) নামক গ্রন্থের ৭১তম পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"গত বৎসর কার্য্যানুরোধে আমাকে একটা বাড়ীর সম্মুখ দিয়া অনেকবার যাতায়াত করিতে হইত। আমি যতবার যাইতাম, ততবারই দেখিতাম—সেই বাড়ীর মৃত গৃহস্বামী কোন একটি গৃহে বসিয়া আছেন। জীবিতাবস্থায় গৃহস্বামী চিকিৎসা-ব্যবসা

করিতেন ; সুতরাং অনেক পীড়িত গৃহস্থই সাদরে ও সোৎসুকনেত্রে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। আমি ঐ চিকিৎসকের প্রেতাত্মার সহিত কথা কহিলাম। শুনিলাম—তিনি কিরূপ কষ্টে কালযাপন করিতেছেন। প্রেতাবস্থায় বহু সঙ্গীর সংসর্গসুখের সম্ভাবনা থাকিলেও তাঁহার তাহাতে শ্রদ্ধা নাই ; সুতরাং একরূপ নিঃসঙ্গে নির্জ্জনে দিনাতিপাত করাই তাঁহার দৈনন্দিন ভাগ্য। মনুষ্যজীবনের পুরাতন গৃহ ও পুরাতন অনুষঙ্গের ভিতর বিচরণ করিতে তাঁহার অত্যন্ত সুখবোধ হয়। চিকিৎসক বলিলেন—'আমার স্ত্রী মনে করেন—আমি কোন সুদূর স্বর্গে নন্দন-সুখে কালাতিপাত করিতেছি। আমার নিতান্ত কষ্ট। আমি তাহাকে বুঝাইতে পারি না যে, আমি দিবারাত্রি তাহারই পার্শ্বে বসিয়া আছি।' আমি (গ্রন্থকার) তাঁহাকে প্রেতজীবনের নিম্নস্তর অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধস্তরে উঠিতে অনুরোধ করিলাম। উত্তরে প্রেতাত্মা বলিল "উর্দ্ধস্তরে যাইবার আমার কোন প্রয়োজন নাই। উর্দ্ধস্তর-বাসীরা সকলে শারীরিক সুখদুঃখের অতীত ; সুতরাং তথায় চিকিৎসার বা চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই। উর্দ্ধস্তরে উঠিলে আমাকে একপ্রকার অলস ও নিরর্থক-ভাবে কালযাপন করিতে হইবে।"

—জন্মান্তর রহস্য ; পৃষ্ঠা ১৬১—১৬২

৬। রজকিনীর প্রেতাত্মা

বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার বিস্‌স তাঁহার 'এনাটমি অফ্ মিলানকলি (Anatomy of Melancholy) গ্রন্থে নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা হইতে তেতাল্লিশ মাইল দূরে টে-নদীর দক্ষিণতটে পুরাতন পার্থনগর। পার্থনগরের সেনানিবাসের সন্নিকটে দুইটি দুঃখিনী বাস করিত। তন্মধ্যে একের নাম আনি সিম্‌সন্ এবং অপরের নাম মালয়। মালয় রজকের কার্য্য করিত। উভয়েই দারিদ্র্যের কঠোর শাসনে নিপীড়িত এবং একত্র বসবাসের ফলে সখীত্বভাবাপন্ন। একদা মালয় সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইল। আনি তাহাকে বিশেষ যত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিল ; কিন্তু মালয় আরোগ্য লাভ করিল না। আনির শুশ্রূষা ও অশ্রুসিক্ত সম্ভাষা তাহাকে রাখিতে পারিল না ; মালয় তনুত্যাগ করিল। আনি সখী মালয়ের মৃত্যুতে বড়ই শোকগ্রস্তা হইয়াছিল। একদিন রাত্রিতে নিজ কাজকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া শয্যায় গা দিয়াছে, এমন সময় সে পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল

—মালয় দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে যে চাহিয়া দেখিল—মালয়ের সেই দেহ, সেই মুখ, সেই চক্ষু; তবে মুখখানা যেন বড় ম্লান। আনির হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মালয় কথা কহিল; বলিল—'আনি, ভয় করিও না। তোমাদের ভাষায় আমি মরিয়া গিয়াছি; কিন্তু আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি। কেবল একটা খোলস পরিত্যাগ করিয়াছি। সখি আনি! আমি বড় অশান্তিতে আছি। আমি কিছুতেই উর্দ্ধস্তরে উঠিতে পারিতেছি না। আমার তের আনা ঋণ আছে; এই ঋণের দায়েই আমার অধোগতি। তুমি কোন ধর্ম্মযাজকের নিকট গিয়া আমার এই দুঃখকাহিনী বলিলে অবশ্যই তিনি আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া আমার সদ্‌গতি করিবেন।'

ভয়ে, বিস্ময়ে আনির সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে কোন কথা কহিতে পারিল না। ছায়ামূর্ত্তিও অদৃশ্য হইল। সেই দিন হইতে প্রত্যহ রাত্রিতে মালয়ের প্রেতাত্মা আসিয়া আনির নিকট উপস্থিত হইত এবং ঋণ-পরিশোধের জন্য তাহাকে যে কোন ধর্ম্মযাজকের নিকট যাইতে অনুরোধ করিত। এই ব্যাপারে আনির নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। সে অনুসন্ধান করিয়া কোন ধর্ম্মযাজকেরও সাক্ষাৎ পাইল না।

এই সময়ে ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড চার্লস্ ম্যাকে (Rev. Charles Makey) পার্থসায়র মিশনের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া পার্থনগরে উপস্থিত হইলেন। সংবাদ পাইয়া আনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মালয়ের প্রেতাত্মা সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিল।......অনুসন্ধানে জানা গেল—এক মুদীর দোকানে মালয়ের কিছু দেনা আছে। ধর্ম্মযাজক মুদীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'এক, দুই পয়সা করিয়া জিনিষ নিয়াছে। দুই দিন সময় দিন, হিসাব করিয়া বলিব'। দুই দিন পরে সে জানাইল—মালয়ের তের আনা বাকী আছে। ধর্ম্মযাজক উহা দিয়া দিলেন। সেই দিন হইতে আনি আর মালয়ের প্রেতাত্মার দর্শন পায় নাই।"

—জন্মান্তর রহস্য; পৃষ্ঠা ১৬৩—১৬৫

৭। কৃষকপত্নীর প্রেতাত্মা

"ডার্‌হামের চেষ্টারলী ষ্ট্রীটে ওয়াকার নামে এক কৃষক বাস করিত। পত্নীবিয়োগ হইলে কিয়দ্দিবস গৃহ শূন্য থাকে; অতঃপর এন্ নাম্নী দূরসম্পর্কীয়া এক রমণী আসিয়া তাহার গৃহকর্ত্রীরূপে সংসারে প্রবিষ্ট হয় ও কিছুদিন উভয়ে শান্তিতে বসবাস করে।

কিয়দ্দিবস পরে প্রভু ও দাসীতে অযথা বচসা হয়। তখন ওয়াকার একান্ত অধৈর্য্য ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সার্প নামক এক ব্যক্তির সহিত কোন কার্য্যের ছলে এন্‌কে দূরে পাঠাইয়া দিল এবং সার্পকে বলিল—'এন্‌কে যেন আমার আর দেখিতে না হয়।' ইহার পর এন্‌কে আর কখনও কেহ দেখে নাই।

গ্রেহাম নামক একজন ভদ্রলোক ওয়াকারের বাড়ীর প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বাস করিতেন। প্রাগুক্ত ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে একদা রাত্রিতে গ্রেহাম পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন—একজন স্ত্রীলোক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। গ্রেহাম স্ত্রীলোকটিকে ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রমণী উত্তর করিল—'আমি এনের প্রেতাত্মা। ওয়াকারের পরামর্শ মত সার্প আমাকে খনিত্রদ্বারা হত্যা করিয়াছে। আমার কঙ্কাল এখনও কয়লার খনিতে প্রোথিত আছে, আর আমাকে হত্যা করিবার সময় যে রুধিরধারা নির্গত হইয়া তাহার বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিয়াছিল, তাহা ঐ কয়লার খাতের নিকটস্থ সেতুর নিম্নে রাখিয়াছে। তুমি এই হত্যাকাহিনী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট প্রকাশ করিয়া এবং ঐ সকল বস্ত্রাদি তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া আমার উপকার কর। প্রতিহিংসাবিষে আমি জ্বলিয়া মরিতেছি।'

পরদিন গ্রেহাম ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করে; কিন্তু প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ভূতের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহেন না। শেষে নির্দ্দেশিত স্থানদ্বয়ে ঐ সকল দ্রব্যাদি পাইয়া আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করেন। পরে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ডার্‌হামের বিচারালয়ে ঐ মোকদ্দমার বিচার হয় এবং আসামীদ্বয় দোষ স্বীকার করায় চরম দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

—জন্মান্তর রহস্য; পৃষ্ঠা—২৪০—২৪২

৮। আত্মঘাতিনীর প্রেতাত্মা

জনৈক শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে নাস্তিকে পরিণত হন। তিনি শিক্ষকতা করিয়া মাসে ৪০ টাকা বেতন পাইতেন। সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং ভাল ভাল ইংরাজী কবিতার বাংলা পদ্যানুবাদ করিয়া কাগজে ছাপিতে দিতেন। ক্রমে ছেলে-মেয়ে জন্মিবার ফলে তাঁহার সংসারের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি বেশী বেতনের চাকুরী খুঁজিতে লাগিলেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া তিনি

বঙ্গদেশের এক রাজাবাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পদের জন্য আবেদন করেন। উহাতে বেতন ছিল ৮০ টাকা। একজন বিশিষ্ট লোকের সুপারিশে তাঁহার চাকুরী হয় এবং কলিকাতা হইতে গাড়ী চড়িয়া নূতন কর্ম্মে যোগদান করিতে যান। নবাগত কর্ম্মচারীর যাহাতে অসুবিধা না হয়, এই উদ্দেশ্যে রাজাবাহাদুর গাড়ীসহ ষ্টেশনে লোক পাঠান। রাজবাড়ীর সেই গাড়ীতে চড়িয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোক নির্ব্বিঘ্নে প্রাসাদে উপস্থিত হন।

রাজাবাহাদুর অত্যন্ত সুবিবেচক ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি প্রাসাদে উপস্থিত হইলে রাজাবাহাদুর পার্শ্বে উপবিষ্ট দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ভদ্রলোককে কোথায় থাকিবার স্থান দেওয়া যায়?" দেওয়ান বলিলেন—"ইনি তো একা লোক; প্রাসাদেরই পার্শ্বসংলগ্ন একটি কক্ষে থাকিতে পারেন।" রাজাবাহাদুর বলিলেন—"তাহা হয় না। ইনি কবিতা-রসিক এবং অধ্যয়নপ্রিয়। নির্জ্জন স্থান ইঁহার আবশ্যক।" তখন দেওয়ান বলিলেন—"তাহা হইলে দীঘির পাড়ের সেই খালি বাড়ীটায় দিলে কেমন হয়?" রাজাবাহাদুর—"ইনি নূতন লোক; সেই ভূতের বাড়ীতে কি করিয়া থাকিবেন?" 'ভূতের বাড়ী' কথাটা শুনিয়াই নবাগত ভদ্রলোকটি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"আমি ভূত বিশ্বাস করি না। সেই বাড়ীতেই আমাকে থাকিতে দিন।" অগত্যা সেই বাড়ীতেই তাঁহাকে থাকিতে দেওয়া হইল। সেই ভূতের বাড়ীতে রাত্রিবাস করিয়া ভদ্রলোকটি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাষায় তাহা নিম্নপ্রকার—

"রাত্রি নয়টার সময় আহারাদি করিয়া একজন ভৃত্যের সঙ্গে বাড়ীতে গমন করিলাম। বাড়ীটি বাস্তবিকই অতিশয় মনোরম। শুনিলাম—কোন একটি ভদ্রলোক পশ্চিমবাসের জন্য এখানে আসিয়া বাড়ীটি প্রস্তুত করেন; কিন্তু তাঁহার একটি কন্যা এই বাড়ীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়া তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছায় এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যান। বাড়ীতে একটা লোক মরিলেই আমাদের দেশের লোকে ভাবে ভূত—মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই বাড়ীতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। সুন্দর বাড়ী। চারিদিকে বৃক্ষ হইতে কুসুমগন্ধ আসিয়া সমস্ত বাড়ীখানিকে মুগ্ধ করিতেছে।......আমি তাহার মধ্যস্থলে একটি গৃহে আসিয়া উপবেশন করিলাম। সেখানে টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সুসজ্জিত ও সংরক্ষিত ছিল। টেবিলের উপরে একটি আলো জ্বলিতেছিল। ট্রাঙ্ক খুলিয়া টেনিসন বাহির করিয়া সেখানে বসিয়া পড়িতে লাগিলাম।..... কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই; সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি—রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে। তখন লোকের ভৌতিক বিশ্বাসের কথা মনে হইয়া হাসি পাইল। আবার পাঠে মনঃসংযোগ করিলাম।

সহসা এ কি! একটা মানুষ যেন চম্ চম্ করিয়া আমার টেবিলের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। অধীত গ্রন্থে মনঃসংযোগ ছিল বলিয়া ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই।······আবার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাইতেছি—ঝনাৎ করিয়া আমার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠের দরজা খুলিয়া গেল। এ কি! তবে কি কেহ এই বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিয়া লোককে ভয় দেখায়? সাহসে ভর করিয়া উঠিলাম। সেই উন্মুক্ত দরজা দিয়া পার্শ্বস্থ গৃহে প্রবেশ করিয়া আলোক দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম; কিন্তু কোথাও কেহ নাই। আশে পাশে চারিদিকে খুঁজিলাম; কোথাও কেহ নাই। যেখানে বসিয়াছিলাম, ফিরিয়া সেইখানে আসিলাম। এ কি! একটি ষোড়শী সুন্দরী স্ত্রীলোক, আমি যে চেয়ারে বসিয়াছিলাম, তাহারই উপর বসিয়া আছে। আসিতেই যে উঠিয়া দাঁড়াইল। চক্ষুর পলক ফেলিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। আমারও কপাল ঘামিতে আরম্ভ করিল। আমি সেই চেয়ারখানিতে আর সাহস করিয়া বসিতে পারিলাম না। তাহার অপর দিকের চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—তবে কি সত্যই ভূত আছে? এ কি ভূত? ভূত না হইলে এত শীঘ্র সেই রমণীমূর্ত্তি কোথায় যাইবে?......কি ভয়ঙ্কর! ঠিক আমারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—বোধ হয় পাঁচ হাত তফাতে হইবে, সেই ষোড়শী রমণীমূর্ত্তি। মূর্ত্তি-খানিতে বিষণ্ণতার ছবি অঙ্কিত। মূর্ত্তি আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—

'তুমি ভূত বিশ্বাস কর না,—তোমার ভুল। কিন্তু তোমার ভুলে আমার উপকার হইল। তোমার প্রাণে সাহস আছে বলিয়াই আমি আজ আমার প্রাণের কথা তোমাকে বলিতে পারিতেছি। এই কথা বলিব বলিয়া অনেকদিন ধরিয়া এই বাড়ীতে আছি। আমি কিন্তু বড় যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছি। এত জ্বালা মরজগতে নাই। এ বাড়ী আমার বাপের ছিল। আমি বাপের আদরের কন্যা ছিলাম। কিন্তু তখন জানিতাম না; তাই পাপে মজিয়াছিলাম। সেই পাপের ফলে আমার গর্ভ হয়। আমি তার পরে ঔষধ সেবন করিয়া সেই গর্ভ বিনষ্ট করি। বিধিলিপির অখণ্ডনীয় প্রতাপে এ হতভাগিনীরও তাহাতেই জীবনলীলার সাঙ্গ হয়। হায়! স্বপ্নেও জানিতাম না যে, ভ্রূণহত্যাকারিণীর পরিণাম এইরূপ।...হায়! রক্তপিণ্ড সন্তান শেষে হিংস্র জন্তুরূপ ধারণ করিয়া আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে। প্রাণ যে যায়। পাপিনী, কুলকলঙ্কিনী আমি যথেষ্ট ফল ভোগ করিতেছি। আমি যেরূপ ভ্রূণ অবস্থায়

আপন সন্তান হনন করিয়াছি, সেও আমাকে তদ্রূপ যন্ত্রণা দিতেছে। উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইতেছে। নাড়ী চিবাইয়া, বুকের শোণিত পান করিয়া যথেষ্ট ফল দিতেছে। হায়! এখন উপায় কি? এ যন্ত্রণা কত দিনে ঘুচিবে? এ ভীষণ যাতনার হাত হইতে কতদিনে অব্যাহতি পাইব?'

আমি স্তব্ধনেত্রে দেখিতে পাইলাম, এই কথা বলিতে বলিতে সেই রমণী তাহার বক্ষোদেশ হইতে মৃত্যুবিবর্ণীকৃত একটি ক্ষুদ্র শিশু বাহির করিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিল। তখন আমিও 'কানাই' বলিয়া এক চীৎকার করতঃ মূর্চ্ছিতভাবে মাটিতে ঢলিয়া পড়িলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখিলাম—তখনও ভাল করিয়া ফর্সা হয় নাই।··· আমি তখন রাজবাড়ীতে আনীত হইয়াছিলাম। শুনিলাম, আমি যখন চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম, তখনই রাজনিয়োজিত লোকজন গিয়া আমাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। তিনি পূর্ব্বেই আমার এ দশা হইবে জানিয়া কয়েকজন লোককে গৃহপার্শ্বেই থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

— পৃষ্ঠা—২৪৬—২৫০

৯। নির্য্যাতিতা যুবতীর প্রেতাত্মা

বিলাতের প্রসিদ্ধ ডাক্তার এডওয়ার্ড বিন্‌স্ এম্-ডি তাঁহার 'এনাটমি অব্ স্লিপ' (**Anatomy of Sleep**) নামক গ্রন্থে নিম্নের ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছেন।

জ্যামাইকা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহা ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপমালার কণ্ঠবিচ্যুত এবং কারিব সাগরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা স্পেনের অধিকারে ছিল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন ইহা ব্রিটিশের অধিকারে। ঐ দ্বীপের এক পল্লীগ্রামে ডন্‌কান নাম্নী এক যুবতী বাস করিত। একদা রাত্রিকালে সে গৃহ হইতে অদৃশ্য হয়। দিনকয়েক পরে পুলিশের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে বড় রাস্তার অদূরে একটা নিভৃত স্থানে ডন্‌কানের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। শব পরীক্ষা করিয়া জানা গেল—একাধিক বলবান্ ব্যক্তিকর্তৃক পুনঃ পুনঃ পাশবিক অত্যাচারের ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও আসামীকে ধরিতে পারিল না। কিছুদিন পরে পেণ্ড্রিল ও চিতি নামে দুইটি নিগার যুবক বিভিন্ন ক্ষুদ্র অপরাধে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হয়। পেণ্ড্রিলকে রাখা হইল কিংষ্টনের সংশোধনী কারাগারে আর চিতিকে ফেলমাউথের কারাগারে। উভয় স্থানের ব্যবধান ৮০ মাইল।

"সহসা একদিন রাত্রিতে ৮০ মাইল দূরে উভয়ে কারাগারে থাকিয়া পেণ্ড্রিল ও চিতি একই সময়ে একই কথা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কাহাকেও যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়া, কাহার ভীষণ মূর্ত্তি যেন সম্মুখে দেখিয়া তাহারা কথা কহিয়াছিল। উভয়েই বলিয়াছিল 'ডন্‌কান্, তুমি ডন্‌কান্। ক্ষমা কর, অব্যাহতি দাও, রক্ষা কর। তুমি দেবতা হইয়াছ; আমি সেই পশুই আছি। ক্ষমা কর, রক্ষা কর, তোমার অনলের হাতে আমাকে ধরিও না।'

ক্রমাগত কয়েকরাত্রি ধরিয়া প্রতি রাত্রিতে এইরূপ ঘটিতে থাকিলে ক্রমে ইহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনা হয়। পুলিশেও সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশের জেরায় উভয় ব্যক্তি স্বীকার করে যে, তাহারাই অত্যাচার করিয়া ডনকানের মৃত্যু ঘটাইয়াছিল। বিচারে উভয়ের কঠোর শাস্তি হয়।

--পৃষ্ঠা—২৬১—২৬৩

১০। ভিক্ষুকের প্রেতাত্মা

রুশ সাম্রাজ্যের চতুর্থ নগরী ওডেসা (Odessa) শ্যামসাগরের তটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালার উপর অবস্থিত। এই নগরীতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

মাইকেল নামে এক অন্ধ বৃদ্ধ ভিক্ষা করিত। একদিন একটি ১০ বৎসরের ভিখারিণী মেয়ে অন্নাভাবে ও শীতে মরিয়া যাইতেছে শুনিয়া মাইকেল তাহাকে আশ্রয় দেয়। অতঃপর দুইজনে একসঙ্গে ভিক্ষায় বাহির হইত। ভিখারিণী বালিকা মাইকেলকে হাত ধরিয়া দূরে লইয়া যাইত এবং ভিক্ষাও ভাল পাইত। এই ভাবে পাঁচ বৎসর অতীত হইলে একদা মাইকেলের অসুস্থতা হেতু বালিকা একাকিনী ভিক্ষা করিতে গেল এবং এক বাড়ীতে গেলে উহারা তাহাকে চুরির অপবাদ দিয়া পুলিশে দিল। বালিকার ঝুলিতে চোরাই মালও পাওয়া গেল। পুলিশের সন্দেহ হয়, সম্ভবতঃ মাইকেলও চোর। তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তাহার বাড়ীতে বা অন্য কোথাও তাহাকে পাওয়া যায় না। বালিকাকে বিচারের জন্য আদালতে আনিলে হাকিম তাহার নিকট হইতে মাইকেলের সংবাদ জানিতে চেষ্টা করেন। হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে বালিকা বলে যে, মাইকেল আর ইহজগতে নাই। বালিকাকে ধরিয়া আনিবার এক ঘণ্টা পরেই তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছে। বালিকা তখন হাজতে, অতএব হাকিম তাহার এই কথা বিশ্বাস করেন না এবং হত্যাকারীর নাম জানিতে চাহেন। বালিকা বলে—নাম এখন বলিতে পারিবে না; পরদিন বলিতে পারিবে। সে আরও জানায় যে ঐ দিন রাত্রিতে মাইকেলের

প্রেতাত্মা আসিয়া তাহার কাছে হত্যাকারীর নামও বলিয়া যাইবেন বলিয়াছেন। বালিকাকে কড়া পাহারায় রাখা হয়।

পরদিন হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়—ক্যাথারিন্ নাম্নী একটি স্ত্রীলোক এবং ল্যাক নামক একটি পুরুষ মাইকেলকে ৮ বার ছুরিকাঘাত করিয়া হত্যা করতঃ পয়ঃপ্রণালীতে তাহার শব ফেলিয়া দিয়াছে। তাহার চক্ষু দুইটিও ইহারাই নষ্ট করিয়াছিল। ক্যাথারিন্ মাইকেলের বিবাহিতা স্ত্রী ছিল। সে পরপুরুষ ল্যাকের সঙ্গে পলাইয়া এই সহরে আসে। ক্রমে সংবাদ পাইয়া মাইকেলও এখানে আসিয়া বাস করিতে থাকে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে থাকে। ইহা বুঝিতে পারিয়া ল্যাক জ্বলন্ত লৌহশলাকা দ্বারা তাহার চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট করে। সেদিন মাইকেল তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা বালিকাকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং কিছু বলিয়া বাকীটুকু রাত্রিতে বলিবে বলিয়াছিল। ক্যাথারিন্ আড়ালে থাকিয়া ইহা শুনিতে পায় এবং ইহারই ফলে বালিকা তাহার বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গেলে তাহার ঝুলিতে একটি পাত্র রাখিয়া চোর অপবাদ দিয়া পুলিশে দেয় এবং পরে মাইকেলকে বধ করে।

মাইকেলের প্রেতাত্মা আসিয়া পরে সমুদয় কথা হাজতে বালিকাকে বলিয়া যায়। পুলিশ ক্যাথারিন্ ও ল্যাককে গ্রেপ্তার করে এবং চাপে পড়িয়া তাহারা অপরাধ স্বীকার করে। প্রমাণে জানা যায়—ক্যাথারিন্ যথার্থ ই মাইকেলের বিবাহিতা পত্নী ছিল। পয়ঃপ্রণালীতে মাইকেলের মৃতদেহও পাওয়া যায় এবং অপরাধীদের শাস্তি হয়। রুশদেশের ড্রিষ্টার (Drister) নামক নদী ওডেসা নগর হইতে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই নদী হইতে একটি পয়ঃপ্রণালীদ্বারা ওডেসা নগরীতে জল আনয়ন করা হয় এবং ঐ জলই ওডেসাবাসিগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই পয়ঃপ্রণালীতেই মাইকেলের মৃতদেহ পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা—২৭৪—২৮৪

১১। ছুরিকাশ্রিত প্রেতাত্মা

বিখ্যাত 'থিওসোফিক্যাল রিভিউ' (Theosophical Review ; Vol. XXII ; পৃষ্ঠা—১৮১) পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নিম্নের ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে।

"আমার একজন শিক্ষিত বন্ধু কোন উপায়ে একখানি ছুরিকা প্রাপ্ত হন। ছুরিকাখানি হাতে করিলেই অদম্য স্ত্রীহত্যা-লালসা মনোমধ্যে জাগরূক হইত। তিনি কিছুতেই এই লালসাকে দমন করিতে পারিতেন না। যখন ছুরিকাখানি হাত হইতে

ফেলিয়া দেওয়া হইত, তখনই সে বাসনার নিবৃত্তি হইত। তখন তিনি বিশেষভাবে ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে অবগত হওয়া যায় যে, অন্ততঃ দুইটি স্ত্রীলোক এই ছুরিকাঘাতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। বন্ধুর নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি একদিন ঐ ছুরিকাখানি হাতে করিয়া বসিলাম। প্রথমে আমার মনে বাস্তবিকই স্ত্রীহত্যার বাসনা উদিত হইল এবং তাহার অল্পক্ষণ পরেই আমার মনে হইতে লাগিল—কে যেন আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি জোর করিয়া বসিয়া রহিলাম। শেষ ফল কি জানিবার জন্য ছুরিকাও পরিত্যাগ করিলাম না এবং উঠিয়াও গেলাম না। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম—একজন পাঠান আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঠানের মুখ ভ্রূভঙ্গীপূর্ণ, ক্রুদ্ধ ও বিকট। দেখিলে মনে হয়, আমাকে টলাইতে পারে নাই বলিয়া বিরক্তিপূর্ণ। ছায়ামূর্ত্তি আমার অন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। আমিও যথাসাধ্য শক্তিসঞ্চয় করিয়া অটল হইয়া বসিয়া রহিলাম। চিৎ-শক্তির ঊর্দ্ধস্তরে অধিরোহণ করিয়া দেখিলাম—পাঠানের স্ত্রী অপর পুরুষের সহিত পলাইয়া যাইতেছে। কামিনী উপপতির গলদেশে বাহুলতা বেষ্টন করিয়া ঝুলিয়া পড়িল। অমনি পশ্চাৎ হইতে সেই পাঠান আসিয়া ছুরিকাঘাতে রমণীর প্রেমপ্রীতি ও জীবনগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সেইদিন হইতে পাঠান জগতের সমস্ত স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার শপথ করিয়াছে। অতঃপর সে সেই ছুরিকা-ঘাতে আপন শ্যালিকা ও অন্য একজন স্ত্রীলোককে হত্যা করে। অবশেষে আপনিও অপরের হস্তে নিহত হয়। মৃত্যুর পরক্ষণ হইতেই পাঠানের আত্মা এই ছুরিকাগ্রে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সেইদিন হইতে এই ছুরিকা যাহার হস্তে আসে, তাহারই নারীবধে অদম্য স্পৃহা জাগরূক হয়। আমাকে অটল দেখিয়া পাঠান এক্ষেত্রে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। ছুরিকাখানি আমি আমার একজন ভারতবর্ষীয় বন্ধুর হস্তে অর্পণ করি। তিনি পাঠানের প্রেতাত্মাকে ঊর্দ্ধ-জীবনলাভের উপায় দেখাইয়া দেন। তৎপরে ভগ্ন ছুরিকা অবশ্যই ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়াছে।”—পৃষ্ঠা—১৪৮-১৪৯।

১২। পাদ্রীভূত

পশ্চিমদেশে একদা এক পাদ্রী শিকারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এমন সময় কৃষ্ণপরিচ্ছদে আবৃতা একটি সুন্দরী যুবতী আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা কাগজের

মোড়ক দিল। যুবতীটি কোন সম্ভ্রান্তবংশে জাতা এবং পাদ্রীর পরিচিতা। তিনি কোন অপরাধ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং পাদ্রীর সাহায্যে সেই পাপ দূর করিবেন বলিয়াই এই পত্রখানা দিয়াছেন। তাড়াতাড়ির সময় পাদ্রী একখানা পুস্তকের ভিতর চিঠিখানি রাখিয়া বহিখানা কুলুঙ্গীতে রাখিলেন এবং শিকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া উহা পড়িবেন ভাবিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। ঘটনাচক্রে শিকারেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ইহার পর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে; পাদ্রীর কথা কাহারও স্মরণ নাই। বাড়ী হস্তান্তরিত হইয়া এক ধনী যুবতীর অধিকারে আসিয়াছে এবং তিনিও এই বাড়ীতে বাস করিতেছেন। একদা এক উৎসবে এই যুবতী তাঁহার বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। জনৈক নিমন্ত্রিত বন্ধু আসিয়া পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া দেখেন—এক অপরিচিত পাদ্রী বসিয়া বহি পড়িতেছেন। বাড়ীর ভিতরে গিয়া গৃহস্বামিনীকে তিনি এই পাদ্রীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গৃহস্বামিনী বলিলেন—"এ পাদ্রী কি তোমাকেও দর্শন দান করিয়াছেন? উনি তো আর কাহাকেও দর্শন দেন না। তবে আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই দর্শন দিয়া থাকেন। ইনি জীবিত ব্যক্তি নহেন; পরলোকগত আত্মিক। তুমি এক কাজ করিতে পার। উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আস—উনি কে এবং কেনই বা আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে আগমন করেন?"

ভূতের নাম শুনিয়া ভদ্রলোকটি ভয় পাইলেন। একা যাইতে সাহস না পাইয়া একটি ভৃত্যকে সঙ্গে লইলেন। ভৃত্য বাহিরে দাঁড়াইল এবং তিনি ভয়ে ভয়ে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পাদ্রীকে একই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া উল্লিখিত প্রকার প্রশ্ন করিলেন। ভদ্রলোকটির প্রশ্ন শুনিয়া পাদ্রীসাহেবের ছায়ামূর্ত্তি ফিরিয়া বসিয়া প্রশান্তস্বরে বলিল—"তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি; তুমি সুখে থাক। আমি বহুকাল ধরিয়া এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিতেছি। আমাকে কিছু শুধাইবে বলিয়া কত লোককে দর্শন দান করিলাম কিন্তু কেহই কোনদিন আমাকে কোন কথা শুধায় নাই। কাজেই আমারও যন্ত্রণার অবসান হয় নাই। আজ যে তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাতে বোধ হইতেছে—আমার কর্ম্মভোগ শেষ হইয়া আসিয়াছে।

এই বাড়ী আমারই ছিল। বহুদিন হইল আমার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু একটি সামান্য জিনিষের প্রবল আকর্ষণে আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছি না। ঐ জিনিষটি একটি কাগজ। উহা আমাকে—নং ষ্ট্রীটের অমুক স্ত্রীলোক প্রদান করিয়াছেন। আমি চারি নং মহলের দক্ষিণদ্বারী কামরায় অলিন্দের চোর

কুলুঙ্গীতে উহা একখানা পুস্তকের মধ্যে পুরিয়া আটকাইয়া রাখিয়া শিকার করিতে গিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইখানেই আমার মৃত্যু হয়; কিন্তু মৃত্যুকালেও উহার কথা আমি ভুলিতে পারি নাই। কাগজখানি ঐখানে রাখিয়া মরিলাম; যদি কেহ দেখে, তবে বড়ই অন্যায় হইবে—ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ কাগজই আমার কাল হইল। আমি এই দীর্ঘদিন ধরিয়া উহার আকর্ষণে আকৃষ্ট ও পৃথিবীতলে আবদ্ধ থাকিয়া বহু যাতনা ভোগ করিতেছি। এই বাড়ীর অধিকারিণী অলিন্দে যে কৌশলময় কুলুঙ্গী আছে তাহা না জানিতে পারিয়া গৃহসংস্কার সময়ে উহাতে চূণবালির কাজ করিয়া দেওয়ালের সঙ্গে সমান করিয়া ফেলিয়াছেন; কিন্তু উহার একস্থানে ফাটল ধরিয়া আছে। তুমি এখনই তথায় গমনপূর্ব্বক শাবল দিয়া খুঁড়িয়া ফেল; তাহা হইলে ঐ পুস্তক প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমার অনুরোধ—কদাচ উহা খুলিয়া দেখিও না। পুস্তকখানি সহ তখনই অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিবে; তাহা হইলে আমি উদ্ধার পাইতে পারি।"

ভদ্রলোকটি গৃহস্বামিনীকে উল্লিখিত কথা বলিলে তখনই সর্ব্বসমক্ষে দেওয়ালের নির্দ্দিষ্ট স্থান ভাঙ্গিয়া কুলুঙ্গী এবং তাহার ভিতর পুস্তক পাওয়া গেল। প্রেতাত্মার নির্দ্দেশমত তখনই সর্ব্বসমক্ষে অগ্নি প্রদান করিয়া পুস্তকখানি উহাতে ভস্ম করা হইল। ইহার পর আর কেহ পাদ্রীভূতকে দেখিতে পায় নাই। পৃষ্ঠা—২০৫-২১০

২৩। ভূতের দেওয়া ঔষধ

আয়ুর্ব্বেদার্থচন্দ্রিকা নামক সুবৃহৎ আয়ুর্ব্বেদ-অভিধান পুস্তকের রচয়িতা সুপণ্ডিত ভাজনঘাট-নিবাসী কবিরাজ ৺শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত মহাশয় নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছেন।

কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র তরুণ রক্তামাশয়রোগে মারা যায়। উক্ত কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিতে পারেন নাই। দিন কয়েক পরে উক্ত বালকের ছোট বোনও ঐ রোগে আক্রান্ত হয় এবং কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা এক্ষেত্রেও বিফল হইতে থাকে। একদিন বালিকাটিকে দেখিবার জন্য কবিরাজ মহাশয় অশ্বারোহণে ঐ গ্রামে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যান। ফিরিবার পথে গ্রামান্তরে আরও দুইটি রোগী দেখিয়া আসিবার কথা। হঠাৎ সহিস্ আসিয়া জানাইল—দড়ি ছিঁড়িয়া ঘোড়া চলিয়া গিয়াছে। ঘোড়ার খোঁজে সহিস্‌কে নিজ গ্রামের দিকে পাঠাইয়া কবিরাজ মহাশয় বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিছুদূর গিয়া দেখেন—ঘোড়াটি বিপরীত দিক্ হইতে দৌড়িয়া

আসিতেছে। সে এদিক্-ওদিক্ যাইবার চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু কেহ যেন তাড়াইয়া তাহাকে এই পথেই লইয়া আসিতেছে। ঘোড়াটি নিকটবর্ত্তী হইলে অশরীরী বাক উচ্চারিত হইল—"কবিরাজ মহাশয় ! আশ্চর্য্য হইতেছেন ? আমি বিপিন। আপনার ঘোড়াটা চলিয়া যাইতেছিল দেখিয়া এবং চলিয়া গেলে আপনার কষ্ট হইবে ভাবিয়া উহাকে তাড়াইয়া আনিয়াছি।· ·"

কবিরাজ মহাশয়কে বিস্মিত দেখিয়া বিপিনের প্রেতাত্মা আবার বলিল—"কবিরাজ মহাশয় ! ভয় করিবেন না। আমি আপনার রোগী বিপিন। আমাকে কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনি রক্তামাশয় রোগের জন্য চিকিৎসা করিয়াছিলেন ; কিন্তু বাঁচাইতে পারেন নাই। আপনাদের হিসাবে আমি মরিয়া গিয়াছি। কিন্তু মানুষ মরে না ; দেহ পরিত্যাগ করে। আমার ভগিনী শৈলকে চিকিৎসা করিবার জন্য আবার আসিয়াছেন ; কিন্তু রোগের উপশম হইতেছে না। ছেলেমানুষ বড় কষ্ট পাইতেছে। তখন তাহার রোগযন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখখানা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু কি করিব ; আমি তো আর সেরূপভাবে কিছুই করিতে পারিব না। আপনাকে আমি একটা ঔষধের নাম বলিয়া দিতেছি। ইহার দুইমাত্রা সেবন করিলেই রোগ আরোগ্য হইবে। —পাতার রস ছাগলের দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিবেন।"

স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরেই বিপিনের প্রেতাত্মা এই কথাগুলি বলিয়াছিল। প্রেতাত্মার নির্দ্দেশিত ঔষধ দিয়াই কবিরাজ মেয়েটিকে সুস্থ করিয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে ছেলেটির প্রেতাত্মা বাড়ীর লেবুগাছে আসিয়া মাতাপিতার সম্মুখে কবিরাজ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল। পৃষ্ঠা—২১৭—২১৮

১৪। ভূতের চেয়ার

১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস। উইটেনবার্গ সহরের এক পান্থশালায় রাত্রিতে শীতে আড়ষ্ট হইয়া এক ধনী অশ্বারোহী আসিয়া উঠিলেন। আগন্তুকের নাম মিঃ সিম্‌সন। হোটেলের মালিক মিঃ হারম্যান তাঁহাকে সুরা ও খাদ্যাদি দিয়া সুস্থ করিলেন এবং তাঁহার ঘোড়াকেও খাদ্যাদি দেওয়া হইল। হোটেলে স্থানাভাবহেতু দশ নম্বর ঘরেই সিম্‌সন থাকিতে চাহিলেন। ঐ ঘরে ভৌতিক উপদ্রব আছে বলিয়া হোটেলের মালিক মিঃ সিম্‌সনকে ঐ ঘরে থাকিবার জন্য দিতে চান নাই ; কিন্তু মিঃ সিম্‌সন ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া প্রায় জোর করিয়াই ঐ ঘরে থাকিতে গেলেন।

হোটেলের অধিবাসীরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে মিঃ সিম্‌সনেরও চক্ষে ঘুম

আসিল ; কিন্তু হঠাৎ ঘরের চেয়ারটি হইতে জোরে খট্‌খট্‌ শব্দ হইতে থাকায় তাঁহার নিদ্রার আবেশ ভাঙ্গিয়া গেল। মিঃ সিম্‌সন ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেই চেয়ার হইতে ঐ প্রকার খট্‌খট্‌ শব্দ হইতে থাকে। বেশ কয়েকবার এইরূপ ঘটিবার পর মিঃ সিম্‌সন প্রশ্ন করিলেন "তুমি কে? কেন বারবার এইরূপ শব্দ করিতেছ? তোমার কিছু বলিবার আছে কি?" তখন চেয়ার হইতে মনুষ্য কণ্ঠে উত্তর হইল—

"আমি একজন ধনবান্ ইহুদী। আমি একদা এই পান্থনিবাসে আশ্রয় লই। হারম্যান আমাকে হত্যা করিয়া আমার দলিলপত্র লইয়া উহা চারি নম্বর লৌহসিন্দুকে রাখিয়াছে। এই দলিলগুলির জন্যই আমি আবদ্ধ আছি। আমার অনেক টাকা আছে। টাকার দলিলপত্র আমার নিকট ছিল। ঐগুলি লইবার জন্যই হারম্যান আমাকে হত্যা করে। · এই চেয়ারে আমি বসিয়াছিলাম। বসা অবস্থায়ই আমাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। হারম্যান চেয়ারখানাকে কতদিন ফেলিয়া দিয়াছে; আমি আবার লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে সিম্‌সন! আমার একটা অনুরোধ রাখ। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে এই সংবাদ জানাও। সিন্দুকে আমার দলিলপত্র সমস্ত পাইবে। আর এই হোটেলের ভিতর ফলের বাগানের মধ্যে আমার মৃতদেহ একটা লিচু গাছের তলে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। পুলিশ আমার অনুসন্ধানে লিপ্ত আছে। মাত্র ৬ মাস পূর্বে আমাকে হত্যা করিয়াছে। এখনও পুলিশের সন্ধান শেষ হয় নাই বলিয়াই হারম্যান আমার দলিলপত্র বাহির করিয়া টাকা লইতে পারিতেছে না। আমার টাকাগুলি তুমি লইও।··· টাকার পরিমাণ কম নহে। তিনটা বাক্সে দুই কোটী টাকা আছে, কিন্তু আমার কেহ নাই।"

সিম্‌সন বলিলেন—"আপনার সমস্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। কিন্তু টাকা আমাকে দিবেন কেন? আমি তো আপনার উত্তরাধিকারী নহি।" চেয়ার হইতে উত্তর হইল—"হারম্যানের সিন্দুকে যে দলিল আছে, তাহাতে আমার উইল আছে। উইলে লেখা আছে—আমার লিখিত স্বহস্ত-ক্ষোদিত তাম্রফলক যে দেখাইবে, সে ই আমার উত্তরাধিকারী। ঐ ফলকখানি আমার বাড়ীতে আমার শয়নকক্ষের পশ্চিমকোণে পোতা আছে; তুলিয়া আনিও। আমার বাড়ী উইটেন্‌বার্গে। আমার পার্থিব নাম—।"

মিঃ সিম্‌সন পুলিশের নিকট রিপোর্ট করিলে অনুসন্ধান করা হয় এবং দলিল, কঙ্কাল ইত্যাদি সব কিছুই প্রেতাত্মাকথিত স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রমাণাভাবে হারম্যানকে খুনের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। —পৃষ্ঠা—২৮৫—২৮৯

১৫। ভুতের টেবিল

আমেরিকার নিউ-ইউর্ক নগরের প্রান্তভাগে একটা পরিত্যক্ত বাড়ী ছিল। দীর্ঘকাল খালি থাকার পর অল্প ভাড়ায় পাইয়া ফক্সনামক এক ব্যক্তি ঐ বাড়ীটি ভাড়া করে এবং দুইটি কন্যাসহ তথায় বাস করিতে আসে। ফক্সের বড় মেয়ে কেটের বয়স তখন ১০ বৎসর এবং ছোট মেয়েব বয়স ৮ বৎসর। ফক্স কার্য্যব্যপদেশে দিবসের প্রথম ভাগেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইত এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। অবস্থা সচ্ছল না থাকায় ঘরে দাসদাসী ছিল না। শুধু দুইটি বালিকাই ঘরে থাকিত। এই বাড়ীতে বসবাস আরম্ভ করিবার পর হইতেই বাড়ীর নানাস্থানে তাহারা ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ প্রভৃতি শব্দ শুনিতে পাইত। তাহারা কেহই ভূত বিশ্বাস করিত না; সুতরাং মনে করিত—ইহা বাতাসের শব্দ হইবে।

একদিন ফক্স বাড়ীতে নাই। কেট ও তাহার ভগিনী গৃহমধ্যে বসিয়াছিল। সহসা তাহারা দেখিতে পাইল—গৃহমধ্যস্থ একখানা টেবিল চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেই কাঠের টেবিল গৃহেব চারিদিকে সচেতন পদার্থের ন্যায় চলিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবোধ বালিকারা ইহাতে ভয় পাইল না। তাহারা ভাবিল টেবিলেরও বোধ হয় তাহাদের মত চলিবার শক্তি আছে। তখন একটি বালিকা টেবিলটিকে স্থির হইতে বলিল। টেবিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আবার চলিতে বলিলে টেবিলটি চলিতে লাগিল। আবার স্থির হইল। আবার চলিল।

ফক্স বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে মেয়েরা তাহাকে ঐ অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিল। ফক্স পরীক্ষা করিয়া দেখিল—সত্যই টেবিলটার মধ্যে একটা চৈতন্যবোধ ও জ্ঞানসত্তা রহিয়াছে। তখন ফক্স ও কেট পরামর্শ করিয়া বলিল—যদি এই টেবিলে জ্ঞানসত্তা থাকে তবে 'হাঁ' হইলে একটা ঠক্ শব্দ এবং 'না' হইলে দুইটা ঠক্ শব্দ হইবে। এই কথা বলিয়া কেট জিজ্ঞাসা করিল—"টেবিল! তোমার কি জ্ঞানশক্তি আছে?" টেবিল হইতে একটা ঠক্ শব্দ হইল।

তারপর পরামর্শ ক্রমে ফক্স ও কেট টেবিলটিকে নানা প্রশ্ন করিয়া সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্যে A. B. C. D. প্রভৃতি অক্ষর প্রকাশ পূর্ব্বক নানা প্রশ্নের উত্তর পাইতে লাগিল। ক্রমে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহাই আমেরিকায় প্রথম ভূত দর্শনের ঘটনা। এই ঘটনা হইতেই আমেরিকায় কিছু সংখ্যক লোক প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিবার প্রেরণা পান। —পৃষ্ঠা—৩০৩—৩০৫